আমার পিতা তারাশঙ্কর

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরমাত্মীয় পূজনীয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাসাহিত্যিক

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

শ্রীচরণেষু

সরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্কর ভবন

২৭ তারাশঙ্কর সরণী

কলিকাতা ৭০০০৩৭

ব্যক্তি তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আমার লেখকজীবনের গোড়ার দিকে। তাঁর সঙ্গে অবশ্য তখনই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় নি। তারাশঙ্করবাবু তাঁর স্মৃতিকথায় বলেছেন—'গজেনকে তখনও আপনি বলি, গজেন তখন আমার কাছে গজেনবাবু।' তারপর কখন তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে পড়লাম, কখন 'তুমি' সম্বোধন শুরু হল সে আজ আর মনেও পড়ে না।

তবে অন্তরঙ্গতা হলেও আমি কখনও তারাশঙ্করদা বলি নি বা বলতে পারি নি। আমার জানাশোনা সাহিত্যিক মহলেও অল্পজনকেই তারাশঙ্করদা বলতে শুনেছি। এবং সেটাও চেষ্টাকৃত মনে হয়েছে। তবে সামান্য কজন সাহিত্যিক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা নজরে এসেছে, এঁদের মধ্যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস অন্যতম।

তারাশঙ্করবাবুর স্বভাবে ও ব্যবহারের মধ্যে একটা আপাত-নির্লিপ্ততা বা আবরণ-কাঠিন্য ছিল যেজন্য অন্তরঙ্গতা সহজে সম্ভব হত না। অনেকে ভুলও বুঝতেন। পরে যখন ভুল ভাঙত, তখন বুঝতেন মানুষটির অন্তঃকরণ নারকোলের শাঁসের মতোই।

তাঁর নিজের সাহিত্য সম্বন্ধে একটি অসাধারণ দায়িত্ববোধ দেখেছি, যেটি এখানে না লিখলে অনেকেরই অজানা থেকে যাবে। কোন উপন্যাস গ্রন্থাকারে ছাপা হচ্ছে বা সাময়িকপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে—এমন অবস্থায় কেউ তাঁর বইটি সম্বন্ধে কোন পরামর্শ দিলে বা কোথাও কারও বক্তব্য থাকলে মন দিয়ে শুনতেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই কিছু বদলাবার বা যোগ করার থাকলে তখনই বসে লিখে দিতেন। আমি তাঁর কোন কোন বই ছাপার সময়ে প্রুফ স্বেচ্ছায় দেখেছি, সে সময়ে তাঁকে যখনই কোন স্থান দেখিয়ে কিছু যোগ বা বিয়োগ করবেন কিনা প্রশ্ন করেছি, তিনি ব্যাপারটি বুঝে সঙ্গে সঙ্গে বিস্তৃত প্রুফের গায়ে গায়ে প্রায় চার-পাঁচ পাতা লিখে যোগ করে দিতেন, কিংবা অনেকখানি বদলে দিতেন। আমার প্রশ্ন বা পরামর্শ ধৃষ্টতা বলে মনে করতেন না।

শিল্পী মাত্রেরই যশের আকাঙ্ক্ষা থাকে, থাকবে। সমালোচনা প্রতিকূল হলে অধিকাংশ শিল্পীই অসন্তুষ্ট হন। সমালোচনার বিষয়ে সচেতনতা, ইংরেজিতে যাকে Sensitiveness বলে, শিল্পীভেদে কম-বেশি হয়। তারাশঙ্করবাবুও এঁর ব্যতিক্রম ছিলেন না। নিজের সৃষ্টি সম্বন্ধে অসামান্য দায়িত্ববোধ যার উল্লেখ আগে করেছি

আবার এই Sensitiveness, একদিকে যশের আকাঙ্ক্ষা আবার শহর ছেড়ে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে অতি সহজভাবে মেলামেশা—এইরকম বৈপরীত্যময় চরিত্রের মানুষকে নিখুঁতভাবে চেনা বা জানা গবেষণা করে বা স্মৃতিকথা পড়ে সম্ভব নয়। লেখকের খুব কাছের মানুষই সেকথা জানতে পারেন ও শোনাতে পারেন। তারাশঙ্করের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান সরিৎ এই গ্রন্থে বাংলাসাহিত্যের যশস্বী লেখকটির সেই অন্তরঙ্গ অতি-ঘরোয়া পরিচয়টিই তুলে ধরেছেন।

বাংলাসাহিত্যে তারাশঙ্করের স্থান কোথায় তা নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরেই বিভূতিভূষণ-তারাশঙ্করের নাম উচ্চারণে বাংলার পাঠকসমাজ আজ অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে নির্দ্বিধায় বলা যায়, স্নেহাস্পদ সরিৎ এই বইটি লিখে উত্তরকালের পাঠক ও গবেষকদের জিজ্ঞাসা এবং কৌতূহল মেটাবার একটা গুরুদায়িত্ব পালন করলেন।

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভূমিকা / মুখবন্ধ

আমি সাহিত্যের লোক নই। আমি যন্ত্রবিজ্ঞানের ছাত্র, এবং কর্মজীবনে অনুরূপ বৃত্তির গণ্ডিতেই আবদ্ধ ছিলাম। অগ্রজ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হঠাৎ মৃত্যু আমাকে কলেজ স্ট্রীট এলাকায় আসতে বাধ্য করলে। একদিন পরমশ্রদ্ধেয় খ্যাতিমান সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র জানতে চাইলেন আমি আমার পিতার ঘরোয়া জীবনের ঘটনা-গুলি নিয়ে কিছু লিখছি না কেন? কচ্ছপের কামড় খেয়ে গেলাম। তার উপর আমি অত্যন্ত দুঃসাহসী ব্যক্তি, কাজেই লিখে ফেললাম কয়েকটি রচনা। এবার আমার চাইতেও দুঃসাহসিক কর্ম করে বসলেন কৃষ্টিবান 'কথাসাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলী; তাঁরা সেগুলিকে ওই পত্রিকায় ঠাঁই করে দিলেন। এই ঘটনার কিছুদিন পর আমার অনুজপ্রতিম শ্রীমণীশ চক্রবর্তী কিছু ক্ষোভের সঙ্গে বলে বসলেন—"আপনার পিতৃদেব সম্পর্কিত লেখাগুলি কি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার কোন কথাই চিন্তা করছেন না?" দ্বিতীয়বার আবার আর এক কচ্ছপের কামড় খেয়ে গেলাম। এর সঙ্গে আমার পরমাত্মীয় শ্রীভানু রায় তো বিরাজ করছিলেন উৎসাহদাতাদের কেন্দ্রবিন্দুতে মধ্যমণি হয়ে। আর শ্রীপ্রদোষ পাল আমাদের কাছে কুবেরদেব। তাঁর দাক্ষিণ্য না হলে কিছুই সম্ভব হত না।

এইটুকুই হল পিতৃস্মৃতি রোমন্থন করে কিছু লেখার ইতিকথা। লেখার উপাদান যুগিয়েছে আমার স্মৃতি এবং বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের দেওয়া তথ্য এবং শ্রুতি।

পাঠকসমাজের কেমন লাগবে জানি না, তবে আমি লিখতে গিয়ে পেয়েছি অপরিসীম আনন্দ। অতীতদিনের কথা স্মরণ করতে গিয়ে কখনও কৌতুক বোধ করেছি, কখনও বা চোখে এসেছে জল। এ আমার তর্পণ করা—পিতৃপক্ষে—। "বিষ্ণুরোম্ শাণ্ডিল্যগোত্র পিতা তারাশঙ্কর দেবশর্মা তৃপ্যতামেতৎ সতিলোদকং তস্মৈ স্বধা।"

মিত্র-ঘোষ আমাদের পরিবারের দীর্ঘদিনের আত্মীয় প্রতিষ্ঠান, আজও তাই আছে। আত্মীয়ের কাছে ঋণ থাকা অসুখের নয়—তবে তার জন্যে কৃতজ্ঞতা স্বীকার? ছিঃ! তাই কি পারি? তাতে মিত্র-ঘোষকে ছোট করা হবে না কি?

—শ্রীসরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥ ১ ॥

পিতৃস্মৃতি

আমরা ভাইবোনে ছিলাম চারজন। ভাইরা সব বড়, বোনেরা ছোট। এখন হয়েছি তিনজন। আমার দাদা সনৎকুমার আমাদের মধ্যে নেই। আমাদের বাড়ি লাভপুর পল্লীগ্রামে—বাড়ি থেকে খানিকটা দূরে ছোট লাইনের স্টেশন; আরও একটু দূর দিয়ে চলে গেছে বাদশাহী সড়ক—আহমদপুর-সিউড়ি-শান্তিনিকেতন—কলকাতা। আজ থেকে প্রায় ষাট বছর আগেকার কথা—আমার বয়স যখন সাত বছর, তখন একদিন পুলিস এসে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেলো। সে কি যন্ত্রণাদায়ক অনুভূতি। বৈঠকখানায় মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ছিলাম। পড়ার সামগ্রী একখানা স্লেট—ওরই পেন্সিল আর একখানা এক পয়সা দামের ঈশ্বরচন্দ্র শর্মার প্রথমভাগ ও একটা ধারাপাত। বাবা পাশের ঘরে ছিলেন; পুলিস এসে বাবাকে থানাতে ডেকে নিয়ে গেলো। এ যত বেদনাদায়ক, তত মর্মান্তিক। পুলিস তো চোর ডাকাতদের ধরে—এরা আমার বাবাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে কেন তাহলে? এসব ১৯৩০ সালের কথা।

তারপর আরও একটু বয়স বেড়েছে। বাবার সাহিত্যিক খ্যাতির কিছু কিছু স্পর্শও পাই। ঠিক এইরকম একটা সময়ে হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম এল। গোটা বাড়িটা আঁতকে উঠলো। তবে খবরটা কিন্তু অন্যরকম। বাবা বললেন, কাজী নজরুল ইসলাম আসবেন লাভপুরে আমাদের বাড়িতে। আহমদপুরের কাছে বেলের ধর্মরাজতলায় যাবেন—শ্রীমতী কাজীর বাতের ওষুধের জন্যে। কাজী নজরুলের সঙ্গে এলেন নলিনীকান্ত সরকার মহাশয়। সে কি উত্তেজনা। সন্ধ্যায় অন্ধকারে ফুল্লরা মহাপীঠে বসে কাজী সাহেব গান বেঁধে বেঁধে গাইছেন—'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা, সন্তানে অন্তিমে নিতে কোলে!' আবার রাত্রে স্থানীয় মুসলমানদের অনুরোধে আমাদের বৈঠকখানায় হ্যাজাকের আলোতে বসে গাইছেন—'যেমন করে ডেকে ছিল আরব মরুভূমি—ও হজরত! তেমনি করে ডাকলে আবার আসবে নাকি তুমি?' নলিনীকান্ত গেয়েছিলেন হাসির গান—'চাকরী খোঁজার চাইতে বেশি—বউ খোঁজাতে মন দিয়েছি, এখন খুঁজে খুঁজে হয়রান হলাম টালিগঞ্জ থেকে টালা।' আরও কত সব গান। কাজী সাহেব যেদিন এসেছিলেন—তার দুদিন আগে আমার এক ভাই—তার তিনমাস বয়স হয়েছিল, সে মারা যায় রোগভোগের

পর। নজরুলের কানে যেন এ খবর না যায়—তার জন্যে বাবার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া ছিল। সময়টা সম্ভবতঃ ১৯৩৫।৩৬ সাল।

সময়ের সঙ্গে আরও অনেকটা বড় হয়েছি—ক্লাস এইট নাইনে পড়ি। লাভপুরে সাহিত্য সম্মেলন হল। এলেন সজনীকান্ত, বনফুল, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ এবং আরও অনেকে।

লাভপুর অতুলশিব ক্লাবে এইসব অনুষ্ঠান হচ্ছিল। রাত্রে ছিল স্থানীয় জনসাধারণদের নিয়ে থিয়েটার। বাবাও ছিলেন এই স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে একজন অভিনেতা হয়ে। পূর্ণিমার রাত্রি, শীতকাল। বিভূতিভূষণ বাবাকে সন্ধ্যেতে বললেন—এত সুন্দর চাঁদ উঠেছে, উনি গ্রামের বাইরে তারামায়ের ডাঙায় বসে চাঁদ দেখতে চান। সুতরাং পথপ্রদর্শক হিসাবে আমাকে নির্বাচিত করা হ'ল। পল্লীগ্রামের রাত্রি আটটা অনেক রাত। বিভূতিভূষণকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। তাঁর গায়ে বেশ দামী শাল। তারামায়ের ডাঙার প্রান্তরে গিয়ে বিভূতিভূষণ সেই দামী শালটাই ধুলোর উপরে পেতে বসলেন। বড়ই অবাক লেগেছিল।

আমি থিয়েটার দেখতে যাব তাই তাঁকে ফেরার তাগিদ দিলাম। তিনি বললেন তুমি বাড়ি যাও। কথাটা কি ভীষণ ভয়াবহ—অতখানি রাস্তা, এই রাত্রে কি একজন ১৩।১৪ বছরের ছেলের পক্ষে আসা সম্ভব? রাস্তার মোড়ে মোড়ে কত ভূত, কত ব্রহ্মদৈত্য থাকে। যাক, একছুটে বাড়ি ফিরেছিলাম। আমাকে একলা ফিরতে দেখে বাবা বেশ বিরক্ত হলেন—মুখে বললেন, তুমি বিভূতিকে একলা রেখে এলে? তিনি তক্ষুনি আমাদের মাহিনদার শম্ভুকে সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে তবে থিয়েটারে গেলেন।

থিয়েটার দেখতে গিয়ে দেখি—বাবা যেসব পাঠ বলছেন সেগুলো একটাও বই-এর সঙ্গে মিলছে না। প্রম্পটার ভদ্রলোক বই-এর এপাতা ওপাতা উলটান—খুঁজে পান না কিছুই। সহ অভিনেতা ছিলেন আমার মামা সত্যনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন—'জান বন্ধু—শোন সেই কথা'—বলে আবার বই-এর মূল অংশে এসে হাজির হলেন। এইভাবে চুকলো গোটা বইখানার অভিনয়। সাবাস দুজনকেই।

১৯৪০ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছি। দাদা এম. এ. পড়ছেন কলকাতায়। বাবার তখন প্রবাসীতে কালিন্দী বেরুচ্ছে। সুতরাং আমার কলেজে পড়ার উপলক্ষ করে বাবার ছয়জনের পরিবার এসে হাজির হল কলকাতায়—আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের এক বাড়িতে—যার একপাশে থাকেন শিল্পী যামিনী রায়—আমাদের জ্যাঠামশায়, নীচে থাকেন গান্ধীবাদী অধ্যাপক নির্মল বসু, সামনে অমৃতবাজার

পত্রিকার ছ'তলা বাড়ি। আমরা আর কয়েকটা দিন আগে কলকাতা এলে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেতাম যামিনী রায়ের বাড়িতে। পরবর্তীকালে এই বাড়িতেই দেখেছি ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর শিশুপুত্র রাজীবকে—তাঁরা ছবি কিনতে এসেছিলেন।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে বাবা লিখতে বসতেন একটা সবুজ রং-এর আসনের উপর—সামনে থাকতো একটা ছোট ফাইবারের স্যুটকেস—এরই উপর তাঁর লেখার কাজ চলতো। আমার কাজ ছিল—কাগজ কেটে বাবাকে লেখার জন্যে দেওয়া। খুব ভাল বণ্ড পেপার তাকে সাইজ করে কেটে, কোণে ফুটো করে একটা পেতলের দুমুখো ক্লিপ দিয়ে এঁটে দেওয়া। এগুলো জমানো থাকতো ঐ স্যুটকেসের মধ্যেই। এখানে থাকাকালীন হ'ল দুই পুরুষ নাটক। বহুবার দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছি ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলীর অভিনয় দেখে। 'কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার যে আমার তকমা নেই' ব'লে কপালে আঘাত করতেন ছবি বিশ্বাস, শব্দ উঠত চটাস্ করে। যা থেকে মনে হতো উনি খুব জোরেই কপালে আঘাতটা করতেন এই আক্ষেপটা বোঝাতে।

এই বাড়িতে বসেই বাবা লিখেছেন, কালিন্দী, গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম—শেষের দুটি ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়েছিল। গল্প লিখেছেন অজস্র। উপন্যাসগুলির কাগজ হত বড়—অর্থাৎ ডবল গল্প সাইজ। এখানে থাকাকালীন শেষের দিকে আর্থিক সাচ্ছল্য এবং সাহিত্যিক মর্যাদা দুই-ই তাঁর বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই নিচের থেকে নির্মলকাকা অন্যত্র উঠে যেতেই, নিচের ঘর দুটোও আমরা ভাড়া নিয়ে নিলাম। তখন ওখান থেকে ট্রেনে যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে যাতায়াত করি। দাদা বাবার সাহিত্যের আসরে চলাফেরা করেন—প্রকাশকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তাঁদের কাছ থেকে টাকা আনেন—নতুন বই-এর চুক্তি করেন। আর আমি নিচের ঘরে ইঞ্জিনিয়ার হবার সাধনায় মগ্ন থাকি। পড়তে পড়তে দেখতে পেতাম শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় আমার সামনের গলি দিয়ে পায়ে হেঁটে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাতায়াত করতেন। ঐ সময় দক্ষিণা বসু মহাশয়ও এসে আমাদের আর একপাশের বাড়িতে বাসিন্দা হয়ে গেলেন।

এরপরই উঠে এসেছি টালা পার্কের বাড়িতে—১৯৪৯ সালে। আমার বিয়ের জন্য বাড়িটা শেষ না হতেই আমরা তাড়াতাড়ি উঠে এলাম বর্তমান ২৭ নং তারাশঙ্কর সরণিতে। এই বাড়িতে নিচের ঘরে বাঘ-ছালের উপর আসন পেতে (বাঘ-ছালটা দাদার ও আমার শ্বশুরমশাই, একই ব্যক্তি উপহার দিয়েছিলেন। বাবাকে বসবার আসন করার জন্যে) সামনে একটা কাঠের ডেস্কের উপর বসে লিখতেন বাবা। খুব ভোরে উঠতেন। বাথরুমের কাজ সেরে ইষ্ট স্মরণ করে, এক গ্লাস দুধ-ছাড়া চা নিয়ে বসতেন। একখানা ডাইরিতে লিখতেন ছোট ছোট করে ইষ্টনাম

কখনও ১০৮ বার কখনও হাজারবার বা তারও বেশি। তারপর লিখতে বসতেন। এই লেখা চলতো বারোটা একটা পর্যন্ত। লিখতেন আর চা সিগারেট খেতেন। কাছেই থাকতো গোল্ডফ্লেকের টিন, প্রায় দেড় টিন খরচ হত প্রতিদিন। লেখার মাঝে ৯/১০টার সময় এক গ্লাস দুধ, খান চারেক ক্রিমক্রেকার বিস্কুট (এই বিস্কুট খেতে উনি খুব পছন্দ করতেন) খেয়ে নিতেন। মাঝে মাঝে উঠে বাইরে পায়চারি করতেন। লোকজন যাঁরা আসতেন তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতেন। এই সময় হঠাৎ উনি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন—ব্লাডপ্রেসার কখনও ১৮০ কখনও বা ১০০ এই রকম চলতে থাকায় ওঁর শোবার ব্যবস্থা দোতলা থেকে নিচে—যে ঘরটায় বসে লিখতেন সেখানে করা হল। এই সময় উনি ছবি আঁকতে শুরু করেন দেওয়ালে। আর লেখার ঘর হ'ল পাশের বসবার ঘরে। বারান্দাটা ঘিরে নেওয়া হ'ল কাঁচ দিয়ে—আগন্তুকদের সাময়িক বসবার জন্য। এখন লেখার জন্যে একটা স্বল্প উচ্চতার ছোট তক্তা-পোষ, তার উপর একটা নতুন কাঠের ডেস্ক—তাতে অনেক খাপ—ওঁর মতা-নুযায়ী তৈরি হয়েছিল, তাতে লিখতেন। সমস্ত জিনিসটা খুব সুন্দরভাবে সাজিয়ে-ছিলেন উনি, সঙ্গে ছিলেন দাদা ও তাঁর তৃতীয় পুত্র রণ্টু। জ্ঞানপীঠের স্মারকটা রাখা হয়েছিল ঠিক বাবার আসনের পিছনের দেওয়াল আলমারিতে, পাশে দুটো কাচের আলমারিতে রাখা হল সাহিত্য আকাদেমি, রবীন্দ্র পুরস্কার, ডক্টরেট উপাধিপত্র ও অন্য সব পদকগুলি। বেশ কিছু পদক যা সোনার ছিল, সেগুলি দান করেছিলেন চীন যুদ্ধের সময় ১৯৬২ সালে। এই লেখার ব্যবস্থাই ছিল তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। আমার জীবনের অনেকখানি সময় কেটেছে কলকাতার বাইরে—চাকরির জন্য। তাই সব সময় দাদার মত, বাবার কাছে থাকবার আমার সৌভাগ্য হয়নি। কতদিন দেখেছি রাত্রে বাবা সাহিত্যিক সমাজের মান্যবরদের সঙ্গে কথা বলছেন লেখার জায়গাতে বসে। দাদা গেঞ্জি গায়ে বাবার পাশে বসে থাকতে থাকতে ওই স্বল্প জায়গাতে গুটিশুটি মেরে শুয়ে থাকতে থাকতে ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাবা কথা বলছেন সামনে সোফায় বসা মান্যবরদের সঙ্গে, আর হাত বুলিয়ে যাচ্ছেন দাদার মাথায়, কখনও বা মশা তাড়িয়ে দিচ্ছেন দাদার গা থেকে। দেখে একদিকে যেমন ভাল লাগতো—তেমনি আমার মনে যে কোন ঈর্ষা জাগতো না এমন কথা আজ জীবনের অস্তাচলে এসে বলি কেমন করে?

বাবাও হয়ত আমার মনের এই দুঃখটুকুকে অনুমান করতে পেরেছিলেন—তাই শেষের একটু কথা না বললে অপূর্ণ থেকে যাবে আমার কথা—বাবার কথা।

১৯৭০-৭১ সাল—আমি তখন টালিগঞ্জে পোস্টেড—নকশালদের তীর্থক্ষেত্র। এমন দিন নেই যে দু'একটা খুন হচ্ছে না সেখানে—আধঘণ্টা ব্যাপী বোমা বিস্ফোরণ

তো রোজই দফায় দফায় চলছে।

সেদিন আমার প্রতিষ্ঠানে মাইনে দেবার দিন—১৯৭১-এর ১লা জুলাই। টাকার জন্য অপেক্ষা করছি—রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থেকে আসবে। এই সময় একজন চুপিচুপি এসে আমাকে জানিয়ে গেল যে মাইনের টাকা লুঠ করতে একদল ছেলে হাজির হয়েছে। যে তিনজন রাইফেলধারী পুলিস টাকা সঙ্গে করে এসেছিল তাদের কর্মতৎপরতায় সেটা আর সম্ভব হয়নি। খবর পেয়ে থানা থেকে পুলিস ভ্যানে করে টাকা নিয়ে প্রথমে যাদবপুর থানা, পরে হেড অফিস বেণ্টিঙ্ক স্ট্রীটে এসে টাকা রেখে পুলিসের ব্যবস্থা করে বাড়ি ফিরতে প্রায় রাত্রি এগারোটা হয়ে গিয়েছিল। বাবা কেমন করে সংবাদ পেয়েছিলেন জানি না, ফিরে দেখি তিনি বাইরের বারান্দায় গরাদে মাথা রেখে প্রতীক্ষা করে রয়েছেন আমার পথ চেয়ে।

সেদিন বিছানায় শুতে শুতে রাত্রি একটা হয়ে গিয়েছিল। ঘুমের ওষুধ রোজই খেতাম তখন—সেদিনও খেয়েছি। রাত্রি তখন সাড়ে তিনটে, আমার গায়ে মাথায় মনে হল কে যেন হাত বুলোচ্ছে—তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখে চেয়ে দেখি আমার চুয়াত্তর বছরের পিতা—যিনি অত্যন্ত শক্ত চরিত্রের মানুষ বলে পরিচিত—চোখে জল নিয়ে শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন।

তারপর চলে যাই ভারত সরকারের কাজ নিয়ে দণ্ডকারণ্য-জগদলপুরে। ফিরে আসি টেলিফোনে বাবার অসুখের খবর পেয়ে। ১৯৭১ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর প্রত্যুষে, আমাদের সকলের চোখের সামনে তাঁর হৃৎপিণ্ডের কাছটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো—নিশ্বাস কিছু আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি অমৃতলোকের যাত্রী হলেন।

তাঁর চুয়াত্তর বছরের জীবন। আমার পঞ্চাশ বছর ধরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। কত কথা—কত ঘটনা—তাঁরই মধ্যে থেকে কিছু নিবেদন করছি।

॥ ২ ॥

স্বাদেশিকতা

(১৯০৫, ১৬ অক্টোবর—১৯৪৭, ১৫ আগস্ট)

অঙ্কের হিসেবে আমার পিতা আমার চেয়ে চব্বিশ বছরের বড় ছিলেন।

জন্মে থেকেই তাঁকে দেখেছি, কোলে পিঠে চড়েছি; আদর যেমন পেয়েছি, চড়-চাপড়ও তেমনি জুটেছে। ছেলেবেলায় আমি নাকি দেখতে বেশ ভাল ছিলাম, অর্থাৎ কুণ্ঠার সঙ্গে জানাচ্ছি—সুন্দর ছিলাম দেখতে। গায়ের রঙ ছিল ফর্সা—মায়ের মত,

চোখ দুটো ছিল কটা—ঠাকুমার মত, চুলগুলো ছিল সোনালী। সুতরাং আমার নাম হয়েছিল 'কটা'; যা পরবর্তী কালে পেলব হয়ে কটুতে নামান্তরিত হয়েছিল। বাবা ঐ নামেই আমাকে শেষদিন পর্যন্ত ডেকে গেছেন। ১৯৩০ সাল, তখন আমার বয়স ৭/৮ বছর। সেই সময়ের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কংগ্রেসের তেরঙা পতাকা নিয়ে কিছু লোক রাস্তায় রাস্তায় খোল করতাল বাজিয়ে দেশ-বন্দনা গাইছেন। মাঝে মাঝে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি দিচ্ছেন। বাবা রয়েছেন সকলের সামনে। সঙ্গে আছেন ছোটকাকা পার্বতীশঙ্কর, দুই মামা, আমাদের পাশের বাড়ির শ্যামুদা, শ্যামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাড়ার বলাই মুখোপাধ্যায় (বলাইদা), সরোজ মুখোপাধ্যায় (সরোজ ভাইপো), মহুগ্রামের সুধাই মিশ্র, আরও অনেকে। যতদূর মনে পড়ে আমার পিসীমা শ্রীমতী কমলাদেবী, মা ও আরও দুচারজন মহিলা সঙ্গে এসেছিলেন। আর একদিকে যতীন সাহার মদ গাঁজার দোকানের সামনে বেশ ভীড়। দোকানের সামনে রাস্তার উল্টোদিকে পুকুর পাড়ে একটা তেঁতুলগাছের শেকড়ের উপর বসে আছেন অনেকে, মেজকাকাও তার মধ্যে আছেন। দোকানের সামনে প্রথম মিছিলটি আসতেই হৈ হৈ পড়ে গেল। সুধাই মিশ্র বক্তৃতা দিলেন—মশায়রা, আমি রোজ দুআনা করে গাঁজা খেতাম, আমি এখন সেসব ছুঁই না। এ জিনিস আপনারা আর খাবেন না কিনবেন না ইত্যাদি। হঠাৎ একদল পুলিস এসে তাড়া করলো সেই মিছিলকে। আমরা ছোট ছেলের দল, যারা মজাই দেখতে গিয়েছিলাম, ছুটে বাড়ি পালিয়ে এলাম ভয়ে। বড়দের কি হ'ল তা দেখার সাহস ঐ শিশুদের অনেকেরই ছিল না। বাড়িতে পুলিসী সংবাদ দিতে ঠাকুমা, বাবার পিসীমা এবং কাকীমারা বেশ বিচলিত হয়ে পড়লেন।

কিছু পরে শোনা গেল থানায় নিয়ে গিয়ে সরোজ, বলাইদা, শ্যামুদাকে বেশ প্রহার করা হয়েছে এবং সুধাই মিশ্রকে আটকে রাখা হয়েছে। খুব সম্ভব তার পরের দিন—সকালবেলা কাছারী বাড়িতে বসে শ্রীপতি মাস্টার মশায়ের কাছে শ্লেট পেনসিল নিয়ে অঙ্ক করছি, এমন সময় মালকোঁচা করে পরা ধুতি, গায়ে খাঁকির কুর্তা, কোমরে চওড়া চামড়ার বেল্ট, ঝকঝকে পেতলের তকমা আঁটা থানার দফাদার মেলাকুপ মিঞা ঢুকলো বাবার ঘরে।

সে সময়ের আমাদের গ্রামীণ জীবনযাত্রার কথা একটু বলতে হয়।

গ্রামের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে চলে গেছে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বমান সড়ক—পশ্চিম দিকে সিউড়ি, পূর্ব দিকে কীর্নাহার, কাটোয়া। এই মূল রাস্তা থেকে, পশ্চিমদিকে গ্রামে ঢুকবার মুখে একটা শাখারাস্তা বেরিয়ে চলে গেছে পূর্বে, বাকুল গুণটিয়ার দিকে। এই রাস্তার উপর স্কুল, পোস্টঅফিস, থানা ও বণিক সম্প্রদায়ের দোকান। এই

ছটি রাস্তাকে যোগ করেছে উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত যে রাস্তা—সেই রাস্তাটাই ছিল তখন কৌলীন্যে প্রধান। এর দু-পাশে তখন গ্রামের সম্ভ্রান্ত মানুষেরা বাস করতেন। আর এঁদের ঘরোয়া জীবনযাত্রার জন্য থাকতো অন্দরমহল বা ভেতর বাড়ি। সেখানেই থাকতেন বাড়ির ঘরনীরা,—রান্না খাওয়া এবং রাত্রে শোয়া এখানেই হত। প্রভাতে উঠে পুরুষেরা বাইরে বের হয়ে আসতেন। আপন আপন কাজকর্ম আর দিনের বিশ্রামের সময় আসতেন রাস্তার এপাশে কাছারী বাড়িতে।

আমাদের কাছারী বাড়িটা ছিল ইউ-এর মত। রাস্তার দিকে বাইরের ঘর, কোলে বারান্দা। সেখানে আমাদের যেটুকু সামান্য জমিদারী ছিল—তার কাজকর্ম হত। এ ঘরটা ছিল নায়েবমশায়ের দখলে। আলমারী ভর্তি জমিদারীর কাগজ, খতিয়ান, খোকা, মৌজাম্যাপ, রেকর্ড ইত্যাদি।

মাঝে হলঘর। এইখানে থাকতেন আমাদের মাস্টারমশাই—আমরা পড়তামও এখানেই। ওপাশে শেষের দিকের ঘরটাতে বাবা কাকারা বিশ্রাম করতেন, বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। এই ঘরটাতেই সেদিন বাবা বিশ্রাম করছিলেন—এবং মেলাকুপ তাঁর সঙ্গে এখানেই দেখা করেছিল। পিতৃদেব শেষ জীবনে লাভপুর এলে এই ঘরটাতেই থাকতেন।

একটু পরে বাবা বেরিয়ে এলেন এবং মাস্টারমশাইকে বললেন—মাস্টার, আমি থানায় যাচ্ছি, বাড়িতে খবরটা দিও।

ঘটনাটা দেখে আমি খুব মুষড়ে পড়েছিলাম, ভীষণ খারাপ লেগেছিল আমার, মেলাকুপ বাবার মত মানুষকে থানায় নিয়ে গেল কেন? থানাতে তো চোর-ডাকাত-খুনে এদের ধরে নিয়ে যায়! আমার বরণীয় পিতৃদেবকে সেইদিন চোর ডাকাতের সারিতে বসাতে গিয়ে শিশুহৃদয় অব্যক্ত যন্ত্রণায় ফুলে ফুলে কেঁদেছিল। লোকে কান্নাটা দেখেছিল—কিন্তু যন্ত্রণার আসল কারণটা সেদিন তাঁরা বোঝেননি।

ঘণ্টাখানেক পরে বাবা ফিরে এসেছিলেন ব্যক্তিগত জামিনে।

দুদিন পর সিউড়ীতে কোর্টে হাজিরা দিতে হবে, বিচার হবে, দোষী সাব্যস্ত হলে জেল হবে। বিচারে জেলই হয়েছিল।

শিশুমনের সেই যন্ত্রণার তাড়নায় মাসখানেক পরে সিউড়ী এসেছিলাম মেজকাকার সঙ্গে। মেজকাকা বাবার সঙ্গে দেখা করে কিছু জিনিসপত্র দিয়ে যাবেন। সেদিন ওঁদের জন্যে একখানা ক্যারামবোর্ড আনা হয়েছিল—এটা খুব ভালভাবে মনে আছে। উঠেছিলাম মায়ের মামার বাড়ি জেলখানার সামনের বাড়িটাতে 'যাদব কুটীরে'। আমার মায়ের ছোটমামা স্বর্গীয় নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর বাড়িতে উঠছিলাম, তাঁরই আনুকূল্যে জেলে দেখা করার অনুমতিও মিললো। এঁরই

আনুকূল্যে অপরজনেরা মুচলেকা দিয়ে জেলের বন্দীদশা থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

বাড়ির সামনেই জেলখানার বড় লোহার দরজাটা। ওঁদের বাড়ির বারান্দায় বসে বসে দেখছিলাম—ডোরাকাটা হাফ পাতলুন আর ফতুয়া পরে কয়েদীরা কল থেকে ভারে করে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোমরে দড়ি বাঁধা, সেই দড়ি ধরে রয়েছে পেছনে পুলিস। এই দৃশ্য থেকে আমার বাবার কথা ভেবে যন্ত্রণায় মূক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। হায়রে অবুঝ শিশুহৃদয়। আমি হলফ করে বলতে পারি, তারাশঙ্কর তাঁর সমস্ত জীবনে যত শ্রদ্ধা ভালবাসা পেয়ে থাকুন না কেন—সেদিনের সেই শিশুর ভালবাসা ছিল সকলের চেয়ে মহত্তর, স্বর্গীয়, স্বার্থহীন। বিকেলের দিকে বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। উনি ধুতি গেঞ্জি পরে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে হাসছিলেন। আমার কটা চুলে হাত বুলিয়ে দিয়েছিলেন।

* * *

আমি অনেক ভেবে দেখেছি পিতৃদেব তারাশঙ্কর সমস্ত গ্রামটির মধ্যে একক এমন অদ্বিতীয় খেলায় মেতেছিলেন কেন? ভদ্র আয়ের একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় যাদের ছিল তারা কেউ আর এ রাস্তায় এগুলো না। কিন্তু পিতৃদেবের ওসব থাকা সত্ত্বেও ওই রাস্তাটি ছাড়লেন না। শুধু তাই নয় এর সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন সমাজ-সেবা বা দরিদ্র-নারায়ণ-সেবা। এর জন্য বেশ কয়েকটি কারণ পরে আমার কাছে ধরা পড়েছে। প্রথম কারণটি আমার মতে তাঁর মায়ের শিক্ষা। আমার ঠাকুমা ছিলেন পাটনা শহরের এক ইংরাজীশিক্ষিত পরিবারের কন্যা। তিনিই তাঁর পুত্রকে ঐ মুক্ত বিহঙ্গের গান শুনিয়েছিলেন। তারাশঙ্কর তাঁর "আমার কালের কথা" বইতে লিখছেন —"আমার মায়ের মধ্যে ছিল গভীর স্বদেশানুরাগ। আমার বাবারও ছিল। রাখীবন্ধন অনুষ্ঠান যখন প্রথম অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাঁর ডায়রিতে পাই—৩০শে আশ্বিনের ডায়রি—'বেঙ্গল পার্টিশন হইয়াছে, হিন্দু মুসলমান সকল জাতিই মনে মনে দুঃখ পাইয়াছে। বঙ্গদেশের এই দুঃখে বঙ্গবাসীগণ আজ নূতন করিয়া জাগ্রত হইতেছেন। পরাধীনতায় দুঃখ অনুভব করিতেছেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার কবিবর রবীন্দ্র ঠাকুর এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিজ্ঞাপনদ্বারা বঙ্গবাসীকে পরস্পরের হস্তে হরিদ্রাবর্ণের রাখী বাঁধিতে চলিয়াছেন। সকল বঙ্গবাসীই তাহা পালন করিবে। ইহা দ্বারাই আমরা একতাসূত্রে আবদ্ধ হইব।'...

"আমার মায়ের দেশপ্রেম ছিল বাস্তব। তিনি পাটনার মেয়ে। বাস্তব রাজনীতি-বোধ তাঁর শুধুমাত্র ধর্ম এবং অদৃষ্টের উপর নির্ভরশীল ছিল না। আমার বড়মামার মধ্যে মানিকতলার দলের ঢেউ এসে লেগেছিল। পরবর্তী কালে আমার সেজমামা তিনি আমার থেকে চার পাঁচ বৎসরের বড় ছিলেন—উত্তর ভারতের বিপ্লবীদলের

দলভুক্ত হয়েছিলেন। পরে বেনারস কন্‌স্‌পিরেসি কেসে তাঁর নাম কয়েকবার উল্লেখিত হয়েছে—তাঁর পরবর্তী ছোট ভাইকে তাতে সাক্ষ্যও দিতে হয়েছে।

"ঐ প্রথম রাখীবন্ধনের দিন আমার বড়মামা লাভপুরে ছিলেন। তিনি রাখী এনে আমার মায়ের হাতে বেঁধে দিতেই, মা তাঁর হাত থেকে একটি রাখী নিয়ে আমার হাতে বেঁধে দিয়ে মন্ত্র পড়েছিলেন—বাংলার মাটি—বাংলার জল—।"

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাখীবন্ধন ও অরন্ধন পালন করেছিল বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষ। সেদিন শিশু তারাশঙ্করেরও বয়স ছিল সাত বছর। ঐ বয়সের আর একটি শিশু কেঁদে বুক ভাসিয়েছিল ১৯৩০ সালে পিতা তারাশঙ্করের বন্দীদশা দেখে।

দ্বিতীয় কারণ হল তখনকার বাতাবরণ। সে সময়ে কিশোর কুমারদের চিন্তাধারায় কি প্রতিফলনছিল? তারাশঙ্কর সে কথা বলতে গিয়ে 'কৈশোর-স্মৃতি'তে লিখছেন,—"১৯১১-১২ সাল! তখন বাংলাদেশে ছেলেদের কৈশোরের কল্পনায় সার্থক জীবন ভাবতে গেলেই তিনটি স্বর্ণসিংহাসন ভেসে উঠত। একটিতে আঙুল দেখিয়ে দাঁড়াতেন তেজোদৃপ্ত এক সন্ন্যাসী, মাথায় গৈরিক পাগড়ি, গায়ে গেরুয়া আলখাল্লা, আয়ত অদ্ভুত দুটি চোখ। বলতেন, 'জানিও, জন্ম হইতেই তুমি মহামায়ার উদ্দেশে বলি-প্রদত্ত। আত্মবলি দিয়া এই সিংহাসনের অধিকারী হও।' সে সন্ন্যাসী—বিবেকানন্দ। আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়াতেন আর এক তেজোদৃপ্ত পুরুষ। মাথায় পাগড়ি গায়ে চাপকান, দৃঢ়বদ্ধ অদ্ভুত দুটি ঠোঁট, তেমনি ললাট, তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। তাঁর হাতে লেখনী, কুক্ষিতলে বই। নাম পড়া যেত বইগুলির। কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, আনন্দমঠ, রাজসিংহ, বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, কমলাকান্তের দপ্তর, আরও—অনেক অনেক। এই বইগুলি আমাদের বাড়িতে ছিল। আমি পড়েছিলাম। বাকি বইগুলি তখনও পড়িনি। তিনি বলতেন, আমার পিছনে এস। গান গেয়ে এস পৃথিবীর দেশে দেশে; বাংলাদেশের বেদনার গান। বলিও সুখের কথায় বাঙালীর অধিকার নাই। কিন্তু দুঃখের কথায় আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন, সার্থক হলে এ সিংহাসনে তুমি বসতে পাবে। আর একটি সিংহাসনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতেন একটি পনের-ষোল বছরের কিশোর। দেবদূতের মত কল্পনার জন সে। তার ছবি কখনও দেখিনি, তবে বাউলদের মুখে তার গান শুনেছি।

'বিদায় দে মা ফিরে আসি
হাসি হাসি পরব ফাঁসি দেখবে ভারতবাসী।'

ক্ষুদিরাম আঙুল দেখিয়ে বলতেন, এ সিংহাসনের মূল্য গলায় ফাঁসি পরে দিতে

হবে। বন্দেমাতরম্।"

সুতরাং আকাশে বাতাসে সমগ্র দেশে যখন এই সুর ভেসে বেড়াচ্ছে তখন মায়ের শিক্ষায় দীক্ষিত তারাশঙ্করের পক্ষে ঢাকার অনুশীলন পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ কিছু বিচিত্র নয়। 'আমার কথা'তে যে উনি লিখছেন—"আমি নিজে পনের-ষোল বৎসরের বয়স থেকে অনুশীলন দলের সঙ্গে দৈবক্রমে যুক্ত হয়েছিলাম।" আর এক জায়গায় লিখছেন—"কংগ্রেসের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ১৯২১ সন থেকে। দেশসেবা বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সঙ্গে যোগাযোগ আরও আগে থেকে—১৯১৫-১৬। অনুশীলনের নলিনী বাগচীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দু'একজনের সঙ্গে আলাপের সূত্র ধরে এই যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।...রামপুরহাট স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে দু-তিনজনের সঙ্গে আলাপ করে নলিনী বাগচীর সন্ধান পেয়েছিলাম। নিমতিতা কাঞ্চনতলার ছেলে নলিনী বাগচী। স্কলারশিপ পাওয়া ভাল ছেলে। তিনি ১৯১৬/১৭ সনে ঢাকায় পলাতক অবস্থায় পুলিসের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে মারা যান। আমি কলকাতায় পড়তে এসে ইণ্টার্নড হই গ্রামে আমার বাড়িতে। ৺পূর্ণ লাহিড়ী এককালে লাভপুরে সাবইনস্পেক্টর ছিলেন। সে সময় আমার বাবার সঙ্গে তাঁর খুবই প্রীতির সম্পর্ক হয়েছিল।

তিনি আমাকে বলেছিলেন—ঘরের ছেলে ঘরে যাও।

আমি কিন্তু ঘরে এসেও ভুলতে পারিনি দেশ-মুক্তির স্বপ্নের কথা। ১৯২১ সন থেকে কংগ্রেসের সভ্য হয়ে আমার গ্রামে একলাই কংগ্রেসের কাজ যথাসম্ভব করে গেছি। এই হেতু কংগ্রেসের ছোট বড় নেতা, স্বর্গীয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত পর্যন্ত আমার গ্রামে এসেছেন—আমার বাড়িতেই অতিথি হয়েছেন।"

এই দেশাত্মবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ, মানবাত্মার প্রেম।

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর—
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

শুরু করেছিলেন সমাজ-সেবা, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা। বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করে দরিদ্রের মধ্যে বিতরিত হ'ত সেই চাল। তাদের বিপদে সেবা করতেন। এমনি একটি ঘটনার কথা তাঁর লেখা 'আমার কথা' থেকে উদ্ধৃত করছি। "১৯২৪ সনে আমাদের অঞ্চলে কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, সে আক্রমণ ব্যাপক। মাসখানেক মাসদেড়েক মহামারীর আকারে আত্মপ্রকাশ করে গোটা অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল। তখন আমি একটি সেবাসমিতি গঠন করে সেবাকার্য করেছিলাম।

কলকাতা থেকে একদল মেডিকেল স্টুডেন্টস এসেছিলেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে। ডিস্ট্রিক্টবোর্ড গভর্ণমেণ্ট দুজন ডাক্তার পাঠিয়েছিলেন। এঁদের সাহায্য পেয়ে আমি আমার দলটি নিয়ে প্রাণপণে খেটেছিলাম। কিন্তু কলেরা থেমে যাওয়ার পর এর

প্রাপ্য আশীর্বাদের সঙ্গে নিন্দার অনেক তীক্ষ্ণবাণও নিক্ষিপ্ত হয়েছিল আমার দিকে। নানারকম কথা। কেউ বলেছিলেন আমি জাতিভ্রষ্ট। এমন কি হীনমতি কদর্য রুচি বলতেও দ্বিধা করেন নি। কারণ আমি ওই সব ব্রাত্যমানুষদের মলমূত্র-ত্যাগের স্থানে ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়েছি। কলেরা আক্রান্ত বাড়ির রান্না করা খাদ্য-দ্রব্য বের করে গর্ত খুঁড়ে মাটিতে পুঁতে দিয়েছি। কোন ব্রাহ্মণ ঘরের সন্তানের এবং তার উপর কিছু সম্পত্তিবান সংসারের সন্তানের পক্ষে এটি ভ্রষ্টতার স্পষ্ট লক্ষণ। কেউ নিন্দা করেছিলেন অন্য ছেলেদের ডাক দিয়ে দলে ভেড়াবার জন্য। অন্যদিকে পুলিস বিভাগের দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর হয়েছিল আমার উপর। এর ফলে দুঃখ পেয়েছিলাম আমি।”

তৃতীয় কারণটি, আমার মতে ছিল ধনী শ্বশুরকুলের অবজ্ঞা যা পরবর্তীকালে বিরোধে পরিণত হয়েছিল। তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ধনী শ্বশুরকুলে ছিলেন রাজভক্ত রাজানুগৃহীত উচ্চসমাজের মানুষ। সুতরাং “তাঁরা পড়ো জমিদার ঘরের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার অফিসে কখনও কয়লাকুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই ছমাসের বেশী লেগে থাকতে পারিনি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হইনি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।” আমার সাহিত্য জীবন—১ম খণ্ডে এই মন্তব্যটি পাচ্ছি। পিতৃদেব ও ছোটকাকা জেলে যাওয়ার ফলে আমাদের বাড়িতে পুলিসভীতি উপেক্ষা করেই আমরা ছোটখাটো স্বদেশী কাজ করবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। অবশ্য এই সময়টাতে আমাদের বাড়ির সঙ্গে সঙ্গতিপন্ন মানুষজনের মেলামেশা আশ্চর্যজনক ভাবে কমে গিয়েছিল। তেমনি অন্য দিকে অল্পবয়সী তরুণ সমাজের যাতায়াত বেড়েছিল অনেক বেশী।

১৯৩১ সালে গান্ধীজি যখন লবণ আইন অমান্য করে সবরমতী আশ্রম থেকে সুদূর আরব সমুদ্রের উপকূলে ডাণ্ডি যাত্রা করলেন—তখন সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। আমরাও তরুণ সমাজ লাভপুরে উত্তাল হয়ে উঠলাম। একদিন সকালে নোনামাটি আনতে গেলাম।—কুঁয়ে এবং বক্রেশ্বর নদীর সঙ্গমের কাছাকাছি জায়গা থেকে। লাভপুর থেকে প্রায় ৩/৪ মাইল হবে জায়গাটা। একটা নতুন মাটির হাঁড়ি যোগাড় করে সেই মাটি গুলে, খড়ের আগুন জ্বেলে জল শুকিয়ে গেলে আমরা পেয়েছিলাম খানিকটা কালো কালো গুঁড়ো জিনিস। মুখে দিয়ে দেখেছিলাম বেশ ঝাঁঝালো নোন্‌তা, বিস্বাদও বটে। সকলে কাগজে মুড়ে একটু একটু করে ভাগ করে নিয়েছিলাম। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটেছিল আমাদের কাছারী বাড়িতেই। বাবা খুশী হয়ে সকলকে আদর করে আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন।

এরপর মোটামুটি যে সব ছোটখাটো ঘটনা ঘটেছিল তার ফলস্বরূপ পিতৃদেব

পুলিসের কাছ থেকে উপহার পেলেন একজন সারাক্ষণের অনুসরণকারী। পিতৃদেব যেখানে যান তিনিও সেখানে চলেন তবে থাকেন দূরে দূরে। অন্য কোথাও কারও বাড়িতে গেলেও এই লোকটি সেই বাড়ির দরজায় অপেক্ষা করে। মামার বাড়ি থেকে আনা বন্দুকের গুলির ফাঁকা খোল আঙুলে পরে একদিন খেলা করছিলাম। পুলিস জানতে চাইল এগুলি বাবার কাছ থেকে পেয়েছি কি না? পুলিসের সন্দেহভাজন তারাশঙ্কর—তাঁর বন্দুক থাকার কথাই ওঠে না। এমনতর অবস্থায় পিতৃদেব সিদ্ধান্ত নিলেন দেশত্যাগের। পুলিস সাহেব সামসুদ্দোহা বাবার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিলেন।

সুতরাং কলকাতা গিয়ে শুরু করলেন তাঁর অবহেলিত সাহিত্য-সাধনা। সেখানেও রেহাই পাননি দোহা সাহেবের হাত থেকে। বাঁচবার জন্যে শনিবারের চিঠির সহ-সম্পাদক সাজলেন। অবৈতনিক, যদিও মাইনের খাতায় লেখা থাকবে ত্রিশ টাকা। পিতার এই কলকাতা আসার সূত্র ধরে আমরা সকলে অর্থাৎ মা, বাবা, দাদা বোনেরা আমি ১৯৪০-এ হাজির হলাম কলকাতায়। হলাম শহরের বাসিন্দা।

শুরু করলাম কলেজী পড়াশুনা। রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণ দেখলাম—দেখলাম শোকে মুহ্যমান জনসমুদ্র। পিতৃদেবের বিমূঢ় শোকস্তব্ধ উপবাসক্লিষ্ট চেহারা দেখলাম। আর দেখলাম ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো আগস্ট আন্দোলন। কলকাতায় এর তীব্রতা এমন বেশী কিছু ছিল না। পিতার বদলে তখন আমরা এদিক ওদিক মিছিল করে বেড়াচ্ছি। উনি একবার করে রাস্তায় বেরিয়েছেন, দেখে এসেছেন রাস্তার ব্যারিকেড হটানোর জন্য গোরা সৈন্যদের গুলি চালানো। নিবিষ্ট মনে লিখছেন গণদেবতা—গ্রাম বাঙলার ধ্রুপদী উপন্যাস। আর বেরুলো কবি উপন্যাস যার মধ্যে মূর্ত হয়েছে মানবজীবনের অনন্ত বেদনার বার্তা—জীবন এত ছোট কেনে হায়, ভালবেসে মিটলো না সাধ, কুলালো না এ জীবনে, জীবন এত ছোট কেনে হায়।

এরপর এল ১৯৪৭ সাল। ১৯৪৭ সালের মাইল স্টোনে ভারতবর্ষের জীবনে এল বিশাল মঙ্গলসূচক পরিবর্তন। দেশ স্বাধীন হবে ১৫ই আগস্ট—। অর্থাৎ ১৪ আগস্ট-এর মধ্যরাত্রে বারোটার পর ক্ষমতা হবে হস্তান্তরিত। তারাশঙ্কর আমার কথায় লিখছেন—"১৫ই আগস্ট আমি কলকাতায় ছিলাম না। কলকাতার সে সমারোহ, সে বিপুল জীবনোচ্ছ্বাস আমি দেখিনি। তার জন্য কোন খেদ নেই আমার।

লাভপুর থেকে আমার ডাক এসেছিল। চিঠি নিয়ে লোক এসেছিল—লোকে চেয়েছিল—তোমাকে আসতে হবে। লাভপুরে স্বাধীনতার পতাকা তোমাকেই

তুলতে হবে।

আমি লাভপুরের মাটির ডাক শুনেছিলাম। আমার মা লিখেছিলেন চিঠি-খানা। আমার পিসীমার কথাও তাতে লেখা ছিল। মায়ের চিঠিতে ছিল—তোমার পিসীমার এবং আমার ইহা একান্ত ইচ্ছা।

আমার ধাত্রীদেবতায় পিসীমাই আমার ধাত্রীদেবতা।"

১৪ই আগস্ট মধ্যাহ্নে দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে রওনা হলাম বাবার সঙ্গে লাভপুর অভিমুখে। তারাশঙ্কর লিখছেন, "লাভপুর যেতে হলে আমদপুর স্টেশনে নেমে ছোট লাইনে চাপতে হয়, দুটো স্টেশন পর লাভপুর, সাত মাইল পথ। বিকেল ছটায় নামবার কথা, লেট হয়ে গেল। সাতটার ছোট লাইনের ট্রেন চলে গেছে। কিন্তু আমার জন্য ট্রলির ব্যবস্থা হয়েছে। সে ট্রলিতে ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা বাঁধা এবং ফুল পাতা দিয়ে সাজানো। রেলের কর্মীরা সে ব্যবস্থা করেছেন।

সেদিন ধরণীর রূপ যেন স্বতন্ত্র ছিল। আজও তা মনে পড়ছে।

প্রতীক্ষায় অনেক লোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন আমার বেয়াই নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।...তিনিই আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা করে-ছিলেন বুকে জড়িয়ে ধরে। বলেছিলেন তুমি আজ লাভপুরে না এলে চলে? মা যে ম্লান হয়ে যাবেন মনে মনে। লাভপুরের স্বাধীনতা উৎসব যে সার্থক হবে না। পূর্ণা-হুতির শিখা অধোমুখী হয়ে যাবে।" (আমার কথা)

মধ্যরাত্রি বারোটার সময় ঘরে ঘরে শঙ্খধ্বনি বেজে উঠলো।

বোমবাজি হবার শব্দে বায়ুস্তরে কম্পন তরঙ্গ এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম সে গ্রামে বার্তা বহন করে নিয়ে গেল নবভারতবর্ষের। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গ্রাম পরিক্রমা শুরু করেছিলেন লাভপুরবাসীরা, আমিও তাঁদের সঙ্গেই ছিলাম। গান গেয়েছিলাম "চক্র শোভিত উড়ে নিশান, নব ভারতের বাজে বিষাণ"—সবটা মনে নেই। শ্রীদুর্গাপদ ভট্টাচার্য গান গাইছিলেন—গলায় ঝোলানো হারমনিয়াম। (দুর্গাদা আজ সিউড়ী তিলপাড়ার বাসিন্দা)। প্রভাতে এসে হাজির হয়েছিলাম অতুলশিব ক্লাবে। সেখানেই পতাকা উঠবে—বক্তৃতা মঞ্চ রচিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর পতাকা তুললেন, স্বাধীন লাভপুর জন্ম নিল।

তিনি বক্তৃতা শেষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার অংশ দিয়ে।

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা—
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা!
স্বর্গ কি হবে না কেনা—বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।"

আমরা স্বাধীন ভারতের মাটিতে আভূমি প্রণত হয়ে, লাভপুরের ধুলায় ধূসরিত হয়ে মাতৃবন্দনা করেছিলাম—বন্দেমাতরম্—

॥ ৩ ॥

নতুন বাড়ি

কাশীপুর চিৎপুর ওপেন স্পেসের ঐ ১৭১ নম্বর প্লটের জমিটা আমার পিতৃদেব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কিনেছিলেন কলকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের কাছ থেকে ১৯৪৭ সালে। আজ্ঞে হ্যাঁ—ঐটেই আমাদের বাড়ির ঠিকানাও ছিল বহুদিন পর্যন্ত। তারপর নূতন করে নম্বর হল ২৭ নং টালাপার্ক এভিনিউ। পরবর্তীকালে ১৯৮০ সালে প্রয়াত তারাশঙ্করের নামানুসারে নূতন নাম হয় তারাশঙ্কর সরণী। তদানীন্তন কলকাতা পৌরনিগমের প্রশাসক ধ্রুবনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আগ্রহে তারাশঙ্করের তিরাশীতম জন্মদিনে ঐ নূতন নাম করা হয়েছে।

আমরা অসমাপ্ত বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করেছিলাম ১৯৪৯ সালে রথযাত্রার দিন। ঠাকুমা, বাবার পিসীমা তাঁরাও সেদিন এসেছিলেন নতুন বাড়িতে।

আমাদের বাড়ির চারপাশে আর্মড পুলিসের ব্যারাক, টালির ছাউনি দেওয়া, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি করা এলোমেলো সব শেড। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ, মাঝখানে একটা পুকুর, লাল শালুক ফুল ফুটতো তাতে। পুলিসের ভয়ে এদিকে কেউ বড় একটা আসতো না। আমাদের বাড়ির জিনিসপত্র বাইরে পড়ে থাকলেও কেউ নিয়ে যেতো না। তার কারণ পুলিসের বড়কর্তারা তাদের ইন্সপেকশন সেরে বাবার সঙ্গে একটু কথা বলে যেতেন, কখনও এক কাপ চা, কখনও বা এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে যেতেন। আমাদের বাড়ির পাশের জায়গাতে অর্থাৎ পুলিসদের রান্নাঘরের সামনেই ফাঁকা জায়গাটাতে ব্যাডমিণ্টন খেলি। বাবা আমাদের জমির মধ্যে বাড়ি ঢুকবার মুখেই তৈরি করেছেন নানারকম মরশুমী ফুলের কেয়ারী—অ্যাস্টর, কারনেশন, ক্যালেণ্ডুলা ইত্যাদি। সরু সরু বাঁশের কাঠি দিয়ে অনেক খরচ করে সুন্দর ডিজাইনের বেড়া দিয়েছেন—হাত তিনেক উঁচু। এরই গায়ে জড়িয়ে থাকত মর্ণিংগ্লোরী নীলফুল। আমাদের বাউণ্ডারী ওয়াল তখনও হয়নি। বাবা কিছু-ক্ষণ লেখেন, খানিকটা বাইরে এসে পায়চারি করেন, মধ্যে মধ্যে গাছের পাশে বসেন, কখনও বা খুরপি দিয়ে গাছের গোড়া আলগা করে দেন। বেড়ার ধারেই ছিল ক্যালেণ্ডুলার কেয়ারী—হলদে গোলাপী ফুলে ফুলে ভরে আছে, দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বাবা দাদা আমি বাইরে দাঁড়িয়ে আছি—হঠাৎ কর্পোরেশন থেকে একজন

ভদ্রলোক ম্যাপ, চেন ইত্যাদি মাপার যন্ত্রপাতি নিয়ে হাজির। এসেই সরাসরি বাবাকে বললেন—মনে হচ্ছে আপনি জায়গা এনক্রোচ করেছেন।

বাবা অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন—আপনি মেপে দেখেছেন?

ভদ্রলোক চেন দিয়ে মাপতে শুরু করলেন—শেষে কিছু হতাশ হয়েই বললেন, দেখুন এনক্রোচ হয়েছে কিনা দেখুন। বেড়ার মাথাটা আপনার জায়গা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ মাটির চাপে বেড়ার মাথাটা একটু হেলে গেছে, যার জন্যে গোড়ার অংশটা আমাদের জায়গাতে থাকলেও মাথাটা অপরের জায়গায় খানিকটা শূন্যস্থানকে দখল করেছে। বাবা মাপজোপের সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভদ্রলোকের ঐ কথা শোনার পর তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসু কণ্ঠে বললেন—এন-ক্রোচমেণ্ট হয়েছে? বেড়ার মাথাটা এনক্রোচমেণ্ট করেছে? এই বলে বেড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে বেড়ার কাঠিগুলো দুহাত দিয়ে তুলে ফেলে বললেন—এবার আর এনক্রোচমেণ্ট নেই তো?

কর্পোরেশনের ভদ্রলোক হয়ত কিছু প্রত্যাশা করে এসেছিলেন—তাই পিতৃ-দেবের এই বিস্ময়কর আচরণ দেখে আমতা আমতা করে বলেছিলেন—আমি কি তাই বলেছি নাকি—আমি কি তাই বলেছি নাকি। বলতে বলতে একরকম প্রায় ছুটে স্থানত্যাগ করলেন। আমরা দু'ভাইও হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলাম—হাসবো কি কাঁদবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে আশেপাশের জায়গাগুলোও বিক্রী হয়ে গেলো। তখন ঐ ভগ্ন ব্যারাকগুলির জিনিসপত্র যেমন টালি, সরু সরু কাঠ, শালের খুঁটি, দরজা, জানলা ইত্যাদির জন্য মাঝে মধ্যে নিলাম হতো। একবার ঠিক আমাদের বাড়ির পেছনেই নিলাম হচ্ছিলো। বাবা লিখতে লিখতে ওদিকে ঘুরছিলেন, তখন দেখলেন এক ভদ্রলোক—দেখে মনে হয় উনি নিলামের দায়িত্বে, পাশের এক ভদ্রলোককে বললেন—তাহলে ঐ কথাই রইলো, ওই দামই লিখবো। অর্থাৎ নিলাম হয়ে গেল দুজনের আপোষ চুক্তিমতো।

বাবা কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এটা কি রকম নিলাম হলো মশাই?

ভদ্রলোক মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলেন—আপনি কে মশাই কথা বলছেন?

সত্যি কথা বলতে কি, ঐ ভদ্রলোকের পক্ষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে এমন বেশে অর্থাৎ খালি গায়ে, গলায় মালার মত পৈতেটা ছোট করে রাখা, লুঙ্গির মতো করে ধুতি পরা একজন কৃষ্ণকায় মানুষকে দেখে চেনবার কথাও নয়।

বাবা ধীর কণ্ঠে বললেন—আমার নামটা বলি, তাহলেই চিনবেন। বলে নিজের নামটা জানিয়েছিলেন।

মুহূর্তে ভোজবাজি হয়ে গেলো। ফ্যাকাশে মুখে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ বাবার দিকে

চেয়ে হঠাৎ হাতের কাগজগুলি ছিঁড়ে ফেলে বললেন—এ হল না—এ হল না। আবার একদিন নতুন করে ডাক হবে—বলে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন।

বাবাও দেখলাম বেশ বিচলিত হয়ে বাড়ি ফিরলেন। খানিকটা পায়চারি করার পরে ডেস্কে বসে চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি লিখেছিলেন তদানীন্তন মুখ্য-মন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মহাশয়কে। এবং সেইদিনই লোকমারফৎ চিঠিটা রাইটার্স বিল্ডিং-এ পাঠিয়ে দিলেন।

আমরা সকলে ভুলে গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। দিন দশেক বাদে রাইটার্স থেকে ফোন এলো—মুখ্যমন্ত্রী পিতৃদেবকে পরদিন সকাল নটায় রাইটার্সে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করেছেন।

পরের দিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন এবং ফিরে এলেন ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই। বাড়ি ফিরে ঘটনা শুনে খুব অদ্ভুত লাগলো—মনে হল এমনটা না হলে কি ডাঃ বিধানচন্দ্র হওয়া যায়? ঘটনাটা যেমন শুনেছিলাম তেমনিভাবে জানাবার চেষ্টা করছি।

বাবা রাইটার্স বিল্ডিং-এ যেতেই মুখ্যমন্ত্রীর একান্ত সচিবের কাছে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হল। তাঁর ঘরে বসার জায়গাতে পাঁচ-ছটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে—এ. বি. সি. ডি. ক'রে, এক থেকে দশের মধ্যে বয়েস, তাদের সারাদেহে মালিন্য ও অপুষ্টির ছাপ, পাশে বসা রুগ্ন শ্রীহীন বছর ত্রিশের একজন বিবাহিতা মহিলা—সম্ভবতঃ এদের জননী—একান্ত সচিব এদের দিকে দেখিয়ে জানালেন, বাবা যে ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছেন—এরা সকলেই তার পরিবার—স্ত্রী পুত্র কন্যা। বাবা অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন, ভারী হয়ে উঠল তাঁর বুক, মনে হল তাঁর বুকটা মোচড় দিচ্ছে যেন। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। এমন সময় ডাক এলো মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে। তাঁর ঘরে গিয়ে চেয়ারে বসলেন। মুখ্যমন্ত্রী বাবার দিকে চেয়ে বললেন—সব দেখলেন তো?

সঙ্গে সঙ্গে বাবা হাত জোড় করে বলেছিলেন—আমি আমার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিচ্ছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী হেসে বলেছিলেন—আমি তা জানি বলেই এদের আপনার সঙ্গে পরিচয় করে দেবার জন্যে নিয়ে আসতে বলে-ছিলাম। দুজনেই বিষণ্ণ হাসি হেসেছিলেন। বাড়িতে শুনেছিলাম বাবা খেতে খেতে ঘটনাটা যখন মাকে বলছিলেন, তখন কয়েক ফোঁটা চোখের জলও তাঁর খাবারের সঙ্গে মিশে গিয়েছিলো। সেদিন তারাশঙ্কর তাঁর অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়ে কি সত্যের প্রত্যবায় করেছিলেন? কোন্ মহাজন পারে বলিতে?

আর একটা ঘটনার কথা মনে হচ্ছে। সময়টা বোধহয় ১৯৬৯ সাল। '৬৭ সালে

উনি জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পেয়েছেন। আমাদের বাড়িতে তখন বেশ কয়েকজন ওড়িষ্যা-বাসী কাজ করতো। ভরত—বছর ত্রিশেক বয়স, ছিল এদেরই একজন। কোন কারণে হয়ত মাইনে বেশি পেয়েছিলো বলে আমাদের বাড়ির কাজ ছেড়ে তালতলার একটা বাড়ি কাজ করতে চলে যায়। তার জায়গা শূন্য থাকে না—অন্য লোক আসে। এই ভরত কিছুদিন পর—বোধ হয় মাস তিনেক পরে ফিরে এলে তাকে আর কাজে নিতে পারা গেলো না। সে আমাদের পাড়াতেই একটা কাজ যোগাড় করে নিল। কিন্তু রাত্রে থাকতো আমাদের বাড়িতেই ওদের দলের সঙ্গে। তালতলার যে বাড়ি থেকে ভরত কাজ ছেড়ে এসেছিলো তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধুরন্ধর ব্যক্তি এবং তালতলা থানার সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে ছিল খুব সখ্যতা। সুতরাং একদিন রাত্রে পুলিস এসে ভরতকে ধরে নিয়ে গেলো আমাদের বাড়ি থেকে—চুরির দায়ে—ঘড়ি চুরি, টাকা চুরি ইত্যাদি। বাবা তখন ঘুমিয়ে ছিলেন, রাত্রি তুটো-আড়াইটে। বাবাকে না জাগিয়ে বাড়ির দরজা খুলে ভরতকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করা হল। পিতৃদেবের খুব ভোরে ওঠার অভ্যাস। লোকজনের কাছে খবরটা শুনেই তিনি প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দাদাকে ডেকে অত্যন্ত তিরস্কার করলেন। অন্তরালে থাকলেও বাড়ির সকলের উপর সেই তিরস্কার-বাণী বর্ষিত হয়েছিলো। তিনি আমাদের কৈফিয়ত তলব করে জানতে চাইলেন—একজন আশ্রিত মানুষকে কোন্ মানবিক নীতিতে মধ্যরাত্রে আশ্রয়চ্যুত করে তাকে পুলিসের হাতে অর্পণ করেছি? কেন তাঁকে সে সময় ডাকা হয়নি? সমগ্র বাড়িটা সেই রাত্রি থেকেই বিবেকদংশনে ছটফট করছিলো—পিতার এই কঠিন তিরস্কার আমাদের নূতন করে বুঝিয়ে দিলো কত অপাংক্তেয় আমাদের কর্মটি, কত নিম্নমানের আমাদের মনুষ্যত্ব। অধোমুখে রইলাম সকলে। উনি সকালের চা পর্যন্ত খেলেন না। মল্লিকমশাই তখন গাড়ি চালান—তাঁকে ডেকে গাড়ি বের করে সেই সকালেই তালতলা থানায় রওনা হলেন। সঙ্গে চুপচাপ আমিও উঠে পড়লাম গাড়িতে। থানায় যেতেই বড়বাবু খুব আদর যত্ন করে বসালেন ওঁকে। চা আনতে বললেন।

পিতৃদেব বলে উঠলেন—দাঁড়ান মশাই, আমি গৃহস্থ মানুষ, যে কাজে এসেছি সে কাজ ঠিকমত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত জলগ্রহণ করবো না বলে মনে মনে ঠিক করে রেখেছি। তাই আগে আমার দরবারটা শুনুন। যদি আমার বাসনা পূরণ করা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়—তবেই আপনার চা খাবো—নইলে থাক।

উনি সমস্ত ঘটনা বড়বাবুকে জানালেন। বড়বাবু অন্য ঘরে গিয়ে তাঁর সহকর্মী-দের সঙ্গে কি সব কথা বললেন জানি না—একটু পরে দেখি ভরতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন এবং অনুরোধ করলেন চা খেতে। উনি চা শেষ করে ভরতের জামিন-

দায় হয়ে কাগজপত্র সইসাবুদ করে ভরতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন—তখন বেলা প্রায় এগারোটা। মস্তবড় অপমানের বোঝা আমাদের সমগ্র বাড়িটার মন থেকে সরে গিয়েছিলো—স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলাম আমরা। মাঝে মাঝে ভরতের মামলার দিন পড়তো—ভরতকে কোর্টে যেতে হতো। মনে হয় সাত-আটবার এই রকম যাতায়াতের পর ভরত সম্পূর্ণ মুক্ত হয়। হাজারখানেক টাকা বাবার খরচ হয়েছিলো এ কাজে। ভরত সেই যে উড়িষ্যা চলে গেলো—আর তার সঙ্গে দেখা হয়নি। ওদের লোকেরা জানিয়েছিলো—ভরত দেশে চাষ করছে।

॥ ৪ ॥

অন্তরঙ্গ সাহচর্য

পিতৃসাহচর্য আমার চাইতে দাদাই পেয়েছিলেন অনেক বেশী—কারণ চাকরি উপলক্ষে আমার বেশীরভাগ সময় কেটেছে কলকাতার বাইরে। কিন্তু তবুও এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটেছে জীবনে, যার মধ্যে পিতৃদেব ও আমি ছাড়া তৃতীয় ব্যক্তি বিশেষ আর কেউ ছিলেন না।

কর্মসূত্রে বছর পাঁচেক (১৯৬৫-৬৯) আমি সিউড়ীর বাসিন্দা ছিলাম। শহরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তিলপাড়া বাঁধের কাছাকাছি ছিল আমার বাধ্যতামূলক সরকারী বাসস্থান। সেই সময়কার কয়েকটি ঘটনা মনে পড়ছে।

চিঠি পেলাম—পিতৃদেব অর্থাৎ লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় আসছেন তাঁর লাভপুর গ্রামে—দানাপুর ফাস্ট প্যাসেঞ্জারে। আমার প্রতি আদেশ আমি যেন আমার পরিবারের সকলকে নিয়ে ঐ সময় আহমদপুর স্টেশনে তাঁর জন্য অপেক্ষা করি।

আমার পরিবার বলতে দুই পুত্র, দুই কন্যা ও আমার পত্নী। নির্দেশমত সকলে মিলে অপেক্ষা করতে লাগলাম আহমদপুরের ছোট লাইনের স্টেশনে—অর্থাৎ আহ-মদপুর-কাটোয়া ন্যারো গেজের রেল স্টেশনে। সময়টা ছিল খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালের হেমন্তের অপরাহ্ণ। দানাপুর আহমদপুরে পৌঁছুতে প্রায়ই সন্ধ্যে হয়ে যায়। স্টেশনে বসে থাকা বড়ই ক্লান্তিকর—তারপর আছে ভিক্ষার্থীর উপদ্রব। প্রায় প্রতি মিনিটে একজন করে এসে হাজির হয়। তাই দু পয়সার একটা ক'রে মুদ্রা তাদের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছিলাম। দয়ার চেয়ে উপদ্রব এড়াবার জন্যে এইটাই ছিল সে সময়ে আমার কাছে আসল সত্য। এমনি একটা মুদ্রা গিয়ে পড়ল রেল লাইনের তলায়। ভিক্ষুণী এদিক ওদিক দু চারবার খুঁজল, তারপর বড় লাইনের স্টেশনের দিকে যেতে

যেতে বললে—'ও আর খুঁজতে লারি মশায়, আজ এই টেনে তারাশঙ্করবাবু আসবে, ওমন দু পয়সা কত পাব তার ঠেঁয়ে।' আমি আমার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকালাম, তিনি কথাটা শুনে মুচকি হেসে আমার দিকে চেয়েছিলেন।

ট্রেন আসবার সময় হয়েছে দেখে আমিও বড় লাইনের স্টেশনের দিকে রওনা দিলাম। ট্রেন এল। বাবা মা নামলেন। তাঁদের জিনিসপত্র নামাচ্ছি আমি আর রামচন্দ্র অর্থাৎ বাবার খাস বাহন। জিনিসপত্র নামিয়ে পেছন ফিরে দেখি পিতৃদেবের এক রাজকীয় সংবর্ধনার আয়োজন চলছে প্লাটফর্মের উপরেই! রাজকীয় সংবর্ধনার সংজ্ঞা কি আমি ঠিক জানি না। সেখানে স্টেশন মাস্টার ছাড়া রাজাউজীর বা তাঁর কোন প্রতিনিধি সেদিন উপস্থিত ছিলেন না। ছিল ত্রিশ-চল্লিশজন মানুষ—মলিন তাদের বসন, প্রায় উন্মুক্ত তাদের ঊর্ধ্বাঙ্গ, হাতে ভিক্ষাপাত্র। এরাই ছিল সেদিন সেই মিছিলের যাত্রী। ওরা প্রায় সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করেছিল—কেমন আছগো বাবু!

তারাশঙ্কর বলেছিলেন, তোমাদের খবর বল।

তারপর সে এক বিচিত্র কলকলানি, তারা তাদের ব্যথার কথা নিবেদন করেছিল।

মার্চ করে ছোট লাইনে পৌঁছুবামাত্র স্টেশনমাস্টার চেয়ার বের করে দিলেন বাবা মাকে বসতে। মা এবার বাবার হাতে নিঃশব্দে একটি ছোট পুঁটলি বার ক'রে দিলেন। বাবা তার মধ্যে থেকে সিকি আধুলী বার করে সকলকে কিছু কিছু দিলেন। আমার মত ছুঁড়ে নয়—হাতে হাতে। বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানশিক্ষিত মানুষ আমি, এসবে আমার বিশ্বাস তেমন নেই। তবু সেদিন পিতৃদেবের সেই অপরূপ বিজয়-বাহিনী দেখে শুধু মুগ্ধই হইনি, চোখে জলও এসে গিয়েছিল।

স্টেশনমাস্টার আহমদপুর থেকে টেলিগ্রাফে লাভপুরে তারাশঙ্করের আগমনের কথা জানিয়ে দিলেন। লাভপুর পৌঁছে দেখি ছোটকাকা একটা হ্যাজাক আর লোক-জন নিয়ে স্টেশনে হাজির।

রাত্রিটা লাভপুরে কাটিয়ে পরের দিন প্রত্যুষে আমি একাই ফিরে গেলাম আমার কর্মস্থলে। দুদিন পর অর্থাৎ ওঁদের ফেরার দিনে হাজির হলাম লাভপুরে। দূর থেকে দেখতে পেলাম আমাদের বাড়ির বসবার জায়গাটা লোকে লোকারণ্য। দেখা যাচ্ছে ওপাশে বসে আছে কবি উপন্যাসের নিতাই কবিয়াল, সতীশ ডোম, তার বন্ধু রাজন—রাজামিঞা, ওপাশে বসে আছে হাঁসুলীবাঁকের করালীমণ্ডল, নসুবালা অর্থাৎ নসো বাউড়ী শাড়ি পরে মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে বাবার কাঁধে হাত রেখে সিগারেট খাচ্ছে আর মিটি মিটি হাসছে। আমার ঠিক আগে আগে দুধের ঘটি মাথায় ঢুকলো হাঁসুলীবাঁকের পাখী—বসনের মেয়ে ময়না। ঐ দূরে বসে আছে

গণদেবতার দ্বারিকা চৌধুরীর বংশধর। এপাশে পাতু বায়েনের পুত্র জগা, শিশু কোলে শশী ডোমের পুত্রবধূ—অর্থাৎ তারাশঙ্কর সাহিত্যের চরিত্রগুলির আদি কোষের এক জীবন্ত মেলা। দাওয়ার উপরে রয়েছে এক বস্তা চাল। রাম কাউকে কাউকে চাল দিচ্ছে মেপে। চায়ের কাপও রয়েছে কয়েকজনের হাতে। বাবা মাঝে মাঝে ছোট কাগজে স্লিপ্ লিখে কারো কারো হাতে দিচ্ছেন। ধুতি শাড়ির জন্য স্লিপ্ যাচ্ছে বিনয় হাটীর দোকানে। বিশু এবং ফটিক ডাক্তারকে লিখছেন—'একে একটু দেখে ঔষধ দিও।' বিনয় হাটীকে দেওয়া স্লিপ্‌গুলি বিলের সঙ্গে ফিরে আসত। কিন্তু ডাক্তারের দেওয়া স্লিপ্‌গুলি তাঁদের কাছেই আছে। তাঁরা কখনও বিল পাঠাননি তারাশঙ্করের কাছে।

দুপুরে খাওয়ার পর ফেরার পালা। শ্রীভূপতি সাহার দোকানে চালের দাম, শ্রীবিনয় হাটীর দোকানে জামা-কাপড়ের দাম, যোগেশের দোকানে মিষ্টির দাম এবং স্থানীয় বাকী দেনা শোধ করতে গিয়ে দেখা গেল, ফিরে যাবার জন্যে যে টাকাটা রাখা আছে, সেটা খরচ করেও দেনা শোধ হচ্ছে না। তখন আবার বিশু ডাক্তারের কাছে রামচন্দ্র ছুটল বাবার চিঠি নিয়ে—"বিশু পাঁচ'শ টাকা দিও। তারাশঙ্কর।"

এর পরের বছর '৬৭ সালে পূজার ছুটিতে লাভপুর গেছি, ষষ্ঠীপূজার দিন বিকেলবেলা সেখানে পৌঁছুলাম। বাবা, মা আগেই সেখানে এসেছেন। বাবা তাঁর নাতি-নাতনীদের সঙ্গে ছোটখাটো হাসি ঠাট্টা গল্পে মেতে উঠলেন। পত্নী কথা বলতে লাগল তার শাশুড়ির সঙ্গে। আমি শ্রোতা হয়ে চুপচাপ বসে রইলাম।

লাভপুরে সে সময়ে প্রধান চারটে পূজো ছিল। এগুলির বয়স একশ বছরের উপরই হবে। এদের মধ্যে একটা ছিল আমাদের—বলা হ'ত 'নীচের সদর', অন্যটা সবচেয়ে প্রাচীন, সরকারবাবুদের পূজো, বলা হত 'উপর সদর'। অন্য দুটো দত্ত পাড়া ও কুলীন পাড়ার পূজো।

সরকারবাবুদের বংশের কোন এক কন্যার বংশধর হলাম আমরা—অর্থাৎ আমরা ছিলাম ওঁদের দৌহিত্র বংশীয়। ঐ কারণে উপর সদরের পূজাতে আমাদেরও নিমন্ত্রণ থাকতো। ঐ পূজাতে এই নিমন্ত্রণের একটা বিশেষ আকর্ষণ ও লোভনীয় অংশ ছিল তার নবমী পূজার রাত্রে খাবার নিমন্ত্রণ। নবমী পূজাতে অনেক ছাগল বলি হ'ত এবং মধ্য রাত্রে পূজার ভোগ অর্থাৎ খিচুড়ি এবং মাংস খাওয়ানো হ'ত। খাওয়ার চাইতে রাত্রি জেগে চাঁদের আলোতে দল বেঁধে গ্রামটা ঘুরে বেড়ানো—লোককে ভয় দেখানো অথবা আলোতে বসে তাস খেলা এই সবই ছিল প্রধান আকর্ষণ। আমরা দল বেঁধে একবার স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত নাটকও অভিনয় করেছি। ঐ

সব কারণে নবমী পূজার রাত্রির নিমন্ত্রণ আমাদের কাছে সারা বছরের একটা প্রতীক্ষার বস্তু ছিল। আমি আমার ছোট বয়সের কথা বলছি। কোন কোন বছর আমাদের গুরুজনদের বদান্যতায় তাঁদের শাসন গণ্ডীর ছাড়পত্র পেয়ে পূজার রাত্রির মাদকতায় অংশ নিতে পেরেছি। কিন্তু বেশীর ভাগই পারিনি। কারণ তাঁদের যুক্তি ছিল "এইটুকু বয়সে অত রাত্রে নেমন্তন্ন খেতে যাবে কি?" গুরুজনদের এই অকাট্য যুক্তি খণ্ডন করার মতো সাহস ও বুদ্ধি আমাদের থাকার কথা নয় বিশেষ করে প্রতিপক্ষ যেখানে পিতৃদেব তারাশঙ্কর।

সেবার নবমী পূজার দিন সন্ধ্যেতে বেড়িয়ে ফিরে মাকে ব্যগ্রতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করি—'মা উপর সদর থেকে কি নেমন্তন্ন করে গেছে?' বাবা ঘরের মধ্যে ছিলেন, তিনি বলে উঠলেন—'বল কি হে! তোমার কি আর অত রাত্রে নেমন্তন্ন খাওয়ার বয়স আছে?'

রাগ হয়ে গেল খুব। মানসপটে শৈশব, কৈশোর যৌবনকালের ঐ নেমন্তন্নে অংশ নিতে না পাওয়ায় ঘটনাগুলো ছবির মত ভেসে উঠল। ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিলাম—"ঠিক বলেছেন, যখন ছোট ছিলাম তখনও বলেছেন এই বয়সে কি নেমন্তন্ন খেতে যায়? তার পর যখন বিয়ে হ'ল তখন বলেছেন বৌমাকে একলা রেখে নেমন্তন্ন খেতে যাবে কি? আজ আমার চুলে পাক ধরেছে, আজও বলছেন ঠিক ওই একই কথা। নেমন্তন্ন খাওয়ার আর আমার বয়স হ'ল না বাবা! ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন তখন আর নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি না তবে বাড়িতেও আজ খাচ্ছি না।

মা কাকারা সব হেসে উঠেছিলেন, কিন্তু বাবা চুপ করে গিয়েছিলেন লজ্জিত হয়ে। আমিও ঐ পিতার পুত্র, আমারও জেদ কম ছিল না। সেরাত্রি আমি উপবাসী রইলাম। সবচেয়ে দুঃখের কথা পিতার অনেক অনুরোধেও সেদিন রাত্রে কোন আহার্য গ্রহণ করিনি।

আজ অত্যন্ত ব্যথিতচিত্তে আমার ঐ দিনের অপরাধ এবং ঔদ্ধত্যের জন্যে আমার আলোকসন্ধানী স্বর্গতঃ পিতার ক্ষমা প্রত্যাশী হয়ে তাঁর তর্পণ করি।

এর বছর দুয়েক পরের আরও একদিনের কথা মনে পড়ছে। সিউড়ীতে থাকাকালীন দপ্তরের কাজ নিয়ে কলকাতা এসেছি কয়েকদিনের জন্য। তখন 'পূর্ণিমা-সম্মেলন' হত সাহিত্যিকদের মধ্যে মেলামেশা ভাব-বিনিময় পরিচয় এসবের জন্য। প্রতি পূর্ণিমাতে এক একবার এক একজনের ভবনে মিলিত হতেন। এই পূর্ণিমা সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। রবীন্দ্রনাথও একবার এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন এবং ফাগ খেলায় অংশগ্রহণ করে মন্তব্য করেছিলেন, 'আজ দ্বিজুবাবু শুধু মনোরঞ্জন করেননি, সর্বাঙ্গ রঞ্জিত করলেন।' সেদিন তিনি তাঁর সুরেলা

কণ্ঠে একটি গানও পরিবেশন করেন। ঐ পূর্ণিমা-মিলনে জলযোগের ব্যবস্থা থাকতো ভালরকম। দ্বিজেন্দ্রলাল একটি গানও লিখেছিলেন এ নিয়ে—

এটা নয় কলার ভোজের নিমন্ত্রণ।
(হেথা) আছে কিছু জলযোগ আর চায়ের মাত্র আয়োজন।
আজ সাহিত্যিক সব ছোটবড়
আনন্দেতে হয়ে জড়ো
সানন্দ আর ভ্রাতৃভাবে করতে হবে কাল হরণ॥ ইত্যাদি

তবে আমি যে সময়ের কথা বলছি—সে পূর্ণিমা সম্মেলনের পিতৃদেব ছিলেন এর সভাপতি। তিনি মিটিংয়ে যাবেন এবং আমি সে সময় কলকাতা এসে পড়ায় সঙ্গী হিসাবে বাবার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আমাকে মনোনীত করা হল। ঠিক হল অফিসের কাজ সেরে একটু তাড়াতাড়ি ফিরে আসবো আমি এবং তাঁর সঙ্গে কালীঘাটে ঐ মিটিংয়ে যাব। কালীঘাটে ঠিক মন্দিরের পেছনেই সেবারের পূর্ণিমা-মিলনের স্থান নির্বাচিত হয়েছিলো। চারটের সময় বাড়ি ফিরে দেখলাম মা এবং বাবা দুজনেই বেশ উত্তেজিত—অর্থাৎ বাক-যুদ্ধ চলছিলো তাঁদের। তাঁদের ভাবগতিক দেখে চলে এলাম নিজের ঘরে। স্ত্রীকে কিছু খাদ্য দিতে বললাম। কিন্তু খাওয়ার সময় হ'ল না। উচ্চকণ্ঠে পিতৃদেবের ডাক শুনে তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলাম। মনে মনে ভাবলাম যেখানে যাচ্ছি খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা নিশ্চয়ই ভালরকম থাকবে সুতরাং আরও একটু সময় অভুক্ত থাকাটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে। যেমনটি ভেবেছিলাম ঠিক তাই। বাড়ি ঢুকতেই দেখলাম কয়েকজন ভোজন করছেন, পোলাও, চিংড়ির মালাই, বড় বড় রাজভোগ ইত্যাদি। মনে হ'ল এদের সঙ্গে বসে যেতে পারলে মন্দ হতো না। কিন্তু পিতৃ-আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তা সম্ভব নয়।

মিটিং শেষ করে আধঘণ্টার মধ্যেই বাবা উঠে পড়লেন। কর্মকর্তারা অনুরোধ জানালেন খেয়ে যাবার জন্যে। বাবা বললেন, 'আমি তো এ সব খাই না।' আমার জন্যে বলতে উনি বলে উঠলেন—"আরে না না, ও তো এইমাত্র বাড়ি থেকে খেয়ে বেরিয়েছে।" এই সব কথা বলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। করালী ড্রাইভার সোঁ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লো কালীঘাট থেকে। আমার তখন স্বাভাবিক কারণে রেগে ওঠার কথা—তার উপর পেটে তখন ভীষণ ক্ষিধে। সুতরাং আমার চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। বাবা দু-একটা কথা বললেন। আমি কিন্তু চুপ করেই থাকলাম। বুদ্ধিমান লোক—ঠিক বুঝে ফেলেছেন আমার রাগ হওয়ার কথা। এবার হেসে একটু ব্যঙ্গ করে বললেন—'ওইগুলো খেতে পাওনি বলে বুঝি তোমার রাগ হয়েছে?' আমি চুপ করে থাকলাম। আবার

বললেন—'আচ্ছা লোভী তো তুমি ?'

আমি এবার জবাব দিয়েছিলাম। 'লোভী কাকে বলছেন আপনি ? আপনি বাড়িতে খাদ্য গ্রহণ করেন না ? আপনার খিদে পায় না ?' আমার কণ্ঠস্বরে উনি চমকে উঠে বললেন—'তুমি কি অফিস থেকে ফিরে বাড়িতে খাওনি ?'

'কই আর খেলাম ! খেতে যাচ্ছিলাম—তখনই তো আপনার ডাক শুনে তা রেখে চলে এলাম। এখানেও দিলেন না খেতে। আমি ক্ষুধার্ত একথাটা কেন একবার মনে হ'ল না আপনার ?'

আবার সেই দু'বছর আগেকার ঘটনার মত চুপ করে গেলেন আমার কথা শুনে। শুধু ড্রাইভারকে বললেন—'ওরে, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে চল।' বাড়ি ফিরে সবিস্তারে ঘটনাটা উনিই বলেছিলেন সকলকে। সকলেই বিচারের রায়ও দিয়েছিলেন আমার পক্ষে। উনি চুপ করে থেকে ওঁর অন্যায়টা মেনেও নিয়েছিলেন।

আরও একটা এইরকম ঘটনার কথা মনে হচ্ছে। তবে সেটা এই ঘটনাগুলির কিছু আগের। ১৯৬০/৬১ সাল। তখন আমি কলকাতাতেই থাকি। বেঙ্গল পাবলিশার্সের অন্যতম অংশীদার শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহশয়ের বাড়িতে বিবাহ বা পৈতা উপলক্ষে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ। অফিস থেকে ফিরে এসে অল্প কিছু মুখে দিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ি যাব। বালিগঞ্জে ত্রিকোণ পার্কের কাছে যেতে হবে। গেলাম সেখানে—কিন্তু বাবা বাড়ি খুঁজে পেলেন না—কারণ তাঁরা নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা অন্য একটা বাড়ি ভাড়া করে ব্যবস্থা করেছেন। বাড়ি থেকে বাবা কার্ডও নিয়ে যাননি যে তার থেকে ঠিকানাটা জেনে নেবো। ব্যস আর কি ! খানিকটা এদিক ওদিক ঘোরাঘুরি করে বাড়ি ফিরে এলাম টালাতে।

উপরের ঐ ঘটনাগুলি থেকে আমি যে পেটুক একথা প্রমাণ করতে খুব বেশী অসুবিধা নেই—যদিও আমি তা নই একথা প্রমাণ করতে অনেক সাফাই আমার তরফ থেকে দিয়েছি।

পিতৃদেবের এইরকম গুরুভোজনের ব্যাপারে একটা প্রবল অনীহা ছিল। সেগুলি তিনি এড়িয়ে যেতে চাইতেন—সুগন্ধময় খাদ্যের জগতে থাকতেই চাইতেন না। কারণ তাঁর পরিপাক যন্ত্রটি বরাবরই ছিল দুর্বল। সুতরাং জিহ্বার দাবী যাতে প্রাধান্য না পায় সেজন্যই হয়ত সরে যেতে চাইতেন এসব জায়গা থেকে। আবার খাদ্যতালিকায় যেখানে মিষ্টান্ন প্রধান সেখানে তিনি নিজেও খেতেন এবং সঙ্গীকে যত্ন করে বেশী করে খাওয়াতেন।

নিঃসংশয়ে বলা যায়, খাবার ব্যাপারে উনি ছিলেন অসাধারণ সংযমী।

জিহ্বার দাবী মেটাতে ওঁকে কখনও অনিয়ম করতে দেখিনি। পরিপাক যন্ত্রের

সঙ্গে বিরোধ না ঘটিয়ে জিহ্বার দাবী মেটাতে যে বস্তুগুলির প্রতি ওঁর আকর্ষণ ছিল—সেগুলির একটা সমন্বয় ঘটিয়ে ওঁর দৈনিক আহার্যের তালিকা তৈরি হয়েছিলো।

ভাল চা পছন্দ করতেন এবং ভাল-মন্দ প্রচুর চা পান করতেন সারাদিনে। সকালে চায়ের সঙ্গে থাকতো ক্রীমক্রেকার বিস্কুট—ওঁর খুব পছন্দের জিনিস। দুধ বিশেষ পছন্দ করতেন না। তবে যেহেতু ওটা দিয়ে চটপট উদরপূর্তি করে ফেলা যায় সেইহেতু ওটা খেয়ে নিতেন লিখতে লিখতে দশটার মধ্যে। দুপুরে ভাত, মাছের ঝোল—সামান্য একটু সেদ্ধ বা সব্জী। ভাতের সঙ্গে ঘি পেলে খুশী হতেন, ইলিশমাছ পেলে আরো খুশী বেশী হতেন। কিন্তু চিকিৎকদের স্নেহজাতীয় খাদ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে ইলিশমাছ খুব একটা আনা হতো না বাড়িতে। যদিও ওঁর জন্মদিনে ওটা একটা কমপাল্‌সারী আইটেম ছিল—কলকাতা আসার পর থেকে। আর যেটা পেলে সবচেয়ে খুশী হতেন তা হ'ল ভাল ঘি দিয়ে ভাজা ময়দার লুচি এবং হাল্‌কা মাংসের ঝোল। কিন্তু লুচির বদলে ওঁকে খেতে হতো সেঁকা পাউরুটি ও মাংসের স্টু—ঐ চিকিৎসকদের নির্দেশে। ভাল সন্দেশের উপর আসক্তি ছিল তবে তাতে প্রাবল্য ছিল না। ফলের মধ্যে পছন্দ করতেন ল্যাংড়া আম—কয়েক কুচি। কালো জাম পেলে খুশী হতেন। মনে পড়ছে, নরেন্দ্রনাথ মিত্রের স্ত্রী শ্রীমতী শোভনা বৌদি প্রতি বৎসর ছোট এক ঝুড়ি জাম উপহার দিয়ে যেতেন তাঁকে।

সুতরাং এই ছিল যাঁর নিত্যদিনের খাদ্যতালিকা—তাঁর পক্ষে আমাকে লোভী মনে করতে একদম দোষ থাকার কথা নয়।

॥ ৫ ॥

তর্পণ

লেখক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৭ সালে তাঁর সাহিত্যকীর্তির জন্য জ্ঞানপীঠ পুরস্কারে সম্মানিত হন। সেই উপলক্ষে ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে বীরভূম জেলার সিউড়ীতে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর ব্যবস্থা করা হয়—এর সঙ্গে একটি সাহিত্য সম্মেলনেরও ব্যবস্থা করা হয়েছিল। উদ্যোক্তা ছিলেন সিউড়ীর বিখ্যাত ডাক্তার কালীগতি বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (উপাচার্য ডঃ রমারঞ্জনের পিতা), এবং রামরতন পৌর ভবনের কর্মকর্তাগণ।

সম্বর্ধনা জানানো হয় রামরতন পৌরভবন হলে এবং সাহিত্যসভা হয়েছিল রবীন্দ্রভবনে। কলকাতা থেকে এসেছিলেন ডঃ কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত এবং আরও দু-একজন।

আমি তখন সিউড়ীতে পোস্টেড। আমি তারাশঙ্কর-আত্মজ সুতরাং বাবা এসে উঠলেন আমার কর্মস্থলের বাসায়, সঙ্গে আমার মা। আমার বাসা ছিল সিউড়ী শহর ছাড়িয়ে ময়ূরাক্ষী ব্যারেজের কাছাকাছি। সামনে দিয়ে চলে গেছে ঐ ব্যারেজের উপর দিয়ে সুন্দর রাস্তা—সিউড়ী-দুমকা রোড—ম্যাসেঞ্জোর হয়ে দুমকা-দেওঘর ইত্যাদি।

বাবা সভা থেকে ফিরে এসে আমাকে আদেশ করলেন একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতে—উনি 'মোলপুর' যাবেন। এই অখ্যাত গ্রামটির নাম আমার শোনা ছিল—কিন্তু কোথায় তা জানা ছিল না। বাবা জেনে এসেছেন—যেতে হবে ব্যারেজের উপর দিয়ে, ম্যাসেঞ্জোরের রাস্তা ধরে দশ-পনেরো মাইল গেলে এই গ্রামটি পাওয়া যাবে।

আমি জানতাম মোলপুর গ্রামের সঙ্গে বাবার আত্মিক আকর্ষণ রয়েছে—কারণ ঐ মোলপুরের কোনো এক রমণী যাঁর নাম ছিল মানদাসুন্দরী, তাঁর রক্তধারা বইছে বাবার শরীরে, আমাদের ধমনীতে। বাবার পিতামহী ছিলেন তিনি। তাঁরই গর্ভজাত পুত্র হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন আমার পিতামহ। এঁর এক ভাই ছিলেন যাঁর কেউ ছিল না। তিনি একসময়ে বাল্যে পিতৃহীন তারাশঙ্করের অভিভাবক খেলার সাথী এবং পিতৃহীন বালকের দুঃখের সান্ত্বনা ছিলেন। এঁর পরিচয় ছিল 'মোলপুরের দাদা'। তারাশঙ্করের 'স্মৃতিকথা' থেকে কিছু অংশ তুলে ধরছি—

"আমার আট বছর বয়সের সময় আমার বাবা মারা যান। তারপর আমাদের বাড়ির অভিভাবক হয়ে আসেন আমার বাবার মাতুল। তাঁরও ত্রিসংসারে কেউ ছিল না—তাঁর ওই ভাগিনেয়টি ছাড়া। আমাদের ভাগ্য—বৎসর চারেক পরে তিনিও মারা গেলেন এবং আমরা সংসারে হলাম একান্তভাবে পুরুষ অভিভাবক-হীন।" বলাবাহুল্য ঐ মানুষটিই হলেন বাবার মোলপুরের দাদা।

পরের দিন খাওয়াদাওয়ার পর পড়ন্ত দুপুরের দিকে রওনা হলাম একটা কালো আমবাসাডার গাড়ি করে। বাবা ও আমার ছেলেমেয়ে বসেছে পেছনে তাঁর পাশে, আমি আছি সামনের সীটে। যাবার সময় চুপিচুপি আমার বন্দুকটাও গাড়িতে নিয়েছিলাম—রাস্তায় দেখতে পেলে তিতির নিধন করবো। তিতিরের মাংস নাকি অত্যন্ত সুস্বাদু।

ময়ূরাক্ষী পার হয়ে দুমকা রোড ধরে রওনা হলাম—সুন্দর রাস্তা, পথের দুপাশে কোথাও শাল, কোথাও মহুয়ার ছাড়া ছাড়া জঙ্গল, দূরে পাহাড়ের নীলাভ ছায়া। মোলপুর জায়গাটা কোথায় ঠিক জানি না—তাই মাঝে মাঝে গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়ি থেকে নেমে জায়গাটার সন্ধান করি। জিজ্ঞেস করে জানতে চেষ্টা করি।

আরও কিছু যাওয়ার পর বাবা বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন—ও তোমার কর্ম নয়—বলে গাড়ি থামিয়ে তিনি নেমে পড়লেন। নেমে পড়েই তিনি মারলেন জোর এক হাঁক—'হেই মশায়! একবারটি শুনবেন তো ইধার।' দূরে মাঠে কাজ করছিলো মানুষজন, ব্যস কথা আরম্ভ হয়ে গেলো। একদল কালো কালো ময়লা কাপড়পরা মানুষের সঙ্গে। কত কথা হল—এমনকি ঐ বয়স্ক লোকটির বাড়িতে মেয়ের কি অসুখ হয়েছে তাও জানা হয়ে গেলো। তাকে একটা চিরকুট লিখে দিলেন কালীগতি ডাক্তারের নামে। কালীগতি ডাক্তারকে দিয়ে তার মেয়ের চিকিৎসা তার কাছে তখন স্বর্গলাভের চেয়েও অসম্ভব ব্যাপার। তাদের সিগারেট দিলেন, নিজেও ধরালেন। দেখে মনে হচ্ছিল যেন এরা কত দিনের চেনাজানা মানুষ—কত আপনজন।

এই ফাঁকে আমি বন্দুক বার করি, দূরে একটা উইঢিপির পাশে ঝোপটায় তিতিরের আওয়াজ পেয়েছি। সেদিকে এগিয়ে গেলাম চুপিচুপি। বন্দুক তুলে নিশানা শুরু করেছি রাস্তার দিকে পেছন ফিরে—হঠাৎ একটা ঢিল এসে পড়লো ওই উইঢিপিটার উপর। পাখিগুলো ফর ফর করে উড়ে গেলো। অদৃশ্য হয়ে গেলো বলা যেতে পারে। চটে গেছিলাম—পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি পিতৃদেব আমার দিকে চেয়ে মিটিমিটি হাসছেন—আর লোকগুলিকে বলছেন—'বেটার আমার বিনিপয়সায় মাংস খাবার লোভ হয়েছে—' বলে হা হা করে হেসে উঠলেন। চটে ওঠা মনটা এবার লজ্জা পেলো—মাথা নীচু হয়ে গেলো আপনা থেকেই। এই রকম একটা ঘটনার উল্লেখ আছে খ্যাতিমান সাহিত্যিক কালকূটের রচনায়—'শাম্ব'তে। তাঁর ভাষায় 'দিঙ্ উদ্ভাসিত সাহিত্য রচয়িতা তারাশঙ্কর' যাঁকে তিনি ডাকতেন 'দাদা' বলে—তিনি লিখেছেন—

"একবার দাদার সঙ্গে গিয়েছি সাঁওতাল পরগণার শিমুলতলায়। আরো অনেকে ছিলেন। কেন, কী বৃত্তান্ত, সে সব কথা থাক। আবহাওয়াটা দঙ্গলের চড়ুইভাতির মতোই। দুপুরবেলা খেয়েদেয়ে বিশ্রাম করে, ঠিক হলো তিন মাইল দূরে তিলুয়া-বাজারের হাটে যাওয়া হবে বাজার করবার জন্যে। আসলে সেও এক ভ্রমণ।

হাটে একটি সাঁওতাল মেয়ে, খাঁচায় পুরে নিয়ে এসেছিল কয়েকটি পায়রা। নতুন পাখনা গজানো নধর পায়রা। সচকিত ভীরু পায়রাগুলো খাঁচার মধ্যে হাটের ভীড় দেখে ছটফট করছিল। হঠাৎ আমার মনে হয়েছিল, অনেককাল পায়রার মাংস খাওয়া হয়নি। দাদাকে বললাম, 'পায়রা ক'টা কেনা যাক, মাংস খাবো।'

দাদা তাঁর মোটা লেন্সের চশমায়, খয়েরি উজ্জ্বল চোখে অবাক হয়ে তাকিয়ে বললেন, 'পায়রার মাংস খাবি?'

তারপর পায়রাগুলোর দিকে তাকালেন, পায়রাদের থেকে চোখ তুলে সাঁওতাল

মেয়েটির দিকে।

আমাকে বললেন, 'তা হলে কিনে ফ্যাল।'

কিনে ফেলেছিলাম। দাম শুনে তো নিজেকে মনে হয়েছিল, 'ড্যানচিবাবু।'

দাদা হাত বাড়িয়ে বলেছিলেন, 'দেখি।'

খাঁচাটা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম তাঁর দিকে। তিনি খাঁচার দরজাটি খুলতে খুলতে বলেছিলেন, 'পায়রার মাংস খাবি? খা!' বলে একটি একটি করে পায়রাকে ধরে বাইরে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন।

আমি হাহাকার করতে গিয়ে দেখেছিলাম, সাঁওতাল পরগণার হেমন্তের আকাশে পড়ন্ত বেলার রোদে, চিত্রগ্রীবের দল কেমন রঙবাহারে উড়ে গিয়েছিল। দাদা তাকিয়ে ছিলেন আমার মুখের দিকে। না, অনুশোচনার কিছুমাত্র অভিব্যক্তি ছিল না তাঁর চোখেমুখে। বরং মিটিমিটি হাসি। বলেছিলেন, 'আরো পায়রা কিনবি নাকি? চল্ দেখি, হাটে নিশ্চয় আরো পায়রা এসেছে'।"

যাইহোক শেষ পর্যন্ত একটি ছোট্ট গ্রামে গিয়ে পৌঁছুলাম। কোথায় কি? ভাঙা-চোরা মাটির ঘর, খড়ের চাল, তাও মাঝে মাঝে উড়ে গেছে। ঘরে চাঁদের আলো ঢোকার সুন্দর প্রবেশপথ সৃষ্ট হয়েছে। খোঁজখবর দিয়ে বসতবাড়ির সেই জায়গাতে আমরা পৌঁছলাম। দেখলাম একটা ভগ্নস্তূপ রয়েছে—আমাদের সামনে। বোঝা যায় এখানে এককালে একটা মাটির বাড়ি ছিল—বাবার পিতামহীর বাড়ি। চুপ করে দাঁড়ালাম সেখানে এসে। এর মধ্যে কলেজে পড়া দুচারজন ছেলে—তারাশঙ্কর তাদের গ্রামে এসেছেন শুনে তাঁর চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ালো। বাবা তাদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছিলেন শান্ত গলায়। সিউড়ী থেকে এক হাঁড়ি বিখ্যাত বালুসাই নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। সেটি আমার মেয়ে মঞ্জুর হাতে দিয়ে সকলকে দিতে আদেশ দিলেন। বিতরণ শেষ হলে বলেছিলেন, 'এই ভগ্নস্তূপে একসময় এক রাজকন্যা বাস করতেন—তিনিই ছিলেন আমার পিতামহী। আমি অবশ্য তাঁকে প্রণাম করার সুযোগ পাইনি, তিনি অতি অল্প বয়সেই মারা যান। আমার বাবার বয়স তখন চার-পাঁচ। আমি তাঁর জন্মস্থানকে প্রণাম জানাতে এসেছিলাম। এরপর চুপ করে গিয়েছিলেন তিনি। তারপর বিড়বিড় করে কি যেন বলেছিলেন। আমি শুনতে পেয়েছিলাম—উনি বলছেন,

ওঁ আব্রহ্মভুবনাল্লোকা দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ।
তৃপ্যন্তু পিতরঃ সর্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥
অতীতকুলকোটিনাং সপ্তদ্বীপনিবাসিনাম্।
ময়াদত্তেন তোয়েন তৃপ্যন্তু ভুবনত্রয়ম্॥

ফেরার পথে সারা রাস্তা একটি কথাও বলেননি—চুপ করে প্রায় ধ্যানস্থ হয়ে বসে ছিলেন। হঠাৎ একবার মুখ ফেরালাম তাঁর দিকে। দেখেছিলাম তাঁর উজ্জ্বল পিঙ্গল চোখ দুটোতে অশ্রুবিন্দু চিকচিক করছে।

॥ ৬ ॥

লালাবাবুর দেউলে

সেদিন কি একটা ছুটির দিন, রবিবারও হতে পারে। আমরা সকলে বাড়িতে আছি। বাবা তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় যথারীতি লেখার জায়গাতে বসে 'আরোগ্য-নিকেতনে'র নতুন সংস্করণটা উল্টেপাল্টে দেখছেন।

১৯৫৩ সাল, বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেন কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ ও যতীন্দ্রমোহন দত্ত। বিমল সিংহ মহাশয় তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী, আর যতীন্দ্রমোহন দত্ত সংক্ষেপে যমদত্ত—যিনি একদিন গবেষণা করে ভূতের ওজন বের করে ফেলেছিলেন—শুধুমাত্র 'সরিষার মধ্যে ভূত' এই প্রবাদ বাক্যটি থেকে। অর্থাৎ একটা সরিষার যা ওজন সেটা হল সরিষার ওজন ও তার মধ্যে থাকা ভূতের ওজনের সমষ্টি—মাত্র কয়েক মিলিগ্রাম। তিনি ছিলেন তখনকার দিনের অঙ্কে এম এ. অথবা এম.এস-সি.। পেশায় আইনবিদ্। হিন্দুমহাসভার প্রচণ্ড ভক্ত। খটরোগা মানুষ। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও ওঁকে বেশ সমীহ করে চলতেন। একবার কি একটা হিন্দুমহাসভার ঘরোয়া মিটিংয়ে একটি উপদ্রুত জায়গা পরিদর্শন প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ যতীনবাবুকে বলেছিলেন—আপনি যান না। যতীনবাবু বিরক্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন—আমি কেন যাব? আমি কি হিন্দুমহাসভার প্রেসিডেন্ট? যেতে হলে আপনি যাবেন—আমি নয়। এই ঘটনাটা উনি যখন বাবার কাছে গল্প করছিলেন তখন মুখ থেকে আমরা শুনেছিলাম। যমদত্ত বাবার চেয়ে হয়ত এক আধ বছরের বড় ছিলেন; কিন্তু কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় ছিলেন এঁদের দুজনেরই বয়োকনিষ্ঠ। তফাতটা বেশী না হলেও খুব কমও নয়। তবে আশ্চর্যের কথা এই তিন-জনেরই অন্তরের কোন এক গভীরতম অংশের সূক্ষ্ম বীণাতন্ত্রী একই সুরের মূর্ছনায় কম্পিত হত। সেই এঁরা যখন কথাবার্তা বলতেন তখন শুনে মনে হ'ত এঁরা তিনজনে বড্ড বেশী আপনজন। তিনজনেই যেন উল্লাসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন। একদিকে বিমল সিংহ মহাশয়ের মত অসাধারণ কৃষ্টিবান ভদ্রমানুষ, অন্যদিকে যমদত্ত ছিলেন কিছু কটকটে। মধ্যে মধ্যে বাবার সঙ্গে তর্ক লেগে যেতো তাঁর। আবার পরক্ষণেই তিনজনের উচ্চ হাস্যরোল উঠতো।

এই যমদত্তের কাছেই বাবা গচ্ছিত রেখে গিয়েছিলেন তাঁর উইল। যমদত্ত বাবার ইচ্ছানুসারে তা তৈরি করেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর আমাদের পরিবারের সামনে পাঠ করে মায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। এঁরা দুজনেই ছিলেন আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বাড়ির সব কিছুই অকপটে এঁদের কাছে বলা যেতো।

বিমল সিংহ মহাশয় সম্বন্ধে ছোট দুটো ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৫০ সালের কথা —টালাতে বাড়ি করে বাবার হাত তখন শূন্য—সঞ্চয় নেই বরং কিছু ধারদেনা হয়ে গিয়েছে। তাই সময়মত টেলিফোনের বিল জমা পড়েনি। টেলিফোন অফিস থেকে জানিয়েছে বিশেষ একটা তারিখের মধ্যে সেটা জমা না দিলে লাইন কেটে দেওয়া হবে। নিরুপায় হয়ে বাবা চুপচাপ বসে ছিলেন নিজের লেখার জায়গাতে। বাড়ির মধ্যে আমরা আলোচনা করে কার কাছে কি আছে সংগ্রহ করে দেখছিলাম বিলটা দেওয়া যায় কিনা। এমন সময় কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ মহাশয় হাজির হলেন আমাদের বাড়িতে। আমাদের আলোচনা হয়ত ওঁর কানে গিয়ে থাকবে। উনি লজ্জিত হয়ে বলেছিলেন, আরে তোমরা এসব সামান্য বিষয় নিয়ে তারাশঙ্করবাবুকে বিরক্ত কর কেন? ওসব ঠিক হয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে আমরা টাকাটা সংগ্রহ করে লোক পাঠিয়ে দিয়েছি বিলটা জমা দিতে। সেকথাটা বাবাকে বলতেই বিমল সিংহ মহাশয় সহাস্যে বলে উঠলেন, দেখলেন তো আমি কি রকম মুশকিল-আসান ফকির—সব ব্যবস্থা হয়ে গেলো তো।

বাবা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মুখ না তুলেই বলেছিলেন, রাজা মশাই! (বাবা ওঁকে বিমলবাবু বলে সম্বোধন করতেন)—আগের দিনে রাজা-বাদশারা তাঁদের সভায় সভাকবি রাখতেন, এমনটি বোধহয় এখন আর হয় না, তাই না? বলে ম্লান হেসেছিলেন।

বিমল সিংহ উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিলেন।

দ্বিতীয় ঘটনা আরও অনেক পরের। দাদা সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি করতেন ফুড ডিপার্টমেণ্টে। তাঁকে সেবার বদলী করে দেওয়া হল কলকাতার বাইরে। দাদা বাবার কাছে দাবী জানিয়েছিলেন আপনি প্রফুল্ল সেন মহাশয়কে অর্থাৎ খাদ্য-দপ্তরের মন্ত্রীকে বলে বদলী বন্ধ করুন। সত্যি কথা বলতে কি বাবার ভীষণ অসুবিধা হবে দাদা অন্যত্র সরে গেলে। কিন্তু বাবা সম্মত হলেন না প্রফুল্ল সেন মহাশয়কে জানাতে। এমন সময় বিমল সিংহ মহাশয় হাজির। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বললেন, কি হল, সনৎ তোমাকে তো কখনও এমন উত্তেজিত হয়ে বাবার সঙ্গে কথা বলতে শুনিনি। দাদা ক্ষোভের সঙ্গে বলেছিলেন ঘটনাটা। সঙ্গে সঙ্গে উনি জবাব দিয়েছিলেন, তারাশঙ্করবাবু ঠিক কথাই বলেছেন। উনি কেন বলতে যাবেন প্রফুল্ল-

বাবুকে। তুমি ভেবো না—যা করবার আমিই করবো।

বিকেলে দাদা অফিস থেকে ফিরলে শুনেছিলাম—দাদার ডিরেক্টর দাদাকে বলেছিলেন—আপনি এখান থেকে চলে গেলে আপনার বাবার খুব অসুবিধে হবে এ কথা আমায় বললেই তো পারতেন। অর্থাৎ বদলী সেবার বাতিল হয়েছিলো।

সেদিন ওঁরা এসেছিলেন—কাঁদিতে রাজবাড়ির রাধাগোবিন্দের মন্দিরে একটা বিশেষ উৎসবে বাবাকে নিমন্ত্রণ করতে। এই মন্দিরে ওঁদের পূর্বপুরুষ দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পৌত্র প্রসিদ্ধ লালাবাবু—কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ—যিনি এক রজক-কন্যার সামান্য দুটি কথায় 'বাবা বেলা গেল—বাসনার আগুন দাও' শুনে বৈরাগ্যে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর ধর্মজীবনের বেশ কিছুটা সময় এই মন্দিরেই কেটে থাকবে তাঁর রাধামাধবের দেউলে। বাবা অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন এই নিমন্ত্রণে। এই ধরনের কাজ বিশেষ প্রিয় ছিলো ওঁর কাছে—তা ছাড়া আমন্ত্রণ এসেছিলো প্রিয়বর বিমলচন্দ্র সিংহের কাছ থেকে। সঙ্গে সঙ্গে যাবার ব্যবস্থা দিনক্ষণ সব ঠিক হয়ে গিয়েছিল। ওঁরা তিনজনেই গাড়িতে যাবেন একসঙ্গে কাঁদি—সেখানে একদিন থেকে ফিরবেন দিন তিনেক পরে অর্থাৎ ১লা অক্টোবর গিয়ে ফিরবেন ৪ঠা।

নির্দিষ্ট দিনে ফিরে এলেন বিকেলবেলা—প্রায় সন্ধ্যে হয় হয়—ওঁরা ফিরলেন কাঁদি থেকে। গাড়ি থেকে বাবাকে নামতে দেখলাম। নীচে নেমে গেলাম দু ভাই কিন্তু তাঁকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তাঁর মাথায় একটা সাদা চাদর পাগড়ীর মত জড়ানো—কপালে চন্দনের ফোঁটা, চোখে একটা উজ্জ্বল হাসি মাখানো দৃষ্টি—সম্মুখে আকাশের দিকে তা প্রসারিত। এলোমেলো পদক্ষেপ, সমস্ত মুখে একটা বিহ্বলতা। আমরা তাড়াতাড়ি কাছে গেলাম। উনি আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেলেন বাড়ির দিকে, আমাদের দেখেও দেখলেন না। আমাদের অত্যন্ত পরিচিত মানুষটিকে অত্যন্ত অপরিচিত মনে হয়েছিলো সেদিন। গাড়ির মধ্যে বসেছিলেন বিমল সিংহ—মুখে তাঁর অপ্রস্তুতের হাসি; তিনি দাদাকে কাছে ডেকে কানে কানে কিছু বলে চলে গেলেন।

সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত্রি এলো, সমস্ত পরিবারটা হতভম্ব হয়ে গেছে—বাবার স্তব্ধতা দেখে। কারও সঙ্গে ভাল করে কথা বলছেন না, চুপচাপ বসে রয়েছেন দোতলার বারান্দায়। মধ্যে মধ্যে সিগারেট খেয়ে চলেছেন। আমাদের বাড়ির চেহারাটাই গেলো পাল্টে—যেন সদ্য উৎসব-সমাপ্ত গৃহের বিষণ্ণতা চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে। বাবারও জীবনধারায় অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম। পূজাতে সময় কাটে তাঁর এখন অনেকখানি—চোখ দিয়ে জল-ধারা নেমে আসে। খাওয়ার সময় খেতেও পারেন না, কাঁদতে কাঁদতে উঠে পড়েন—অভুক্ত থেকে যান। বিছানায় শুয়ে পড়েন ক্লান্ত হয়ে।

লেখার জায়গাতে একেবারেই বসছেন না। বসলেও উঠে পড়েন একটু পরেই। বাড়ির সামনে পায়চারী করেন, শূন্য দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে।

কয়েকদিন পর যতীনবাবু এলেন। তিনি বেশ কিছুটা গম্ভীর। তিনি ঘরে বসতে বাবা এসে বসলেন লেখার জায়গাতে। দুজনে টুকিটাকি কথা হচ্ছিলো। হঠাৎ আমাদের দেখে যতীনবাবু বলে উঠলেন, তারাশঙ্কর, তুমি বাড়িতে সব কথা ঠিকমত বলেছো তো? না আমার জন্যে রেখে দিয়েছো? আমাকে সমস্তটা বলতে হলে তোমাদের বেশ কয়েক কাপ চা খরচ করতে হবে।

মোটামুটি বাবার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনার একটা ছবি আমরা পেয়েছিলাম—কিন্তু তা সম্পূর্ণ বলে মনে হচ্ছিলো না। যতীনবাবুর কাছ থেকে জেনে চিত্রটি সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হলাম। ওঁরা কাঁদি পৌছেছিলেন সন্ধ্যেতে। পরদিন সকালে তিনজনেই মন্দিরে গেলেন।

কাঁদির মন্দিরটা বেশ উঁচুতে—অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলে তবে বিগ্রহের সামনে আসা যায়। বিমল সিংহ প্রণাম সেরে একপাশে মন্দিরের কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলছিলেন। বাবা এই সময় প্রণাম করতে উপরে উঠে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালেন। বিগ্রহের দিকে চাইতেই তিনি চকিত হয়ে উঠলেন—তাঁর মনে হল এক জীবন্ত দেবতা তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে। বিগ্রহের চোখের তারা নড়াচড়া করছে, বিগ্রহের চোখে পলক পড়ছে। বাবা আবেগে বিহ্বল হয়ে চিৎকার করে উঠেছিলেন—'এ কি দেখছি! এ কি দেখছি! এ আমি কি দেখছি!' চিৎকার শুনে বিমল-বাবু ছুটে এসেছিলেন, জিজ্ঞেস করেছিলেন—'কি হল তারাশঙ্করবাবু? কি দেখলেন? কি? কি?'

তারপর আরও কিছু ঘটেছিল দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ ফিরে আসবার দিন সকালে।

সেদিনও ওঁরা ছিলেন তিনজনেই। যতীন দত্ত প্রণাম সেরে নীচে নেমে গেলেন—মন্দিরটাকে ভাল করে দেখছিলেন। বিমল সিংহ তাঁর লোকজনদের সঙ্গে পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। বাবা তখনও বিগ্রহের সামনে বসে। একটু পরে উনিও নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। সিঁড়ির নীচে রাখা চটি মাথা নীচু করে পরতে লাগলেন—এমন সময় শুনলেন কে যেন তাঁকে ডাকলো—'তারাশঙ্কর!' বাবার স্বভাবতঃই মনে হয়েছিল যতীনবাবু ডাকছেন—তাই উত্তর দিলেন তাঁকে—'হ্যাঁ যাই' বলে অন্য পায়ে চটিটা পরতে লাগলেন। আবার ডাক শুনতে পেলেন—'তারাশঙ্কর!' এবার আগের চাইতে একটু উচ্চগ্রামে। ইতিমধ্যে বাবার উত্তর 'হ্যাঁ যাই' শুনে যতীনবাবু বাবার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দুজনেই দ্বিতীয় ডাকের পরই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখছিলেন ডাকের উৎস সন্ধানে। ঠিক এই সময়ে তৃতীয় ডাক—

এবং বেশ গম্ভীর স্বরে—'তারাশঙ্কর !'

বাবাকে এগিয়ে দিতে এসেছিলেন মন্দিরের পুরোহিত। তিনি ছিলেন মন্দিরের সিঁড়ির মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে। শেষের ডাকটা তিনজনের কানেই গিয়েছিলো—তিনজনেরই মনে হল ডাকটা এসেছে মন্দির থেকে। তাঁরা ক্ষণেকের জন্যে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

বাবা পা থেকে চটি খুলে ফেলে তাড়াতাড়ি মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে একেবারে গোবিন্দ বিগ্রহের সামনে আছাড় খেয়ে পড়েছিলেন। পুরোহিত মহাশয়ও বাবার পেছনে পেছনে ছুটে এসেছিলেন। যতীনবাবুও সেইখানে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বেশ কয়েক মিনিট পর বাবা উঠেছিলেন—পুরোহিত মহাশয় গোবিন্দের উত্তরীয় তাঁর গা থেকে খুলে নিয়ে বাবার মাথায় পাগড়ীর মত করে বেঁধে দিয়েছিলেন। তারপর আমরা তো সবই দেখেছি যা ঘটেছিলো।

যতীনবাবু সেদিন বলেছিলেন, একটু সুস্থ হয়ে নাও—তারপর একবার ঘুরে এসো কাঁদি থেকে। কথাটা আমাদের সকলেরই ভাল লেগেছিলো। বাবার জীবনযাত্রায় তেমন কোন পরিবর্তন হ'ল না। অশ্রুবর্ষণ কিছু কমলেও লেখার জায়গায় বসে লেখার জন্যে মন ঠিক করে উঠতে পারছেন না। শোবার ঘরের সংলগ্ন বারান্দায় বসে থাকেন চুপ করে। বেড়াতেও যান না কোথাও।

কয়েক মাস পর কাঁদি গেলেন—গোবিন্দমন্দিরে, নিজের গাড়িতে, সঙ্গে ছিল অনেক ফুল মিষ্টান্ন। ফিরে ছিলেন সুস্থ মনেই। তবে লেখার ক্ষেত্রে নতুন কিছু ঘটতে দেখলাম না। সেই কারণে দুটো-আড়াইটে বছর ১৯৫৩-৫৪ সালে বাংলা সাহিত্যে ওঁর কোন নতুন লেখা দেখা যায় না। বাবাও বিমর্ষ হতেন খুব বেশী যখন খবর আসতো কলেজ স্ট্রীট পাড়ার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য—তারাশঙ্কর ফিনিশ্‌ড।

১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাস—বাবা দাদাকে ডেকে আদেশ করলেন চাঁপাফুল যোগাড় করে আনতে—উনি স্বপ্ন দেখেছেন চাঁপাফুল দিয়ে কাঁদিতে উনি গোবিন্দের পূজা করছেন। সারা বাজার ঘুরে এসে দাদা একটিও চাঁপাফুল সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন না।

খুব দুঃখিত মনে কাঁদি রওনা হয়েছিলেন ; সঙ্গে ছিল অন্য ফুল এবং ঠাকুরের জন্য মিষ্টান্ন।

কাঁদি পৌছতে রাত্রি হয়ে গিয়েছিলো। মন্দির সংলগ্ন গেস্ট হাউসেই উনি রাত্রি-বাস করেছিলেন। ওখানকার পুরোহিতদের সঙ্গে ওঁর হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার দরুন থাকা-খাওয়ার কোন অসুবিধা হবার কথা ছিল না।

এ ছাড়াও সেবার সঙ্গে ছিলেন কুমার জগদীশচন্দ্র এবং বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ

মহাশয়। যতীন দত্তও ছিলেন বাবার সঙ্গে।

পরদিন ভোরে উঠেই স্নান সেরে মন্দিরে যাবার জন্যে তৈরী হয়ে ঘরের বাইরে এসে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। গেস্ট হাউসের পাশেই একটা চাঁপা গাছ—আর তাতে ধরে আছে কয়েকটি চাঁপা ফুল। উনি সমস্ত দেখে আবেগে কেঁদে ফেলেছিলেন। চোখমুখ প্রকৃতিস্থ হতেই দেখলেন মন্দিরের পূজারী মহাশয় ওঁর সামনে দাঁড়িয়ে। ওঁকে আমন্ত্রণ জানালেন গোবিন্দের নিদ্রাভঙ্গ করতে—অর্থাৎ বিছানা থেকে বিগ্রহকে উঠিয়ে আনতে হবে। উনি ওই চাঁপা ফুলটি নিয়ে দরজার সামনে হাততালি দিয়ে দরজা খুলে বিগ্রহকে বুকে জড়িয়ে ধরে তুলে আসনে বসিয়ে ওই ফুলটি নিবেদন করেছিলেন গোবিন্দের চরণে। পরে আরও অন্য ফুল দিয়ে পূজোও করেছিলেন—ভোগ দিয়েছিলেন।

পরের বছর বর্ষায় একটা চাঁপার গাছ পুঁতে ফেললেন বাড়ির সামনেই। একদিন ফুলও হ'ল তাতে। সেই ফুল নিয়ে কাঁদিতে বিগ্রহের চরণে নিবেদনও করে এসেছেন।

এই সময় দেখা যাচ্ছে তাঁর সাহিত্য-জীবনে নতুন জোয়ার এসেছে। অজস্র লেখা তাঁর হাত দিয়ে বেরুচ্ছে। বিচারক ১৯৫৫ সালে, সপ্তপদী ১৯৫৬ সালে, আনন্দবাজার পূজা সংখ্যায় 'রাধা', 'পঞ্চপুত্তলী'—কত। এই সব ঘটনার একটা আবছা বিবরণ তিনিও লিখে রেখে গেছেন তাঁর 'আমার কথা'তে, শনিবারের চিঠিতে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। লিখেছেন—

"তখন আমি পূজা করি। কিসের পূজা করি, কার পূজা করি জানি না। তবু পূজা করি। নিরাকারকে পূজা করি, সাকারের ধ্যান করি, পায়ে ফুল দিই—জল দিই; যেমন সকলে করে তাই করি। পূজার সময় কাঁদি।

এক সান্ত্বনা পাই, যেন একটি কিছুর আভাস পাই রবীন্দ্রনাথের গানে। গান শুনে চোখে জল আসে। এক 'তুমি' আছেন উপলব্ধিতে আশ্বাসে বুক ভরে ওঠে।

এই অবস্থার মধ্যে স্বর্গীয় বিমলচন্দ্র সিংহ নিমন্ত্রণ জানালেন গান্ধীজয়ন্তীতে কাঁদী পাঁচথুপী যাবার জন্য। যাব বললাম। গেলাম ১লা অক্টোবর। আমার সঙ্গী হলেন যমদত্ত—যতীন্দ্রমোহন দত্ত। যিনি ভাবরসহীন কঠিন মানুষ—অঙ্কের মানুষ। অঙ্ক কষে মহেঞ্জোদাড়োর লোকসংখ্যা নির্ণয় করেন। চন্দ্রগুপ্ত কত সৈন্য নিয়ে দিগ্বিজয় করেছিলেন নির্ণয় করেন। গান্ধীজীর নাম সহ্য করতে পারেন না—এমন একজন ব্যক্তি। বর্তমানকালে বাংলাদেশের পাঠকেরা তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত। সে পরিচয় আমি দিচ্ছি না, আমি মানুষটির প্রকৃতির পরিচয় দিলাম। তবে তিনি প্রথম শ্রেণীর অঙ্কবিদ্ হয়েও ঈশরবিশ্বাসী, সত্যবাদী; এবং সমস্ত রকমের ভণ্ডামির উপর খড়্গহস্ত মানুষ। ঘোরতর কংগ্রেস বিরোধী লোক। তিনি গেলেন কাঁদী দেখবার জন্য।

একটা আমল—কোম্পানির আমল তাঁর নখদর্পণে। গোটা কলকাতার প্রাচীন বংশগুলির আদ্যন্ত ইতিহাস, ইতিকথা তাঁর কণ্ঠস্থ। তিনি কাঁদী গেলেন—রায়রাঁয়া দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের কাঁদীকে বর্তমান কাঁদীর মধ্য থেকে আবিষ্কার করবার অভিপ্রায়ে।

আমার এই ঘটনা ঘটল কাঁদীতেই। পৌঁছেছিলাম সন্ধ্যার প্রাক্কালে। বরাবর গাড়িতে গিয়েছিলাম। ইংরিজি মাস শুরু হয় বাংলা মাসের মাঝামাঝি। ১৪ই বা ১৫ই হয় ইংরাজির ১লা। কাঁদীতে পৌঁছেই স্নান করে উঠে কিছুক্ষণ পরই ঘটল প্রথম ঘটনা। দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল ৪ঠা সকালে। কাঁদী থেকে রওনা হব দশটা—সাড়ে দশটার সময়—তার কিছু আগে।

কি ঘটল তার বিবরণ থাক্। যা ঘটেছিল তা বহুজন সমক্ষেই ঘটেছিল—একান্তে ঘটেনি। তবুও তা ঘটল কেবল আমার সামনেই। আমি কিছু দেখলাম, কিছু শুনলাম। অতি বিচিত্র, অতি বিস্ময়কর। সচরাচর নয়—অসচরাচর। অভাবনীয়।

আমার কি হল সে বলতে পারব না। নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। ভুলে গেলাম কোথায় আমি রয়েছি, কারা রয়েছে চারিপাশে, আত্মহারা বিহ্বলের মতো উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলাম—এ কি দেখছি! এ কি দেখছি! আমি এ কি দেখছি!

প্রথম দিন দেখেছিলাম। সেদিন বিমলবাবু আমাকে ধরে বলেছিলেন, কি হল? কি দেখলেন? কি? কি? তারাশঙ্করবাবু!

দৃশ্যটি মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে।

দেখলাম আমি দাঁড়িয়ে আছি কাঁদীতে; কুমার বিমল সিংহ মহাশয়দের দেবালয় প্রাঙ্গণে। আমার পাশে বিমল সিংহ, যতীন দত্ত এবং আরও অনেক লোক।

যতীন দত্ত ব্যঙ্গ করে বললেন, কবিবরের ভাব লেগেছিল।

আমি স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

দুদিন পর শব্দ—কানে শুনলাম। একবার নয়—তিনবার। প্রথমবার অতি মৃদু, দ্বিতীয়বার তা থেকে স্পষ্ট, তৃতীয়বার সুস্পষ্ট। প্রথমে যেন কৌতুক। দ্বিতীয়বারও তাই। তৃতীয়বার গম্ভীর। কি দেখেছি, কি শুনেছি সে থাক্। সে কথা প্রকাশ আমি করব না। তবে সেখানে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা তা জানেন, ওই বিহ্বল মুহূর্তে চীৎকার করে আমি বলেছি—বা বলে ফেলেছি।

এর তিন মাস পর ডিসেম্বরের শেষে আবার কিছু ঘটল। অবিশ্বাস্য কিছু।

ঘটল ওই কাঁদীতেই। সেবার বিমল সিংহ সঙ্গে ছিলেন না। তিনি তখন ইংলণ্ডে। সঙ্গে ছিলেন কুমার জগদীশচন্দ্র সিংহ ও কুমার বৃন্দাবনচন্দ্র সিংহ। এবং সেবারও সঙ্গে ছিলেন ওই যতীন দত্ত।

এবার যা ঘটল তা শুধু একা আমি দেখলাম না, আমি শুনলাম না, এবার যা ঘটল তা সকলে দেখলে, সকলে শুনলে। কলকাতা পর্যন্ত বুকে করে নিয়ে এসে আমার বাড়িতে তা কৌটোর মধ্যে রত্নের মত রক্ষা করেছি। আমার আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটি, যা নিয়ে যাবার জন্য সারা কলকাতা পাঁচদিন খুঁজে পেলাম না, ক্ষুণ্ন হয়েই কাঁদী গেলাম, তাই কাঁদীতে পদার্পণ করার কিছুক্ষণের মধ্যেই কেউ যেন হাত বাড়িয়ে ধরলে ; বললে, এই নাও। এই ঘটনাটির যে ভূমিকা রচিত হয়েছিল কাঁদী যাওয়ার আগে কলকাতায়, তার কথা জানতেন আমার প্রতিবেশী পাটুদা—পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

এটুকু বাহ্য। ভিতরে ঘটল যেন বিপ্লব।

এতকালের আমির মধ্যে সেই আমি আর রইলাম না। এতকালের জগৎ সেই জগৎও রইল না। সব বদলে গেল। রূপ থেকে রূপান্তরে এল। কুঁড়ি যেন ফুল হয়ে ফুটল। আমার কামনা বদলাল, আমার ধারণা বদলাল, আমার হৃদয় বদলাল ; এই পুরাতন জগতের মধ্যে এক নূতন জগৎকে পেলাম ; জীবনের গান বদলাল, সুর বদলাল, ছন্দ বদলাল, সঙ্গীতের বোল-তাল-মান সব বদলে গেল। পরম অস্তিবাদের বা অস্তিত্বের একটি আভাস আমাকে ঘিরে ঘিরে ফিরতে লাগল। সে পাশে রয়েছে স্পষ্ট অনুভব করি, তাকে স্পর্শ করতে এগিয়ে যাই। সেও সেই দূরত্বটুকু রেখে আমার সঙ্গে সঙ্গেই চলে—ধরা যায় না, ছোঁয়া পাই না, আবার সরেও যায় না, অনস্তিত্বে বা নাস্তির মধ্যে সে হারিয়েও যায় না।

এতকালের জগতের সকল স্বাদ আমার রুচি বহির্ভূত মনে হল। নূতন করে মনের বাসা বাঁধলাম।

সংসারের মধ্যে বাস করেও আমার বসতি হল একান্তে। সিদ্ধান্তে এলাম না, প্রত্যক্ষভাবে উত্তর তাও পেলাম না ; পেলাম আভাস। যেন নিশান্তে উদয় দিগন্তে আলোর আভাসের ইঙ্গিত আমার সম্মুখে ; তখনও পাখী ডাকে নি ; ফুল ফোটে নি ; বুঝতে পারছি ধ্বনি উঠবে, গন্ধ পাব, আলোর উন্মেষে নিশান্তের অন্ধকার কাটবে। আমি একলা বসে আছি তার প্রতীক্ষায়।

আমি লেখাও এক রকম ছেড়ে দিলাম। সুতরাং কাউন্সিলের রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে আমার পক্ষে জীবন মেলানো কঠিন হয়েছিল। দুবার পদত্যাগপত্র কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের হাতে দেবার জন্য ডাঃ রায়ের হাতে দিয়েছি। কিন্তু তিনি

আমায় পদত্যাগ করতে দেন নি। একবার অন্ততঃ পদত্যাগপত্র ডাঃ রায়ের হাতে দিয়ে, সে কথা কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের ঘরে ঢুকে চেয়ারম্যান শ্রদ্ধেয় ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে বলেও ছিলাম কথাপ্রসঙ্গে। বোধহয় তাঁর মনেও থাকবে। সেটা পশ্চিম বাংলা এবং বিহারকে যুক্ত করবার কথা যখন হয় তার অল্প কিছুদিন পরেই।

এই সময়ে আমার রচনা একমাত্র 'আরোগ্য নিকেতন'।"

ওঁর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে আমি ভারত সরকারের দণ্ডকারণ্যতে যোগ দিয়েছি নকশালদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে। তাঁর অসুখের খবর পেয়ে সেখান থেকে চলে এসেছিলাম—আবার সব কাজ শেষ করে চলেও গেলাম। ফিরেছিলাম—১৯৭৪ সালে। ফিরে এসে ওই চাঁপাগাছটিকে আর দেখতে না পেয়ে দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—।

দাদা আমার দিকে ম্লান দৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলেন অনেকক্ষণ—তারপর আস্তে আস্তে বলেছিলেন—ওটা মরে গেলো।

আমিও দাদার দিকে তাকিয়েছিলাম—আমিও হয়ত মনে মনে বলেছিলাম—তাইতো হবার কথা।

আমরা যা জেনেছিলাম, যা বুঝেছিলাম অনেক দুঃখে, অনেকজনের কাছ থেকে—তাতে গাছটির ওই পরিণতি—এই মৃত্যুও তো বিধি-নির্দিষ্ট।

॥ ৭ ॥

বেহিসেবী

১৯৫০ বা তার কিছু আগে থেকেই পশ্চিমবাংলার মানুষ সাহিত্যিক তারাশঙ্করকে বাড়ি-গাড়ির মালিক হিসেবে দেখেছেন—হাতে থাকতো গোল্ডফ্লেকের টিন—রোজ এক টিনেরও বেশী অর্থাৎ ৫০টারও বেশী ছিল তার বরাদ্দ। দুমদাম করে এখানে ওখানে টাকা দিয়ে বসতেন অথবা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকতেন। আর্থিক ব্যাপারে এই ধরনের রাজকীয় আচরণ হয়ত লক্ষ্য করেছেন অনেকেই। এইটে ছিল তার বাইরের চেহারা। কিন্তু অন্যদিকে তার সংসারের আর্থিক চেহারাটা কি ছিল সেটা অনেকেরই জানা নেই।

তারাশঙ্করের সংসারে আমিও একজন আশ্রিত জীব ছিলাম।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময়ে প্রচুর রোজগার ছিল তাঁর। বেশীটাই আসতো কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকদের কাছ থেকে। মাঝে মাঝে হাজির হতেন

চলচিত্র জগতের মাতব্বরেরা—তাঁরাও দিতেন তাঁকে প্রচুর অর্থ। দুইয়ে মিলিয়ে তাঁর খরচ করার মত অনেকখানি অর্থ ওঁর হাতে এসে যেতো। কিন্তু মজার কথা এই যে, মাসের শেষে দেখা যেতো ব্যাঙ্কে দুই অঙ্কের অর্থও অবশিষ্ট আর নেই—ফলে ইলেকট্রিকের লাইন কেটে দেওয়ার হুমকি আসতো সাপ্লাই কোম্পানী থেকে—টেলিফোনেরও ওই একই অবস্থা। কর্পোরেশনের ট্যাক্স বাকী থাকতো বছর ধরে, ইনকামট্যাক্স দেওয়া হত না বছরের পর বছর। কড়া কড়া চিঠি আসতো তাদের কাছ থেকে। ইনকামট্যাক্স অফিসারকে তাঁর নিজের হাতে লেখা একটা চিঠির কিছু অংশ এখানে তুলে ধরছি।

মাননীয়
ইনকামট্যাক্স অফিসার
Dist 1 (2) কলিকাতা

১২. ১১. ৪৭

মাননীয়েষু,

যথোচিত সম্ভ্রমের সহিত আপনার ৮।১১।৪৯ তারিখের অনুজ্ঞাপত্র প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি এবং সবিনয়ে আপনার নিকট আমার বক্তব্য নিবেদন করিতেছি। আশা করি সমস্ত বিষয় সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিয়া আপনার উপরোক্ত অনুজ্ঞা পত্র সম্পর্কে নূতন আজ্ঞা প্রদান করিবেন।

আমি পেশায় একজন গ্রন্থকার। সুতরাং সমস্ত উপার্জন নির্ভর করে আমার পরিশ্রমের উপর।

কিন্তু গত ছয়মাস যাবৎ আমি অসুস্থ। প্রায় তিন মাস শয্যাশায়ী ছিলাম। এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই। এই কারণে বর্তমান বৎসরে আমার উপার্জন একরূপ বন্ধ; উপরন্তু চিকিৎসার জন্য এবং সাংসারিক অন্য কারণে ব্যয়-বাহুল্য হেতু ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। আমাদের উপার্জনের একটি বিশেষ অংশ ছায়াছবি হইতে আসিয়া থাকে। বর্তমান বৎসরে স্বাস্থ্যের জন্য ছায়াছবির কোন কর্ম গ্রহণ করিতে পারি নাই। এই হিসাবে বর্তমান বৎসরে আমার আয় যৎ-সামান্যই হইবে। আমি বহু চেষ্টা করিয়াও আপনার অনুজ্ঞা মত আগামী বৎসরে আয়কর দিবার ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইহা আমার অনুজ্ঞা অবহেলার ঔদ্ধত্য নয়—ভগ্নস্বাস্থ্য সাহিত্যসেবীর নিরুপায় অক্ষমতা।

এই সমস্ত অবস্থা সহৃদয়তার সহিত বিবেচনা করিয়া এই অগ্রিম আয়কর দিবার অনুজ্ঞা হইতে অব্যাহতি দিবার প্রার্থনা জানাইতেছি। যথাসময়ে আমার আয়ের

হিসাব মত আয়কর ধার্য করিয়া আদায় লইবার উহার ব্যবস্থা করিলে অনুগৃহীত হইব। আমি সাহিত্যজীবী—বর্তমানে ভগ্নস্বাস্থ্য, আপনার নিকট সহৃদয় বিবেচনার প্রার্থনা এবং দাবী জানাইতেছি। ইতি—

বাড়ি তৈরীর সময় ইন্সিওর কোম্পানীর কাছ থেকে মোটা টাকা ধার নিয়েছিলেন—বাড়ি বন্ধক রেখে। এর জন্যে তাঁকে দিতে হত মাসে মাসে সুদ। আর সঙ্গে ছিল ধার নেওয়া টাকার সমপরিমাণ টাকার একখানা ইন্সিওরেন্স পলিসী, তাতে দিতে হত প্রিমিয়াম এবং সেটা থাকতো ইন্সিওর কোম্পানীর কাছে। যথারীতি সুদ ও প্রিমিয়াম সব কিছু বাকী পড়তো। অবশেষে সুদের টাকা আমি আমার কর্মস্থল থেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করি নইলে সুদের উপর আবার সুদ চড়ে যেতো। ইন্সিওর কোম্পানীর একখানা চিঠি পাঠকদের অবগতির জন্যে তুলে ধরার লোভ সামলাতে পারছি না।

Life Insurance Corporation of India

4, Chittaranjan Avenue Calcutta-13

Sri Tarasankar Banerjee, 11th August, 1960.

Plot No. 171,

C.C.O.S., Tala Park,

Calcutta-2.

Dear Sir,

Unit : Calcutta Insurance.

Re : Your mortgage long of Rs. 20000/-against security of Plot No. 171, C.C.O.S., Tala Park & on security of Policy No. 91741679.

It is to be much regretted that inspite of our repeated reminders and notices you have neither liquidated the arrears of interest nor have cared to reply to any of our letters so far. We may inform you that a very heavy sum amounting to Rs. 3,337. 86 np has fallen due towards the arrears of interest (calculated up to 31.7.60) for which we regret, we cannot

keep the matter pending any further. Consequent upon your above defaults the entire loan has become due and repayable by you. As such we demand of you the immediate payment of the sum of Rs. 3,337.86 np together with further interest up to the date of repayment. In default of payment within the 31st instant we shall be constrained to hand over your papers to the Solicitor to the Central Govt at Calcutta, for adopting legal proceedings against you without any further reference to you and in such case you will be held liable for all costs and consequences.

This may be treated as our final notice and we request you to comply with our aforesaid request to avoid any unpleasantness from our side.

Yours faithfully,
B. B. Dotto
for Zonal Manager.

সঙ্গত কারণে প্রশ্ন জাগবে তাহলে এত সব টাকা নিয়ে উনি কিসে খরচ করতেন, —যার জন্যে ওই দেয়গুলি অনাদায়ী থেকে যেতো? তাঁর লাভপুর ভ্রমণের খরচের অভিজ্ঞতা আগেই দিয়েছি। প্রতি মাসে প্রায়ই একবার করে লাভপুর যেতেন। পার্লামেণ্টারী রেল পাসে তাঁর রেল ভ্রমণের সীমানা ছিল লাভপুরই—কখনও কখনও দিল্লী। লাভপুর পৌঁছুবার পথে তাঁর দাক্ষিণ্য শুরু হয়ে যেতো আহমদপুর স্টেশনে নামবার পর থেকেই। তারপর লাভপুর পৌঁছে তো এলাহি কাণ্ড। ভূপতি সাহার দোকান থেকে কয়েক মন চাল, বিনয় হাটীর দোকান থেকে ধুতি শাড়ি, জামা প্যাণ্ট, যোগেশের দোকানের কাঁচাগোল্লা, অর্থাৎ মিষ্ককেকের মত, এবং সর্বোপরি বিশু ডাক্তারের ঔষধ খরচ—ইত্যাদির দেনা শোধ করে দিয়ে থুয়ে শূন্য হাতে—বিশু ডাক্তারেরই কাছে ফেরার পাথেয় ধার করে ফিরতে হত। তবু তো বিশু ডাক্তার তাঁর চিকিৎসা বাবদ বা ঔষধের দামের জন্য তারাশঙ্করকে বিব্রত করেননি কখনও।

লাভপুরের বিশু ডাক্তার অর্থাৎ ডাঃ সুকুমার চন্দ্র, লাভপুরের নাম করা ডাক্তার, আমার বিশেষ স্নেহভাজন অনুজস্থানীয়। তিনি লাভপুরে অনুষ্ঠিত তারাশঙ্করের এক জন্মদিনে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন—

"ছোট এক টুকরো কাগজ দুই লাইন লেখা—'ডাক্তার, একে একটু দেখে দিও। ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করে দিও।'

এতেই জানতে পারতাম তারাশঙ্করের লাভপুরে উপস্থিতির কথা। ডাক্তারখানার কাজ করার মধ্যে মনটা তাঁর কাছে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে থাকতো।...

এক টুকরো কাগজে লিখে পাঠাতেন কোনো রোগীর চিকিৎসার ব্যাপারে এবং আরো লিখতেন যে খরচপত্র সব তিনিই দেবেন। এখানে থাকাকালীন প্রতিদিন ছোট ছোট কাগজে তাঁর এ রকম লেখা নিয়ে কত দুঃস্থ লোক যে আমার কাছে আসতেন তার হিসাব দিতে পারব না। আমিও সেইমত তাদের চিকিৎসা পথ্যের ব্যবস্থা করে দিতাম এবং তাতে আনন্দও পেতাম প্রচুর।

সেই সময় হতেই আমিও বিনা পারিশ্রমিকে দুঃস্থের চিকিৎসা করার তাগিদ অন্তরে অনুভব করতে লাগলাম। জানি না তাঁর নির্দেশমত পথে কতটা দুঃস্থজনের সেবা করতে পেরেছি। দুঃস্থের জন্য তাঁর প্রাণের এই ব্যাকুলতা, গোপনে তাদের এইভাবে সাহায্য করা এবং তাদের খোঁজ-খবর নেওয়া এগুলো কখনো প্রকাশ পায়নি। তিনি বলতেন এতে সাহায্যপ্রার্থী মনোকষ্ট পাবে। তাই সব কিছু গোপন থাকতো এবং আমরাও সেইমত চলতাম।" (তারাশঙ্কর স্মরণিকা)

আমরা সাধারণতঃ দান করি—অর্থাৎ একটা উঁচু জায়গা থেকে ভিক্ষা দিয়ে থাকি। পিতৃচরিত্রে এটি আমি কখনও দেখিনি—এবং দেখেও শিখিনি। শিখবো কেমন করে? কারণ আমার দেহে যে তখন সরকারী গেজেটেড্ অফিসারের তকমা। আজ সে সব যখন গেছে—যখন জীবনের অস্তাচলের শেষপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি, তখন ঐ অপরাধের জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া আর কি বা গতি আছে? এই প্রসঙ্গে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে দেখা এক ভিক্ষুনীকে মনে পড়ছে।

স্টেশনে দেখেছিলাম। দণ্ডকারণ্য থেকে কলকাতা। ফিরবো—বোম্বে মেলে—রায়পুর থেকে হাওড়া। একটি ভিখারী এসে পয়সা চাইলো বাংলাভাষায়। চমকে ওঠার কিছু নেই—কারণ কাছেই রয়েছে পুববাংলার উদ্বাস্তু পরিপূর্ণ মানা ক্যাম্প। আমিও তাই ধরে নিয়েছিলাম—এবং কিছু পয়সাও দিয়েছিলাম। সম্ভবতঃ পয়সার অঙ্ক একটু বেশী হয়ে যাওয়ায় সে একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো—আমি কোথায় যাব বা আমার বাড়ি কোথায়?

কথায় কথায় কেন জানি না বীরভূম জেলা লাভপুর এগুলি বলে ফেলেছিলাম। সে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেছিলো—তারাশঙ্করবাবুকে চেনো—তার কাছে অনেক পয়সা পেয়েছি। তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে পিতৃপরিচয় দিয়ে জানিয়েছিলাম তাঁর মৃত্যুর কথা। অবাক হয়ে সে চেয়েছিলো আমার মুখের দিকে—তারপর আঁচল দিয়ে

চোখের জল মুছে ছিলো। আমার মনটাও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিলো। মনে প্রশ্ন জেগেছিলো ভিক্ষুনী অত কেঁদেছিলো কেন? আমি হিসেব করে দেখেছি আমার যেটুকু মনে হয়েছে তা হল দাতা ও গ্রহীতার ব্যবধান যে যত কমিয়ে আনতে পারবে—যে দাতা গ্রহীতার পর্যায়ে নেমে এসে বোঝাতে পারবে তুমি নিয়ে আমায় ধন্য করছো, কিম্বা তোমারই জিনিস, আমার কাছে রাখা আছে আজ কিছুটা ফিরিয়ে দিচ্ছি তোমায়—সেই দাতা কিন্তু সার্থক দাতা। এবং তাদের জন্যে গ্রহীতারা চির-কালই কাঁদে।

দেবসাহিত্য কুটীরের অন্যতম কর্ণধার ছিলেন মধুসূদন মজুমদার। শেষের দিকে তিনি পিতার বড় কাছের মানুষ হয়ে পড়েন। আর তিনিই অনেকাংশে বাবার গোপন খরচের দায়টা সামলে দিতেন। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তারাশঙ্করের দুটি বেহিসাবী খরচের দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন—

"সেদিন ছিল হেমন্তের প্রভাত। আমাতে (মধুসূদন মজুমদার) আর তারাশঙ্কর-বাবুতে বাগানে বসে কথা বলছি, কথা বলতে বলতে শান্তিবাবুর (বড় জামাতা) কথা ওঠাতে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'যখনই মনে হচ্ছে এ দুনিয়ায় আর কোথাও খুঁজে তাকে পাব না, তখনই, মধুসূদন মনটা যেন ব্যথায় টনটন করে উঠছে।' কি জবাব দেব? তাই চুপ করে রইলাম।

বাইরে গেটের কাছে কেউ ছিল না। গেটটা খোলা পেয়ে একজন লোক সোজা চলে আসে আমাদের কাছে এবং তারাশঙ্করবাবুকে বলে যে,তার ছেলে অসুস্থ কিছু সাহায্য করতে। আমি সংকুচিত হয়ে উঠলাম। এ সময়ে তাঁকে বিরক্ত করা কি ঠিক হচ্ছে? দেখি চোখ মুছে তারাশঙ্করবাবু তখন পকেটে হাত দিচ্ছেন, এক কথায় পকেট থেকে ৪০্ টাকা বার করে তাকে দিলেন, লোকটি বলল, 'আর কিছু...' তারাশঙ্করবাবু পকেটটা উল্টে ধরে দেখিয়ে বললেন, 'আমার কাছে আর কিছু নেই। দেখ, বিশ্বাস না হয়। এরপর তোমায় দিতে গেলে বাড়ির লোক জানতে পারবে।'

লোকটি সেখান থেকে চলে গেল।

আমি প্রশ্ন করি, 'আপনি এক কথায় লোকটিকে ৪০ টাকা দিয়ে দিলেন?'

তারাশঙ্করবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'কি জানি, অসুখের কথা বললো যে ওর ছেলের! বিয়োগের জ্বালা বড় জ্বালা'।" (নবকল্লোল, শ্রাবণ ১৩৭৪)

এরপর মধুসূদনবাবু বাবার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছেন—এবং নবকল্লোলে লেখা শুরু করেছেন অর্থাৎ টাকার লেনদেন শুরু হয়েছে তাঁর সঙ্গে—সেই সময়ের আর একটি ঘটনার কথাও উনি লিখে গেছেন—

"একবার পূজোর আগে তিনি আমাকে বললেন, 'আমাকে ৫০০ টাকা দাও তো?'

আমি বলি, 'কেন বলুন তো?'

উনি বলেন, 'কিছু ধুতি শাড়ি পেয়েছি, কিনবো।'

পরের দিন গিয়ে দেখি, প্রচুর ধুতি শাড়ি কেনা রয়েছে তাঁর ঘরে। সেগুলো দেখে মনে হল, ৫০০ টাকায় এত কাপড় কেনা যায় না। তাই প্রশ্ন করলুম, 'এর দাম কি ৫০০ টাকা?'

উনি বললেন, 'না, আমিও কিছু টাকা দিয়েছি ওতে।'

তারাশঙ্করবাবু আস্তে আস্তে বললেন, 'পূজোর সময় বাড়ি যাচ্ছি, এ তো ঘণ্টা দুয়েকের ব্যাপার।'

আমি বলি—'সব বিলিয়ে দেবেন?'

উনি বলেন—'ওরা যেভাবে এসে চায়,—আর ওদের অবস্থা দেখে ফেরাতে পারি না।'

এই ভাবে কোনোবারে কাপড়, কোনোবারে চাল তারাশঙ্কর বিতরণ করতেন ওঁর নিজের গ্রামেতে। ওঁর বড় ইচ্ছা ছিল আমি ওঁর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে একবার থাকি ওঁর সঙ্গে। কিন্তু কাজের জন্য তা সম্ভব হয়নি।" (কথাসাহিত্য অগ্রহায়ণ, ১৩৭৮)।

এমনি করে কতজন যে ওঁর কাছে টাকার প্রয়োজনে আসতেন আমরাও তার সন্ধান পেতাম না।

হঠাৎ সেদিন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের এক ছাত্র এসে হাজির। টাকা নিয়ে ফিরে গিয়ে সে চিঠি লিখেছিল—তার কিছু অংশ এখানে তুলে দিলাম। সুন্দর হস্তাক্ষর। চিঠির মধ্যে ব্যথা, লজ্জা, ক্ষোভ, আনন্দ সবই আছে। পড়ে ভাল লেগেছিল—তাই রেখেছিলাম নিজের সন্ধানের মধ্যে।

S. P. Talapatra
B. E. College, Sengupta Hall
Po. Botanic Garden
Dt. Howrah (W. B.)
21. 9. 59.

শ্রদ্ধাভাজনেষু,

সাহায্যের আবেদন নিয়ে আমি অনেকের কাছেই গেছি, তাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বলে কারও কথাই আপনার কাছে বলতে পারবো না। তবে সব জায়গা থেকেই ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি; কোনও জায়গায় আবেদনের স্বীকৃতিই পাইনি আর কোথাও

বা উত্তর পেয়েছি অপমানের মাধ্যমে। সবশেষে আপনার কাছে এলাম—আপনি আমায় অপমানও করলেন না আর ফিরিয়েও দিলেন না। বিশ্বাস করুন, চিঠি লিখেও ভাবতে পারিনি আপনি আমার আবেদনে সাড়া দেবেন, আপনার কাছ থেকে পাবো স্নেহাশীর্বাদ। তাই আপনার চিঠি পেয়ে সত্যিই আমি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়েছিলাম। অবিশ্বাস যেখানে চারিদিক ছেয়ে আছে সেখানে আপনার কাছ থেকে যা পেয়েছি তা আমার কাছে অমূল্য।

২৫/৩০ টাকা সাহায্যে আমার যা কাজ হবে সেটাকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। আপনি লিখেছেন "অভিমান না করে আমাকে লিখো"—ঐ কথা পড়ে আমার কান্না এলো।

...আপনার দেওয়া দুটো সর্তই আমি একটু পরিবর্তিত করবো। "তুমি কাউকে বলতে পারবে না"—এ কথা পড়ে আমি খুবই বিস্মিত হয়েছি। আমাকে টাকা দিলে কাগজে নাম ছাপা হবে না বলে অনেকে টাকা দেন না—আর আপনি টাকা দেবেন অথচ তার প্রচার চান না, সত্যিই এ আমার কাছে অপূর্ব বিস্ময়। কিন্তু আমি বিনীত ভাবে আপনাকে বলছি আমার একমাত্র বন্ধুর (যার কথা আপনাকে আগে লিখেছি) কাছে একথা আমাকে বলতেই হবে।

..."কখনও শোধ দেবার চেষ্টা করবে না। যদি তুমি উপযুক্ত হও, সক্ষম হও, আর সেখানে যদি আমি অক্ষম হই—তবে সেদিন দিয়ো।"—আপনার একথায় আমি দুঃখ পেয়েছি। শোধ দেবার চেষ্টা না করাকে আমি ব্যক্তি-সত্তার অবমাননা মনে করি। আমার এখন টাকার প্রয়োজন তাই আপনার কাছ থেকে নিচ্ছি কিন্তু সেটাকে শোধ না দেবার কী কারণ থাকতে পারে। একটা কথা ঠিক জানবেন আপনার সঙ্গে আমার যে শ্রদ্ধার সম্পর্ক তার সঙ্গে টাকার কোন সম্পর্ক থাকবে না। টাকা শোধ করলেও আপনার স্নেহের ঋণ আমি শোধ করতে পারবো না। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি—আমি উপযুক্ত হবো, আমি সক্ষম হবো। কিন্তু তার সঙ্গে আপনি অক্ষম হয়ে পড়বেন—আমার আকুল প্রার্থনা ভগবান যেন তা না করেন। আমার প্রণাম নেবেন। কুশল কামনা করি। ইতি—

স্নেহার্থী শিবপ্রসাদ

আর একটি বেদনাদায়ক ঘটনা অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে নিবেদন করতে চাইছি। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা সাহিত্যেব একটি কবিপ্রতিভা। তিনি দীর্ঘকাল ধরে কঠিন রোগাক্রান্ত হয়ে প্রায় একরকম গৃহবন্দীর জীবন কাটিয়েছেন। তাঁর চিঠির কিছু অংশ নীচে দিলাম।

তারাপদ চ্যাটার্জী লেন
পোঃ বোটানিক গার্ডেন
হাওড়া
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬৭

শ্রীচরণেষু,

আপনার স্নেহসিক্ত পত্রখানি যথাসময়েই পেয়েছিলাম। কিন্তু মাঝে আবার জ্বরে শয্যাগত ছিলাম বলে উত্তর দিতে বহু বিলম্ব হয়ে গেল। আশা করি, অনিচ্ছাকৃত এ ত্রুটি মার্জনা করবেন।

আপনার পত্র পাবার পর কেন্দ্রীয় সরকার আমার আবেদন-পত্রের উত্তরের সঙ্গে যে proforma পাঠিয়েছিলেন, সেটি fill up করে আপনার, রাজশেখরবাবুর ও প্রেমেনবাবুর পরিচয়পত্র সহ আমরা Registered Post-এ পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। গত শনিবার অবশ্য নীরেনবাবুর (শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী) ও হরিশঙ্করবাবুর (শ্রীহরিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়) মুখে একই সঙ্গে শুনলাম, আমার আবেদন মঞ্জুর হয়েছে বলে আপনি ওঁদের জানিয়েছেন। এ-সংবাদ আমার কাছে ঈশ্বরের পরম আশীর্বাদের মতো।

দীর্ঘ সাতাশ বছর ঘরের কোণে বন্দী জীবনযাপন করছি। দুঃখ-দুর্দশার গভীরতম পঙ্কে আমি আকণ্ঠ নিমজ্জিত। একদিন যে আমার ঈর্ধা করবার মতো স্বাস্থ্যশ্রী ছিল, তার ক্ষীণতম স্মৃতি আমার কাছে কতো বেদনাবহ। তরুণ বয়সে আমাকে যাঁরা দেখেছেন, এখন দেখলে তাঁরা আমাকে চিনতেই পারবেন না। তাঁদের কৌতূহলী দৃষ্টির সামনে যদি নিজের পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করি, তাঁরা শুধু অবাক বিস্ময়ে ভাববেন, মানুষটার এ কী শোচনীয় পরিণতি!...

আর পাঁচজনের মতো একদিন যে আমারও মনে কামনা-বাসনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, আমিও যে স্বাপ্নিক ছিলাম—সে কথা ভাবতে বসলেই দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে। মনে হয়, এই ষড়ৈশ্বর্যময়ী পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের বিচিত্র আস্বাদ আমার জন্যে নয়; না, না, আমার মতো হতভাগ্যের জন্যে নয়।

গত আট মাস যাবৎ যে চরম অর্থসংকটের মধ্যে দিনগুলি গড়িয়ে গড়িয়ে কাটছে, তা অবর্ণনীয়। নিজের চিকিৎসার কথা বাদ দিলেও যেখানে সংসার-খরচের জন্যে কমপক্ষে মাসে দেড়শো টাকা (১৫০৲) লাগে, বর্তমানে সেখানে মাত্র পঞ্চাশ-ষাট টাকার ওপরে নির্ভর করে চলতে হচ্ছে।..."

এই কবিপ্রতিভাকে সম্মানের সঙ্গে বাঁচাবার জন্য তারাশঙ্করের চেষ্টার অন্ত ছিল না। তাই মধ্যে মধ্যে তাঁর খোঁজ রাখতেন লোক মারফৎ। এরই স্বীকৃতি হিসাবে চট্টোপাধ্যায় মশায়ের আর একটি চিঠির একটু অংশ নীচে দিলাম। চিঠির

তারিখ—২০. ১০. ৬১।

"গত ৺মহাষষ্ঠীর দিন নির্মলকুমার খাঁ-এর হাতে আপনার প্রেরিত পত্র ও ১০১্ একশ এক টাকা পেয়েছি। নির্মলবাবুকে দিয়ে আমি আপনাকে একটি চিঠি লিখে দিয়েছিলাম। সে-চিঠি আপনি পেয়েছেন কিনা জানি না।"

শ্রীনির্মল খাঁ—পিতার জীবদ্দশায়—পিতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সামিল হয়ে পড়েন। হাওড়া থেকে সাইকেলে করে আসতেন—সারাদিন টালার বাড়িতেই তাঁর কেটে যেতো, আমাদের সঙ্গেই খাওয়া-দাওয়া—অর্থাৎ বাড়ির মানুষই হয়ে গিয়েছিলেন। এই সময় মধুসূদনবাবুর কথাও একটু বলে নিতে চাই, এই কারণে যে উনি লিখতে গিয়ে নিজের মনের যে পরিচয়ই রাখতে চেয়ে থাকুন না কেন, কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম—উনিও ছিলেন পিতার এই বিচিত্র খেলার একজন শরিক—যেমন ছিলেন বিশু ডাক্তার। বাবার যত প্রয়োজন, যত খেয়ালখুশি সবকিছুই এই বহির্দৃষ্টিহীন মানুষটি জুগিয়ে গেছেন। বাবা বললেন—মধুসূদন আমার একটা টেপ-রেকর্ডার চাই। মধুসূদনবাবু বলছেন—ঠিক আছে দাদা। দুদিন পরে দেখি, বাবা আর মধুসূদনবাবু দুজনে মিলে দুজনের কথা টেপ করছেন—বাজাচ্ছেন—দুজনের মুখেই হাসি। কখনও বা বলেছেন, মধুসূদন আমার হাজার দুয়েক টাকা দরকার। মধুসূদনবাবু প্রশ্ন করছেন—কখন চাই দাদা? পরে দেখি মধুসূদনবাবু গাড়ি থেকে নেমে টাকার বাণ্ডিল বাবার হাতে তুলে দিয়েছেন। কিছুক্ষণ পর একটা ভাউচার সই করিয়ে নিয়েছেন বাবার কাছ থেকে।

এই মধুসূদন ও বাবার দেনা-পাওনার হিসাব আমাদের জানা নেই। শুধু বুদ্ধি দিয়ে যা বুঝেছি, তাতে যা বুঝেছি, মধুসূদনবাবু বাবাকে কিনে নিয়েছিলেন—শুধু টাকা দিয়ে নয়—ভালবাসা প্রীতি ও শ্রদ্ধা দিয়ে। মধুসূদনবাবু বয়সে আমার মতই ছিলেন—কিন্তু এমন একজন পরম সুহৃদকেও আমরা হারিয়েছি। তবে যাবার আগেও বাবার শ্রাদ্ধের টাকার বেশীর ভাগটাই উনি দিয়ে গেছেন। শ্রাদ্ধ শেষ হলে—আমাদের মনে হয়েছিলো মধুসূদনবাবুর কাছে বাবার নিশ্চয়ই কিছু আর্থিক দেনা রয়ে গেছে। দাদা সনৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন—সম্রাট—দাদা ওই নামেই মধুসূদন-বাবুকে ডাকতেন—কতখানি আর্থিক ঋণ আপনার কাছে রয়েছে দয়া করে যদি বলেন—মধুসূদনবাবু চমকে উঠে অতি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠেছিলেন—এক পয়সাও না—এমনি সম্পর্ক ছিলো ওঁদের—ওখানে আমাদের নাক গলাবার প্রয়োজন বোধ করিনি আর। এইসব ছিল ওঁর খরচের একটা আবশ্যিক অঙ্গ এবং এতেই ছিল তাঁর আনন্দ। তাই ওঁর প্রয়োজন ছিল প্রচুর অর্থের। আর এই খরচ মেটাতে

গিয়ে হাত পাততে হত কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকদের কাছে। খরচের টাকা সংগ্রহ করতে গিয়ে কখনও কখনও কঠোর হয়েছেন তাঁর স্নেহভাজন প্রকাশকদের কাছে। পরবর্তীকালে প্রকাশ পেয়েছে—কোন প্রকাশক বই লিখে তাঁর সেই নিষ্ঠুর আচরণের কাহিনী ফেঁদে বসেছেন। অর্থাৎ তিনি শুধু তারাশঙ্করের স্নেহেরই ভাগীদার হতে চেয়েছিলেন—তাঁর দুঃখ বা অভাব বোঝবার মত ক্ষমতা তাঁর হয়নি।

এইখানে বেশ সংকোচের সঙ্গে কিছু কথা নিবেদন করছি, যার কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য নেই—শুধু অনুভূতির ব্যাপার। আমরা, বাড়ির মানুষেরা লক্ষ্য করেছি—এই বেহিসেবী খরচের জন্য পিতার টাকার অভাব হচ্ছে না। অর্থাৎ এই ধরনের খরচ করবার জন্যে, ওঁকে উৎসাহিত করবার জন্যে কোন এক অদৃশ্যশক্তি ওঁর দু হাত পূর্ণ করে দিচ্ছেন। হঠাৎ সিনেমার চুক্তি হয়ে যাচ্ছে, নয়ত কোন পুরস্কার পাচ্ছেন—নিদেনপক্ষে বইয়ের সংস্করণ শেষ হয়েছে—নতুন সংস্করণ ছাপতে যাবে—তার টাকা আসছে—পিতাও ওই সব টাকা তাড়াতাড়ি খরচ করে ফেলে নিশ্চিন্ত হচ্ছেন। এই ছিল সেই অদৃশ্য শক্তির অভিপ্রায়। ঠিক এমনিভাবেই এসেছিল জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। ১৯৬৬।৬৭ সাল—টাকার অভাবে ভুগছেন, মনে মনে বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ। পেয়ে গেলেন এক লক্ষ টাকা। খুব খুশী। খরচ করবার মত অনেক রসদ জমা হয়েছে তাঁর হাতে। এইখানে আরও একটু বলবো—তাঁকে আমরা অনুরোধ করেছিলাম—এইবার একটা ফ্রীজ কিনে ফেলুন। আপনি তো ঠাণ্ডা জল খেতে চান মাঝে মাঝে। ঠাণ্ডা ফলমূল খেতেও ভাল লাগবে। উনি বলেছিলেন—বাড়িটাকে বন্ধক-মুক্ত করি, মেরামত করি। পরে দেখা যাবে।

জ্ঞানপীঠ চেকটা ব্যাঙ্কে জমা হবার পর আমার উপর আদেশ হল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে ব্যাপারটা প্রথমেই মিটিয়ে ফেলতে। পিতৃদেব দাদা ও আমি তিন-জনেই হিন্দুস্থান বিল্ডিংএ গিয়ে হাজার পঁচিশেক টাকা দেনা শোধ করে বাড়ির দলিল ও পলিসীখানা নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। ইনকামট্যাক্সের দাবিও কিছু মেটাতে হল। কর্পোরেশনেও কিছু দেওয়া হল। বাড়িটার মেরামতি দরকার। এখান-ওখান ভেঙে গেছে—ফেটে গেছে, রং হয়েছে বিবর্ণ—অর্থাৎ সব কিছু শেষ করে যে টাকাটা বাঁচলো তা ব্যাঙ্কে ফিক্সড-ডিপোজিট করে রাখা হল।

দাদা একদিন হাসতে হাসতে আমাকে চুপিচুপি বললেন, ফিক্সড-ডিপোজিটটা তুলে একটা ভাল গাড়ি কেনার শখ হয়েছে বাবার। আমিও হাসলাম। ওঁর টাকা উনি যেমন ইচ্ছে খরচ করুন, আমাদের কি বলার আছে! তবে টাকাটা থাকলে টাকা না থাকার জন্যে মানসিক দুশ্চিন্তা ও যন্ত্রণার হাত থেকে অব্যাহতি দেয়।

ইতিমধ্যে ১৯৬৯ সালে আমি কলকাতা বদলী হয়ে এসেছি। এবং বাড়ির

কোষাধ্যক্ষ ও হিসাবরক্ষক পদে নিযুক্ত হয়েছি। চেকবই পাসবই সব কিছুই আমার কাছেই থাকে। সুতরাং পিতৃদেবের টাকার প্রয়োজন হলে আমাকে জানিয়ে দেন। তবে টাকা ফুরিয়ে গেলে দাদার উপর যতখানি রাগ করতেন, আমার উপর তা করেন না—কারণ আমার হিসাব থাকে নিখুঁত। সেখানে পাতা উল্টালেই দেখা যাবে আশী শতাংশ খরচ উনি নিজেই করেছেন। দাদার কোন হিসাব ছিল না। যাইহোক, বাবা কিন্তু নতুন গাড়ি কিনে ফেললেন। ফিক্সড-ডিপোজিট অবশ্য ভাঙতে হল না—টাকা দিলেন দেবসাহিত্য কুটীরের মধুসূদন মজুমদার।

১৯৭০ সালে কর্মস্থলে নকশালদের ঝামেলায় পড়ে গেলাম। তাই চাকরি বদল করে ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে দণ্ডকারণ্য রওনা দিই। যাবার দুদিন আগে ১৯৭১ সালের ৭।৮ আগস্ট পিতৃদেবকে একান্তে ডেকে বললাম—এই হিসাবের খাতাপত্র, এই চেকবই—এতে হাজার পাঁচেক মত টাকা আছে।

শুনে উনি চমকে উঠে বললেন—কি বললে? পাঁচ হাজার টাকা? আঃ কি স্বস্তি—বলে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদেছিলেন একটু।

এরপর আর মাসখানেক বেঁচে ছিলেন উনি।

কারো কাছে কোন দেনা রেখে যাননি।

ওঁর প্রয়োজনে অর্থ উনি পেয়েছেন দু হাত ভরে। আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষ—আমি দেখেছি ঈশ্বর ওঁকে ওঁর প্রয়োজনে ঠিক ঠিক সময়ে দাক্ষিণ্যের রসে ভরিয়ে দিয়ে গেছেন ওঁর দুই হাত—যাতে ওঁর খরচ করতে কোন কষ্ট না হয়—এবং অপরদিকে ওঁর শখের ফ্রীজ কেনাও যেন হয়ে না ওঠে।

॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকায়

পিতা তারাশঙ্করকে ঈশ্বর দিয়েছিলেন দু হাত ভরে—দিয়েছেন যশ, মর্যাদা, অর্থ, প্রাতপত্তি, ভর্তি সংসার; কিন্তু বিধাতা তাঁকে দেননি রূপ। যৌবনে যে লাবণ্যটুকু ছিল রাঢ়ের রৌদ্রতপ্ত মৃত্তিকায় উদাসীনের মত, দেশসেবার সূত্রে ও বিভিন্ন মেলায় হেথা হোথা ঘুরে ঘুরে বহিরাবরণ পুড়ে একেবারে কালো হয়ে গিয়েছিল। পরিশেষে যেটুকু ছিটেফোঁটা অবশিষ্ট ছিল সেটুকুও নিঃশেষ হল বন্দীজীবনের পর। ১৯৩০ সালে জেলে গিয়ে, ফিরবার সময় সঙ্গে নিয়ে এলেন এ্যামিবিক ডিসেন্টি, এবং চক্ষুপীড়া। সে চেহারার বর্ণনা দিতে গিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস ধাত্রীদেবতায় লিখেছেন—"শিবনাথকে দেখিয়া গৌরী বলিল, মাগো, ঘরের যেমন

ছিরি, তেমনই মানুষের ছিরি। তোমার রঙ কি কালো হয়েছে বল তো!" আর একবার সাহিত্য-আলোচনা করতে গিয়ে একজনকে বলছেন (দীপেন রাহা)—"এই যে আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। দেখতে কালো কুচ্ছিত। কথাটা সত্যি, অথচ কেউ যদি স্পষ্ট আমাকে একথা বলে—তাহলে কি আমার মনে লাগবে না? তাই অনেক ক্ষেত্রে অপ্রিয় সত্য বলতে নেই।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাঁর এই রূপলাবণ্যের অভাবের বিষয়ে তিনি নিজে ছিলেন বিশেষভাবে সচেতন। রূপহীনতার কথা নিজে কখনও কখনও আলোচনা প্রসঙ্গে বললে তিনি অন্য কারও মুখ থেকে একথা সহ্য করতে পারতেন না। প্রথম জীবনে কৌতুকবোধ করতেন; কিন্তু পরবর্তীকালে, প্রতিষ্ঠিত জীবনে এই রূপহীনতার অভাববোধটা বিশেষভাবে তাঁকে পীড়িত করত। যেন সব কিছু থেকেও বিশেষ একটা কিছু না থাকার ক্ষোভ।

যাইহোক জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পিতার বিষম অবস্থা। অসুস্থ দেহ, আত্মীয় পরিত্যক্ত, কেউ চেনাজানা মানুষ তাঁর দিক মাড়ায় না। সুতরাং শুরু করলেন সেই পূর্বের জীবন—এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি, সমাজসেবা। কাছারী-বাড়ির বারান্দায় বসে জমিদারীর কাগজপত্র দেখেন। হিসেব লেখেন কার কাছে কি পাওনা আছে। পাশে পড়ে থাকে কবিতার একখানি খাতা।

সামনে সুন্দর ফুলের বাগান—তার পরিচর্যা করেন। এই হল তখনকার দিনের প্রাক-দ্বিপ্রাহরিক আহার-পর্বের কর্মসূচী। হলঘরে তাঁর অষ্টম বর্ষীয় শিশু-পুত্র তার অগ্রজের সঙ্গে মাস্টার মহাশয়ের কাছে পড়তে পড়তে এসব লক্ষ্য করে, বিশেষ করে ছুটির দিনগুলোতে। জেলফেরত শীর্ণ কৃষ্ণকায়কান্তি অসুস্থ চোখ দুটো লাল হয়ে থাকে, জল পড়ে। গরম জলের সেঁক দেন। তুঁতে রঙের ওষুধ লাগান। ভাল করে খেতে পারেন না। খাদ্য গ্রহণ অসমাপ্ত রেখে হঠাৎ উঠে বাথরুম যান। পরনে থাকে ধুতি কাছা দিয়ে পরা, গলায় কখনও পৈতা থাকে কখনও থাকে না, আবরণহীন ঊর্ধ্বাঙ্গ, পদদ্বয় নগ্ন। একেবারে খাস বীরভূমের মনিষ্যি। শিশুটির মনে অসুস্থ পিতার জন্য ব্যাকুল ব্যথা। মাঝে মাঝে ওঁর কাছে যেসব লোকজন আসেন তাঁরা শিশুটির অপরিচিত—গ্রামের লোক নয়। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তাঁরা চলে গেলে ঘুরপাক খান—বারান্দায়—বাগানে। কখনও বা রাস্তার ওপারে ভেতর-বাড়িতে চলে যান চায়ের নেশার টানে।

শীত চলে গেছে, পৃথিবী ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হচ্ছে। এমন দিনে একজন বয়স্ক মানুষ হাজির হলেন পিতার দর্শনপ্রার্থী হয়ে। বগলে বাঁশের বাঁটের সাদা কাপড়ের তালিমারা একটি ছাতা, গায়ে ফতুয়া, ফতুয়ার ফাঁক দিয়ে কালো মোটা পৈতেটা

ঝুলছে, খাটো সস্তা ধুতি পরনে—বীরভূমের মার্কামারা চেহারা। বাবাকে বারান্দায় জমিদারীর কাগজপত্র নিয়ে কাজ করতে দেখে এবং চেহারা মিলিয়ে তাঁকে নায়েব-মশাই বলে ধরে নিলেন। ঘনিষ্ঠ হয়ে নিম্ন গলায় যা বলেছিলেন তার মর্ম হল এই :—এ বাড়ির বড়বাবু জেলখাটা মানুষ, লোকটি নাকি ভাল নয়—নইলে তাঁর মত দরিদ্র ব্রাহ্মণের সামান্য বাৎসরিক বৃত্তি (এক টাকা কিংবা দু টাকা) বন্ধ করে দেবেন কেন ?

তিনি নায়েব মশায়কে দুটি টাকা জলপান করতে দিতে রাজী আছেন যদি নায়েব মশায় ব্যবস্থা করে ঐ বৃত্তিটির পুনঃপ্রবর্তন করে দিতে পারেন। কথাবার্তা সেরে ভদ্রলোকটি চলে যেতেই পিতৃদেব হাহা করে হেসে উঠেছিলেন। কথাটা তাঁর বয়স্য ষষ্ঠীরাম মুখোপাধ্যায়কে বলবার জন্য উঠে পড়লেন। ষষ্ঠীরামদা বয়সে পিতার জ্যেষ্ঠ হলেও সম্পর্কে ভাইপো। তিনি বাবাকে খুড়ো বলে সম্বোধন করতেন, আমরা বলতাম ষষ্ঠীরামদা।—

তিনি থাকেন রাস্তার ওপারে, আমাদের ভেতর-বাড়ি যাবার পথে। বাবা রাস্তায় বেরিয়ে দেখলেন সেই লোকটি ষষ্ঠীরামদার সঙ্গে কথা বলছেন। বাবাকে দেখতে পেয়ে ষষ্ঠীরামদা চেঁচিয়ে বলে উঠলেন—ওই তো বড়বাবু আসছেন—তা ওঁকেই বলুন না কেন ব্যাপারটা। লোকটি বাবাকে সনাক্ত করতে পেরেই অত্যন্ত ক্ষিপ্র গতিতে দৃষ্টির আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাবা সব কিছু ষষ্ঠীরামদাকে বলে প্রাণ খুলে দুজনে হাসতে লাগলেন। ষষ্ঠীরামদা তিরস্কারের ভঙ্গিতে বাবাকে বলেছিলেন—যাই বল খুড়ো ; তোমার কিন্তু গায়ে একটা কিছু রাখা দরকার।

আরও একটি ঘটনার কথা মনে আসছে। ঘটেছিল পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩২ সালে লাভপুরেই। আমরা দুই ভাই আর দুই বোন হলেও সেদিন কিন্তু আমাদের ছোট দুই বোনের মাঝখানে আর একটি পিতার পরম আদরিণী কন্যা ছিল। তার নাম ছিল বুলু। তারাশঙ্কর তাঁর 'বাণীমা' গল্পে লিখেছেন—"বাণীর আগে আমার একটি মেয়ে হইয়াছিল—কালো মেয়ে, একটি চোখ ট্যারা, তার নাম দিয়েছিলাম বুলবুল। বুলবুল শেষে সংক্ষিপ্ত হইয়া বুলুতে পরিণত হইয়াছিল।"

লাভপুরে আমাদের বসতবাড়ির পাশেই ঠাকুরবাড়ি। সেখানে দুর্গামণ্ডপ, কালী-মন্দির, একটানা ছোট ছোট পার্টিশন করা অফিস চেম্বারের পঞ্চশিবের মন্দির, নাটমণ্ডপ এই সবই আছে এবং এই দেবোত্তর স্থানের আমরা একটা মোটা অংশের অংশীদার। সেদিন সম্ভবতঃ বৈশাখ মাসের সকালবেলা। আমার ছয় বছরের বোন বুলু একটা যেমন-তেমন জামা গায়ে দিয়ে, তার বন্ধুদের নিয়ে ঠাকুরবাড়ির বারান্দায় খেলা করছিল। এক্কা-দোক্কা জাতীয় খেলা। সেই সময় সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন

মায়ের ছোট মামী—বিশ্বেশ্বরী ঠাকরুণ। যত ধনী, তত সৌন্দর্যময়ী, এবং তেমনিই নিষ্ঠাবতী। সেকালে কৈলাস-মানসসরোবর তীর্থ দর্শন করে এসেছেন। এই পরম শ্রদ্ধেয়া মহিলাটিকে গ্রামের সকলেই সসম্ভ্রম শ্রদ্ধা করত। তিনি যাচ্ছিলেন একটু দূরে নিজেদের ঠাকুরবাড়িতে। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ে একটি কালো কুচ্ছিত মেয়ে ঠাকুরঘরের বারান্দায় উঠেছে। মনে সিদ্ধান্ত করলেন নিশ্চয়ই কোন নীচজাতীয়া ঐ কন্যাটি। তাই রাগত স্বরে বুলুকে উদ্দেশ করে বললেন—এই ওরে! ওলো এই বাউড়ী মেয়েটা, ঠাকুরঘরে উঠেছিস কেনে। বুলু সরবে প্রতিবাদ জানিয়েছিল—আমি বাউড়ীদের মেয়ে হব কেন? আমি তো ফণ্টীর মেয়ে। (ফণ্টী আমার মায়ের ডাক নাম)। এইবার চরম নাটকটি ঘটে গেল।

বুলুর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বেশ্বরী ঠাকরুণ হতবাক হয়ে বলেছিলেন—তুই ফণ্টীর মেয়ে! ম্যাগো—কি ছিরি মেয়ের—! ট্যারা, কালো কুচ্ছিত—এটা ফণ্টীর মেয়ে?

বুলু অভিমানে ক্ষোভে চোখে জল নিয়ে ছুটে বাড়ি ফিরেছিল। বাবা বসে চা খাচ্ছিলেন—তাঁর কোলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। ফুলে ফুলে সেদিন তার কি কান্না। পরে আবেগ কিছুটা প্রশমিত হলে—দু হাতে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল—বাবা তুমি কালো আর আমি কালো এই বাড়িতে—আর সবাই ফর্সা। পিতা-পুত্রী দুজনেরই কারও চোখ শুকনো ছিল না তখন। সেই বুলু সে বছরই নভেম্বর মাসে ম্যালিগনেণ্ট-ম্যালেরিয়াতে মারা গেল। বাবা শোকে দুঃখে প্রায় পাগল হয়ে গেলেন। 'আমার সাহিত্যজীবনে' এই মৃত্যুকে উপলক্ষ করে কয়েক লাইন লিখে রেখে গেছেন—"বুলু মারা গেল ৭ই অগ্রহায়ণ, রাত্রে। রাত্রি দশটায়।...

সেকি রাত্রি! সেকি অন্ধকার!

মনে হয়েছিল, এ রাত্রি কোনকালে শেষ হবে না। অনন্ত এক রাত্রির অস্তিত্ব যেন অনুভব করেছিলাম। আকাশের দিকে চেয়ে বসেছিলাম, সীমাহীন অনন্ত আকাশ যেন রাত্রির সঙ্গে নেমে এসেছিল আমার চারিদিকে। মনে হয়েছিল, এ পৃথিবীতে এক শোকাহত আমি ছাড়া আর কেউ কোথাও নাই; অসীম অনন্ত অন্ধকার অকূলের মধ্যে আমি হারিয়ে গিয়েছি।"

আজ জীবনসায়াহ্নে, অবসর মুহূর্তে যখন অতীতের দিকে ফিরে তাকাই, তখন আবিষ্কার হয় কত কথা, কত ব্যথা, কত আনন্দ। আবিষ্কার করেছি—বাবা কালো বুলুও কালো, তাই হয়ত বুলুই ছিল তাঁর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ আদরিণী সন্তান। নইলে দিনের পর দিন অত রাত্রি পর্যন্ত শ্মশানে বুলুর চিতার পাশে বসে থাকবেন কেন?

নইলে ১৯৬২ সালে মৃত বুলুর ছবিটি দেখতে না পেয়ে সমস্ত বাড়িটিকে তিরস্কারের তিক্ততায় ভরে দেবেন কেন? কেনই বা লিখবেন, "তিনি কালো মানুষ—সে কালো ছিল। কেউ তাকে কালো মেয়ে বললে—সে তাঁর কোলে এসে লুকিয়ে বলত —বাবা, তুমি কালো আমি কালো। আমরা দুজনে ঘরে যাই চল। পাঁচ-ছয় বছর বয়সে সে মারা যায়। বড় প্রিয় ছিল সে। বড় প্রিয়, বড় মমতাময়ী। বুলু তার সকল দুর্ভাগ্য নিয়ে অকালে চলে গিয়েছে। সেই ম'রে তাঁর প্রতিষ্ঠার পথ মুক্ত করে দিয়ে গেছে এই তাঁর বিশ্বাস।" (কয়েক ফোঁটা রক্ত) আমি তো মনে করি তাঁর বিগত-দিনের ঐ স্মৃতিই তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছিল—"এই খেদ মোর মনে, ভালবেসে মিটল না সাধ কুলাল না এ জীবনে। জীবন এত ছোট কেনে—হায়!" আর সেই অদ্ভুত লাইনটি—"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?"

এরপর কলকাতাতে এসেছি আমরা। পিতা তারাশঙ্কর টালাতে নিজের বাড়ি করেছেন। তাঁর রূপহীনতা নিয়ে এই ঘটনাটি ঘটেছিল এই টালার বাড়িতে ১৯৪৯-৫০ সালে। তখন আমাদের বাড়ির চারিদিকটা ছিল বেশ ফাঁকা। আশেপাশে তেমন বাড়ি বিশেষ ছিল না। সেই কারণেই আমাদের বাড়ির পাশের দিকটাতে কোন সীমানা প্রাচীর গড়ে ওঠেনি। বাঁশের বেড়া ছিল সেখানে। তার গায়ে নানারকম লতানে ফুল। মর্নিংগ্লোরির এমনি একটি লতানে গাছের বেগুনী রঙের ফুলের সৌরভ দেখে বিভূতিভূষণ একদা আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন। যাক সেকথা।

পিতৃদেব সকাল থেকেই ডেস্কে বসে লেখা শুরু করতেন। মাঝে মাঝে চিন্তিত-মুখে বাইরে এসে দাঁড়াতেন। কখনও বা খুরপি নিয়ে ফুলগাছের গোড়াগুলো আলগা করে দিতেন। কিন্তু মনে মনে ভাবতেন লেখার কথা। তাই মাঝে মাঝে লেখার জায়গাতে ফিরে গিয়ে লেখা শুরু করেন। পরনে থাকত লুঙ্গীর মত করে পরা কাঁচি ধুতি, ঊর্ধ্বাঙ্গ নিরাবরণ, নগ্ন পদযুগল। পৈতেটা ছোট করে গলায় ঝুলত মালার মত। কখনও কখনও বা লেখার ডেস্কে রাখা থাকত। সেদিন বাগানে অর্থাৎ লেখার জায়গার পাশে খোলা মাটিতে ফুলগাছগুলির গোড়া খুঁড়ছেন চিন্তিত মনে। একজন ভদ্রলোক ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, কাঁধে চাদর, পায়ে কালো বার্নিশ করা জুতো এসে দাঁড়ালেন বাবার পেছনে এবং জিজ্ঞাসা করলেন—তারাশঙ্করবাবু বাড়ি আছেন কি? বাবা খুরপি রেখে, হাত ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়ে ভদ্রলোকের সামনে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন—বলুন।

উদ্দেশ্য, বোধহয়, বাবার মনে হয়েছিল, ভদ্রলোক বোধহয় তাঁকে এবার চিনতে পারবেন। তাই উঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, বলুন।

ভদ্রলোক কিন্তু আবার প্রশ্ন রাখলেন—'তারাশঙ্করবাবু বাড়ি আছেন কি? তাঁকে

একটু খবর দাও।' বাবা তাঁর মুখের দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বললেন—'আপনি বসুন, আমি খবর দিচ্ছি।'

এই কথা বলে ভেতরে চলে এলেন, এবং ভাল ধুতি পাঞ্জাবি পরে ভদ্রলোকের সামনে এসে দাঁড়ালেন এবং বললেন—'আমিই তারাশঙ্কর। বলুন—কি বলবেন?'

ভদ্রলোক তো মহা অপ্রস্তুত। বার বার ক্ষমা চাইতে লাগলেন। বাবা কিন্তু সারাক্ষণ মিটিমিটি হেসেই কথাবার্তা চালিয়ে গেলেন। কথাবার্তার শেষে ভদ্রলোক আবার হাতজোড় করে বারবার ক্ষমা চেয়ে বিদায় নিলেন।

এরপর দেখতে পেলাম—বাবার হাতে দুটি সোনার আংটি। একটি পলা, অন্যটি সবুজ রঙের পান্না। পরেছিলেন অবশ্য তাঁর পরম স্নেহভাজন দ্বারেশ শর্মাচার্যের পরামর্শক্রমে। তবে এখন মনে মনে ভাবি—ঐটা হয়ত একমাত্র কারণ ছিল না। এটা তিনি ধারণ করেছিলেন অভিজ্ঞানের জন্য। যেন বক্তব্য ছিল—চেহারা দেখে তারাশঙ্কর বলে মনে না হলেও আংটি দুটোর দিকে চেয়ে হিসেব করে নাও। মাঝে মাঝে ঐ আংটি দুটি পৈতের সঙ্গে গলায় ঝুলত বা লেখার ডেস্কে বিরাজ করত। কতবার বাথরুমে ঐ আংটি রেখে এসে পরে ড্রেন থেকে তা কুড়িয়ে আনতে হয়েছে সন্ধান করে। মোটকথা ভূষণে তাঁর কোন মোহ জন্মায়নি। বড় বেশী নির্লিপ্ত।

অনেক প্রকাশনালয় থেকে তখন তাঁর একাধিক বই প্রকাশিত হত। কিন্তু ডি. এম. লাইব্রেরী থেকে কোন বই বহুকাল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। কারণ অবশ্য একটা ছিল। এই প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য এক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের খান দুয়েক বই প্রকাশিত হয়েছিল। নাম-বিভ্রাটের আশঙ্কায় বাবা কোন বই এই প্রকাশককে দেন-নি। অবশেষে তাঁর অনুজপ্রতিম ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের বিশেষ আগ্রহে তাঁরই মধ্যস্থ-তায় পিতা এই প্রতিষ্ঠান থেকে একখানি বই প্রকাশ করতে দিতে সম্মত হন। নীহার গুপ্তের অনুরোধ মত একদিন গেলেন ডি. এম. লাইব্রেরীতে—বিবেকানন্দ রোড বিধান সরণীর সংযোগক্ষেত্রে। গরমের দিন, দুপুরবেলা। কাউণ্টারে লোকজন নেই। কাউণ্টারের সামনেই বসে আছেন মালিক গোপালদাসবাবু—মোটা কুচকুচে কালো চেহারা, চোখে চশমা।

বাবা কাউণ্টারে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন—'আমার একখানা বই প্রকাশের ব্যাপারে আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

গোপালবাবু নির্বিকার দৃষ্টিতে বাবার দিকে তাকিয়ে থেকে প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনার নাম?'

বাবা উত্তর দিয়েছিলেন—'আমার নাম তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।'

গোপালবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন—'ভক্ত, (ওঁর ভাই) ও ভক্ত! দেখ তো ব্যাপার!'

এই ভদ্রলোক বলছেন উনি নাকি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।'

মুহূর্তে সেই পুরনো ক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। ভক্তবাবু উঠে আসবার আগেই বাবা তখন কাউণ্টার থেকে নেমে পড়েছেন। পেছন ফিরে রাগতস্বরে বলে উঠলেন—'আপনার ঐ চেহারা নিয়ে আপনি যদি এই দোকানের মালিক গোপালদাস মজুমদার হতে পারেন, তবে এই চেহারাতে আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় হতে পারি না কেন?'

অবশ্য পরবর্তী জীবনে ডি. এম. লাইব্রেরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল—সেও ওই নীহাররঞ্জন গুপ্তের প্রভাবেই।

আর একটি ছোট ঘটনার কথা বলে পিতার রূপহীনতা চর্চার কাহিনী শেষ করব। এই ঘটনাটি একান্তভাবে আমাদের ঘরোয়াজীবনের কাহিনী। শেষের দিকে তাঁকে তাঁর চেহারার জন্য আর কেউ ভুল করত না। কারণ অবশ্যই ছিল। সেটা তাঁর সেদিনের চেহারা। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী এবং সরস্বতীর আশীর্বাদধন্য মানুষ তখন তারাশঙ্কর। সারাদেহে হৃত লাবণ্য ফিরে এসেছে, শরীরে মাংস লেগেছে, চোখের ছটায় বুদ্ধির শানিত দীপ্তি এমন কি কলকাতায় স্থায়ী বসবাসের ফলে কালো রঙও বেশ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এ সময়ের পিতৃদেবকে দেখে প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন—'একটি শীর্ণকায় অথচ কেমন তপোদীপ্ত মানুষ।' সন্তোষ ঘোষের মনে হয়েছিল—'দীপ্তচক্ষু শীর্ণ সে এক সন্ন্যাসী।'

এতদসত্ত্বেও নিজের বিগতদিনের রূপহীনতার কথা স্মরণে রেখে সাহিত্যিকরা মিলে যখন কোন অভিনয় করতেন—পিতা সর্বাগ্রে চাকরের পার্টটি নিজের জন্য বেছে নিতেন।

যাক, শেষ ঘটনাটি ঘটেছিল মৃত্যুর বছর দুই-তিন আগে।

তখন কলকাতার সমাজে পুরুষেরাও মেয়েদের মতো ছিটের চকাবকা রঙের জামা পরতে শুরু করেছেন এবং বেশ চালুও হয়ে গেছে।

সেদিনে সকালে লেখার ঘরের সামনের বারান্দায় বসে খবরের কাগজ পড়ছি আমরা অনেকে। তখন অনেকগুলো খবরের কাগজ আসতো আমাদের বাড়িতে। হঠাৎ দেখি বাবা ঐ রকম একটা চকাবকা রঙের হাওয়াই শার্ট পরে লেখার ঘরে ঢুকলেন। সঙ্গীন অবস্থা আমাদের। হাসি চেপে রাখা যাচ্ছে না আর। যথাসম্ভব মাথা নীচু করে খবরের কাগজ পড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দাদার কি দুর্মতি হল—ফস করে বলে উঠলো—বাবা, এ জামাটা—আপনি—পরলেন?

সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন পিতৃদেব। চোখ দুটোও সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো। দাদার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন—'এ জামাটা

আমাকে মানাচ্ছে না—না ? কি—তাই তো ? বলছো না কেন—আমাকে এ জিনিস মানায় না—তাই তো ?’

কথা বলতে বলতেই লেখার ডেস্কের দিকে এগিয়ে গেলেন। সেখান থেকে নিমেষের মধ্যে কাগজকাটা ছুরিটা নিয়ে জামাটার মধ্যে লম্বা করে চালিয়ে দিলেন। দু হাত দিয়ে জামাটা ফালা ফালা করে ফেললেন।

আমরা ভয়ে, বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দেখছি। বাবার রূঢ়তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় আছে, তবে এতখানি— ?

ঐ ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে আবার আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়ে তীব্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন—‘কি, এবার ঠিক মানিয়েছে তো ? দেখ।’

অসম্মানিত এই তীব্র তিরস্কারে দাদার চোখে জল এসে গিয়েছে তখন। ‘আমি তা বলিনি বাবা, আমি তা বলিনি’ বলতে বলতে চোখের জল মুছতে মুছতে ভেতরে চলে গেলেন।

আমরাও প্রভাতী বাতাবরণের আকস্মিক এই বিস্ফোরণ আর সহ্য করতে পারছিলাম না। উঠবো উঠবো ভাবছি।

এমন সময় আমাদের মুক্তিদাতা হয়ে ঘরে ঢুকলেন যতীন্দ্রমোহন দত্ত—যমদত্ত। এসেই তিনি চিৎকার করে উঠলেন, ‘কই হে সনৎ (আমার দাদা)! আমি এসে গেছি। বাইরে চা বিস্কুট পাঠাও।’

আমরাও উঠে পড়লাম।

মিনিট কয়েক পরে লেখার ঘরের জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলাম—দুজনেরই মুখে প্রসন্ন হাসি। যমদত্ত চা খাচ্ছেন, বাবা লিখছেন। যমদত্ত বলছেন—‘আচ্ছা, যতসব মিথ্যা কথা বানিয়ে বানিয়ে লেখো—নরকেও যে তোমার ঠাঁই হবে না।’

বাবা প্রসন্ন হেসে লিখতে লিখতেই জবাব দিলেন—‘কি করে হবে বলো ? সেখানে তো যমদত্ত আগে থাকতেই আসন রিজার্ভ করে রেখেছেন।’

তারপর দুজনের প্রাণখোলা হাসি।

যাক! এবারের মত তাহলে ভিসুবিয়াসের অগ্ন্যুদ্গীরণ সমাপ্ত।

॥ ৯ ॥

ধূমপান ত্যাগ

আমাদের দেশে ধূমপান একটি আদিমতম নেশা। আমার বাবাকেও আমি আমার ছোট বয়সে দেখতাম ধূমপানের জন্যে বিড়ি খেতে। থাকতেন লাভপুরে। অল্প যেটুকু

জমিদারী ছিল—তা দেখাশোনা করতেন। কখনও বা সমাজসেবা অর্থাৎ রুগীর সেবাযত্ন, গরীবদের জন্য চাল সংগ্রহ ও বিতরণ করতেন; কখনও বা বোঁচকা বেঁধে গ্রামে গ্রামে হেথাহোথা মেলায় মেলায় ঘুরে বেড়াতেন। আর এইসব কাজগুলির মধ্যেই ধূমপানের জন্য বিড়ি খাওয়া চলতো। শুধু কিছুকাল মাদকদ্রব্য বর্জনের আন্দোলনের জন্য ধূমপান বন্ধ ছিল। আবার জেল থেকে ফিরে খাওয়া শুরু করেছিলেন। সে সময় কতগুলো বিড়ি প্রতিদিন তাঁর প্রয়োজন হত তা বলতে পারবো না—কারণ সে সময় বয়স ছিল মাত্র আট বছর।

১৯৩৩-৩৪ সালে—যখন আরও একটু বড় হয়েছি, বছর বারো বয়স, তখন বাবাকে দেখতাম মাঝে মাঝে কলকাতা যেতে। একসারসাইজ বুকে কপিংপেন্সিল দিয়ে কি সব লেখালেখি করেন আর সেগুলো ছাপা হয় কল্লোল, উপাসনা, বঙ্গশ্রী, অভ্যুদয় প্রভৃতি সে সময়কার মাসিকপত্রগুলিতে। সে সময় বিড়ির সঙ্গে মাঝে মাঝে সিগারেটও খাচ্ছেন। ঐ ভাবেই চলছিল ১৯৪০ সাল পর্যন্ত।

এরপর আমরা লাভপুর থেকে কলকাতা এলাম। তখন ও-বাড়ির মালিকের ছেলে মেঘনাদবাবু 'Wood-Bine' বলে মিলিটারীদের জন্য বরাদ্দ সিগারেট এনে দিতেন। পঁচিশ প্যাকেটওয়ালা একটা বড় প্যাকেট। ওতেই তাঁর মাস চলে যাবার কথা ছিল—তবে যেতো না। আরও দু-চার প্যাকেট দরকার হত। অর্থাৎ হিসাবে দেখা যাচ্ছে এক প্যাকেট সিগারেট আর একতাড়া বিড়ি ওঁর দৈনিক বরাদ্দ সে সময়ে। আরও কিছুদিন পর ১৯৪৩-৪৪ সাল হবে—আমাদের বাড়িতে আসতে শুরু করলো গোল্ডফ্লেকের টিন। তখন বোধহয় গোল্ডফ্লেকের প্যাকেট ছিল না—বিক্রি হত টিনে এবং এক টিনে থাকতো পঞ্চাশটা।

আর্থিক সচ্ছলতা আসার সঙ্গে সঙ্গে ওঁর সিগারেট খাওয়া বেড়েছিল প্রচণ্ডভাবে। তবে তখন উনি লিখতেনও প্রচুর এবং ওঁর লেখার কদর ও দাবী বেড়েছে বহুগুণ। একসময় লেখা লিখে কবে ছাপা হবে জানবার জন্যে কাগজের মাসিকগুলোতে ঘুরে ঘুরে খবর নিতেন। কিন্তু সেই সময় অর্থাৎ ১৯৪৩-৪৪ সালে দেখা গেলো কাগজগুলো থেকেই লোক আসে ওঁর কাছে লেখার দাবি জানিয়ে তাগিদ দিতে। সুতরাং বিড়ি খাওয়া একদম বন্ধ হয়েছে। চলছে শুধু গোল্ডফ্লেক, এক টিন এবং কিছুদিন পর সেটা বেড়ে দাঁড়ালো দেড় টিনে। এর মধ্যে অবশ্য সবগুলো উনি খেতেন না—আগন্তুকদের কেউ কেউ ওই টিন থেকেই সিগারেট ব্যবহার করতেন। এইভাবেই চলেছিলো দীর্ঘ বিশ বছর।

১৯৪৯ সালে টালাতে বাড়ি করে উঠে এসেছেন। সিগারেটের মাত্রা ও মান ঐ একরকমই চলেছিল ১৯৬০-৬২ সাল পর্যন্ত। একবার শখ হয়েছিল গড়গড়াতে

তামাক খাওয়ার। চিত্রপরিচালক সরোজ দে মশায়ের দেওয়া গড়গড়াতে খুব ভাল তামাক খেতেন। গোটা বাড়িটা সুন্দর গন্ধে ভরে উঠতো। কিন্তু ও পোষালো না—সেই পুরনো ব্যবস্থা গোল্ডফ্লেকেই ফিরে গেলেন মাস কয়েকের মধ্যে।

হঠাৎ অসুখে পড়লেন—হৃদযন্ত্রের গোলমাল। ডাঃ আর. এন. চট্টোপাধ্যায় পরীক্ষা করে বললেন সিগারেট খাওয়া বন্ধ করতে হবে। সিগারেট বন্ধ হল। তার জায়গায় শুরু হল সিগার—অর্থাৎ চুরোট। ভাল দেখে কাঠের পুরো বাক্স ভর্তি—মনে হয় পঁচিশটা থাকতো—চুরোট আনা হল। এক বাক্সে প্রায় দুটো দিন যেতো।

কিন্তু মুশকিল হল উনি ওই সিগারের আগুনে সব কিছু পোড়াতে শুরু করলেন। নিজের বসার জায়গা—পরনের কাপড় পুড়তে লাগলো একের পর এক। লিখতে লিখতে অন্যমনস্কভাবে জ্বলন্ত সিগার রেখে দিতেন আশেপাশে কোনখানে। খেয়াল থাকতো না লেখার তন্ময়তায়। তার ফলে ঘটতো এই সব অগ্নিকাণ্ড। পোড়া গন্ধ পেয়ে আমরা দৌড়ে যেতাম। সেই সময়টাতে অগ্নিনির্বাপণ আমাদের জীবনযাত্রায় একটা অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

একদিন বেশ ভাল রকমের অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেলো। বসার জায়গাটাতে হরিণের চামড়ার উপর জ্বলন্ত সিগার রেখেছেন। চামড়া পুড়ে নীচেয় ছোট গদিটাতে আগুন ধরে গেলো। উনি তখনও নির্বিবাক লিখে চলেছেন। হঠাৎ চমকে উঠলেন পেছনে ছ্যাঁকা পেয়ে। অর্থাৎ কাপড়ে আগুন লেগে সেটা পুড়েছে এবং তার আঁচ লেগেছে পেছনে। উঠে পড়লেন। সকলে মিলে আগুন নেভালো। বাবা বললেন, আর না—আজ থেকে ধূমপান বন্ধ। বন্ধ কিন্তু যাঁরা একবার ধূমপানের শিকার হয়েছেন—তাঁরা জানেন এ বস্তুটি পরিত্যাগ করা কত কঠিন ব্যাপার। সুতরাং শুরু হল নতুন পন্থার। জোয়ান ভেজে, গুঁড়ো করে একটা দোকানের নস্যির কৌটোর মত একটা কৌটোতে ভর্তি করা হল—সঙ্গে একটা ছোট চামচ। এই জোয়ান ভাজা গুঁড়ো পাঁচ মিনিট অন্তর এক চামচ করে মুখে দিতে লাগলেন। ফলে লেখার অসুবিধা ঘটতে লাগলো। তাছাড়া দুর্বল পাকযন্ত্রে জোয়ানের তীব্রতা প্রদাহের সৃষ্টি করতে শুরু করলো। বন্ধ হল এ ব্যবস্থা। এরপর নতুন আর একটা রাস্তা ধরলেন—কঠিন আত্ম-নিগ্রহ। ধূপকাঠি জ্বেলে রাখলেন লেখার ডেস্কে। ধূমপানের ইচ্ছা হলে হাতে ছ্যাঁকা দিতেন। সমস্ত স্নায়ু চমক দিয়ে উঠতো—দূর হত ধূমপানের ইচ্ছা। এটা আমরা সময়মত জানতে পারিনি। জানা গেলো দুটো হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত ফোস্কা দেখে। সেগুলো শুকিয়ে গোটা হাতে বসন্ত হওয়ার মত সাদা সাদা দাগ হয়ে রইলো। লোকে জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলতেন না—মুচকি মুচকি হাসতেন।

ধূমপান ছাড়ার ব্যাপারে মার প্রশ্রয় অবশ্যই ছিল। কিন্তু শেষের এই আসুরিক

পদ্ধতির কথা জানতে পেরে বাবাকে সজল চক্ষে তিরস্কার করেছিলেন।

নিয়মমত তিরস্কার পর্ব কলহে পরিণত হবার কথা ; কিন্তু সেদিন তা হয়নি। হয়ত ধূমপান ত্যাগ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই মায়ের সঙ্গে সহাস্যে মিষ্টি কথা বলেছিলেন। আমরা ভাইবোনেরা দূরে সরে গিয়ে পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে তৃপ্তির হাসি হেসেছিলাম।

১৯৬৭ সালের পর থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত (১৯৭১) আর উনি ধূমপান করেন-নি। ওঁর এ বিষয়ে যে লেখাটুকু তাঁর 'আমার কথা'তে দেখতে পাচ্ছি তাতে ধূমপান পরিত্যাগের কারণ কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য নয়। উনি লিখছেন—

"ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ অবশ্য স্বাস্থ্যের জন্য নয়, ধূমপান ছাড়লাম আত্ম-নির্যাতনের জন্য। একটি ক্রোধ হয়েছিল—হয়েছিল সংসারের উপর। এ সময় সংসারকেই দায়ী করতাম আমার সকল কিছু দুঃখ এবং দুর্ভোগের জন্য। এই সময়ের একদিনের ডায়রী : 'জীবনে ভাল না-লাগার স্বর চাপা ক্রন্দনের মত অহরহ বেজে চলেছে। দেহ ক্লান্ত, মন ক্লান্ত, মস্তিষ্ক ক্লান্ত। ছুটি চাই, ছুটি চাই, ছুটি চাই বলেই চলেছে সে। সংসার একান্ত নিস্পৃহভাবে বলছে, ছুটি নাই, ছুটি নাই, ছুটি নাই। মৃত্যু ছাড়া ছুটি নাই। কিন্তু মৃত্যু আসে না। কেন আসে না ? আত্মহত্যা করতে পারি মুখে বলি বা মনে ভাবি, কিন্তু তা পারি কি ? পারি না। এর জন্য সংসার দায়ী। এই সংসার।'

এই সংসারের উপর ক্রোধ হওয়া স্বাভাবিক। ক্রোধ হয়েছিল। সে ক্রোধ অত্যন্ত নিষ্ঠুর। কিন্তু সে ক্রোধকে ফেটে পড়তে আমি দিইনি। কারণ এটুকু বোধ ছিল যে, এ ক্রোধকে ব্যক্ত করলে যে সংসার আমাকে আশ্রয় করে নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে, তাতে হয়তো সংসারে আগুন ধরে যাবে। তারা বাঁচাকেই দুর্ভাগ্য বলে মনে করবে। সুতরাং একে প্রকাশ করতে পারিনি। কিন্তু একটা কিছু করা প্রয়োজন ছিল—যার মধ্যে দিয়ে এই উত্তাপকে নিঃশেষিত করে দিতে পারি। কারুর উপর ক্রোধের আগুনটি যেন নিক্ষেপ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

এই কারণেই ধূমপান পরিত্যাগ করলাম। হাতে ছিল জ্বলন্ত চুরুট—সেটা ফেলে দিলাম। আর খাব না।"

॥ ১০ ॥

৮ই শ্রাবণ

শ্রাবণ মাস পড়লেই আমাদের বাড়িতে একটা উৎসবের আমেজ লেগে যেতো। বাবার জন্মদিন—অর্থাৎ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন—৮ই শ্রাবণ। জন্মদিনের তারিখটা নিয়ে কিছু বিতর্ক আছে তবে সেটা তিনি নিজেই সমাধান করে দিয়ে গেছেন। তিনি লিখেছেন—"১৮৯৮ সালের জুলাই মাসে—বাংলা ১৩০৫ সালের ৮ই শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্বলগ্নে আমার জীবনযাত্রার শুরু। আমাদের অঞ্চলে বলে ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য উদিত হয়নি, তার লাল আভা ফুটেছে পূর্বদিগন্তে, এমনি সময় আমার জন্ম বলে শাস্ত্রমতে আমার জন্মদিন ৭ই শ্রাবণ। অল্প কয়েক মুহূর্তের জন্য একদিন আয়ু আমার হয় বেড়ে বা কমে গেছে।"

আমাদের দেশে প্রত্যেকটি মানুষ তাদের জন্মদিনে একটি পরিচ্ছন্ন পবিত্র জীবন পালনের বাসনা নিয়ে দিন শুরু করে—দেবতা ও গুরুজনদের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। দেবতার প্রসাদী পরমান্ন গ্রহণ আমাদের সকলেরই জীবনে একটি বাৎসরিক ঘটনা।

ছেলেবেলায় লাভপুরে গ্রামের বাড়িতে দেখেছি দুপুরে ঠাকুমা বাবার কপালে চন্দন—দই হলুদের ফোঁটা দিয়ে দিতেন, মাথায় দিতেন লক্ষ্মীজনার্দনের নির্মাল্য—মা ফুল্লরার বেলপাতা; গঙ্গামাটি ছুঁইয়ে দিতেন কপালে। মেঝেতে গালচের আসনের উপর বাবা পূর্বদিকে মুখ করে বসে—ঠাকুমাকে প্রণাম করে জন্মদিনের পরমান্ন গ্রহণ করতেন। ভাসা মাণিক চালের ভাত, গাওয়া ঘি, লেবু, দেড় কেজি দু কেজি মাছের মাথার সরিষার ঝাল, মাছের টক (অম্বল), কিছু ভাজাভুজি, ক্ষীর চাঁচির মিষ্টি এবং পরমান্ন অর্থাৎ লক্ষ্মীজনার্দনের প্রসাদী চালের পায়স। সামনে জ্বলতো পিলসুজের উপর প্রদীপ, পেতলের ধুনচিতে ধূপ। বাবা গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে—আসনে বসে সর্বাগ্রে গ্রহণ করতেন ঐ পরমান্ন। শাঁখ বাজতো—আমরা তাঁকে প্রণাম করে তাঁর চারপাশে ঘিরে বসতাম।

তারপর বড় হয়ে কলকাতা এসেছি ১৯৪০ সালে—আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে—বাগবাজারে। প্রথম দিকের আর্থিক সঙ্গতির স্বল্পতা আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিলো। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়েছে বেশ খানিকটা। তাই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর কিছু বাইরের মানুষকে তাঁর জন্মদিনে দেখতে পাচ্ছি।

সর্বপ্রথমে যাঁদের কথা মনে পড়ে—তাঁরা হলেন শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ, শ্রীগৌরীশঙ্কর। এই দিনটিতে সুদূর ঢাকুরিয়া থেকে আমাদের বাড়িতে

প্রথমেই এসে হাজির হতেন—আমাদের কারো কারো ঘুম থেকে ওঠার আগেই। হাতে থাকতো মিষ্টির বাক্স আর মস্তবড় জুঁইফুলের মালা। তাঁরা প্রণাম করতেন, কোলাকুলি করতেন বাবার সঙ্গে। কিছু পরে আসতেন শিল্পী যামিনী রায়—বাবা মাথা নীচু করে নমস্কার করতেন তাঁকে। দুজনে পরস্পরকে আলিঙ্গন করতেন। এরই মধ্যে এসে হাজির হতেন শনিবারের চিঠির সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দ্বারেশ শর্মাচার্য। দ্বারেশকাকার হাতে থাকতো হলুদ কাগজে বারো পৃষ্ঠার একটি বারো মাসের বর্ষফল। ঐ বর্ষফলটি আমাদের বিশেষ কৌতূহলের বস্তু ছিল। গান্ধীবাদী অধ্যাপক নির্মল বসু অনেক ভোরে উঠতেন—সুতরাং বাবার সঙ্গে প্রীতিবিনিময় পর্বটা আমরা দেখতে পেতাম না। একটু পরে যুগান্তর থেকে নাইট ডিউটি সেরে আসতেন দক্ষিণারঞ্জনবাবু—তিনি ছিলেন আমাদের পড়শী। যাঁরা সেদিন আসতেন তাঁদের সকলকেই সামান্য মিষ্টিজল দিয়ে আপ্যায়িত করা হতো। এই মিষ্টির মধ্যে সেন মশায়ের 'রাতাবী' ছিল একটা কমপালসারী আইটেম। ফড়েপুকুরের সেন মশায়ের দোকান থেকে তার আগের দিন সন্ধ্যেতে মিষ্টিটা ওঁরা পাঠিয়ে দিতেন আনন্দ চ্যাটার্জী লেনে।

দুপুরে বাবা তাঁর শোবার ছোট ঘরটাতে আসনের ওপর বসে পরমান্ন গ্রহণ করতেন। আশীর্বাদ, কপালে চন্দনের ফোঁটা ইত্যাদি সব কিছুই করতেন—যাঁদের বাড়িতে ভাড়া থাকতাম, সেই বাড়ির গৃহিণী। বাবা তাঁকে ডাকতেন দিদি—আমরা বলতাম পিসীমা। কারণ ঠাকুমা দেশে থাকতেন। দেশ থেকে সব সময় তাঁর আসা হয়ে উঠতো না। বিশেষ করে সময়টা ছিল চাষবাসের শুরু হওয়ার মরশুম। খাদ্যের তালিকায় নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে—ইলিশ মাছের ঝাল, দই এবং দু-তিন রকমের কলকাতার মিষ্টি। সুতরাং দুপুরে আমাদের চার ভাই বোন, মা, ঐ পিসীমা, তাঁর মেয়ে পারুলদি বেশ পরিপাটি করে জন্মদিনের খাওয়াটা সেরে নিতাম। বিকেলের দিকে কেউ কেউ আসতেন তবে খুবই কম।

বাগবাজারে স্থানাভাবটা কোন রকম আড়ম্বর করার বিশেষ পরিপন্থী ছিল। তবু ওরই মধ্যে নির্মলকাকা বোসপাড়াতে উঠে গেলে তাঁর ঘরখানা সমেত নিয়ে মোটামুটি চলে যাচ্ছিলো। ১৯৪৭ সালে বাবা উনপঞ্চাশ সমাপ্ত করে পঞ্চাশ বছরে পা দিলেন। তাঁর পঞ্চাশতম জন্মদিন উপলক্ষে বেশ কিছু সাহিত্যিক শিল্পী বন্ধু সকলে মিলে তাঁকে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে সম্বর্ধনা জানান। জন্মদিনের দিন দুয়েক পরে ভূপেন বোস এভিনিউতে কেশব বসুর বাড়িতে ট্রেডার্স ব্যুরোর গোবিন্দ মন্দির প্রাঙ্গণে এই ঘরোয়া সম্বর্ধনা-সভা হয়। খুব বড় কিছু নয় তবে বড় প্রাণময় এবং মর্মগ্রাহী হয়েছিলো এই অনুষ্ঠানটি।

সেখানে হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন, সজনীকান্ত দাস, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, অমল

হোম, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গাঙ্গুলী, প্রমথনাথ বিশী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মনোজ বসু, শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, শ্রীগজেন্দ্র মিত্র প্রভৃতি সকলে তারাশঙ্করের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

হরেকৃষ্ণ সাহিত্যরত্ন আশীর্বাদ জানালেন

আজি অর্ধশতাব্দীর পথে, তোমারে দেখিয়া গেনু,
আশিস্ করিনু দান, শতাব্দী সার্থক কর বাণীসেবা ব্রতে।

নলিনীকান্ত সরকার মহাশয় হাসির গান গেয়েছিলেন—

গর্ব তোমার কোথায় বন্ধু খর্ব হতেছে তোমার নাম।
আপনার হাতে ধরি তরবার
শ্রী সম্পদ তব করেছ সাবাড়—ইত্যাদি

সেই সময় লেখার জগতে আর এক নতুন তারাশঙ্কর এসে পড়েন। তাই উনি শ্রী বর্জন করে নিজেকে চিহ্নিত করতে চেয়ে লিখেছিলেন "অতঃপর আমি 'শ্রী'হীন হইলাম।"

বাংলা দেশের সাহিত্যিক ও শিল্পীগণের পক্ষে সজনীকান্ত দাস একটি কবিতা পাঠ করেন। আশীর্বাদপত্র আসে কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি জ্যেষ্ঠগণের নিকট থেকে। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এঁরাও শুভেচ্ছাবাণী পাঠান। সভায় সেগুলি পাঠ করেন শ্রীবীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

লাভপুরের পাশের গ্রাম চিতুরা থেকে এসেছিলেন বাবার সহপাঠী বন্ধু কমলাকান্ত পাঠক মহাশয়। তাঁর স্বরচিত কবিতাটি এবং আবেগময় পঠনভঙ্গীতে সভাস্থল স্তব্ধ হয়ে পড়ে কিছুক্ষণের জন্য। কবিতাটি তুলে ধরার লোভ সামলানো সম্ভব হল না। কিছু অংশ দিলাম।

"গুরু গরবের ধন আমাদের—ওগো তারাশঙ্কর,
...আমি আসিয়াছি গোকুলের দূত শতধা-শীর্ণ বৃন্দারণ্য হতে—
আসিয়াছি আমি তব কৈশোর-লীলা-নিকেতন বনের বার্তা বয়ে ;
...আজি রাজ সমারোহে পুত্রগরবে স্ফীতবক্ষের বিগলিত ক্ষীরধারে
বিরহের মধু বেদনার কালি মাখিয়া যতনে জননী যশোদা তব
কাজর করিয়া পাঠায়ে দিয়েছে হেথা ;
বাসনার সাথে পূত স্নেহাশ্রু মিশায়ে দিয়েছে দই হলুদের কৌটা
বাৎসল্যের দুগ্ধবারিধি-মন্থনজাত নবনী দিয়েছে ধড়ার আঁচলে বাঁধি।
কহিয়া দিয়াছে মোরে—ওরে বলে দিস চুপি চুপি কানে কানে—

সভা কোলাহল থেমে যাবে যবে—নিভে যাবে দীপমালা—
বসিবে যখন একাকী আপন ঘরে—
এমনি যেন সে আহিরিণী-মার ফল্গু এ উপায়ন
নিভৃতে গ্রহণ করে।
আমি আসিয়াছি গ্রাম্য আভীর—যত রাখালের সখ্য করিয়া জমা—
বক্ষে এনেছি বয়ে
কানুর গরবে গরবিতদের মরমের প্রীতি শরমের পুটে লয়ে
আসিয়াছি দিতে আজি এ রাজোৎসবে।
দিতে সঙ্কোচ—নিতেও লজ্জা—এমনি এ উপায়ন,
তবু আনিয়াছি—কোনমতে মানা মানেনি আহিরী মন।"

এই কবিতা সকলের চোখকে অশ্রুসজল করে তুলেছিল। বাবার দু গাল বেয়ে নেমেছিল শীর্ণধারা।

এর বছর দুয়েক পর ১৯৪৯ সালে উঠে এসেছি টালার বাড়িতে। টালা অনেক খোলামেলা, ফাঁকা। বাড়িতেও জায়গা অনেকখানি। নীচের তলায় একখানি হলঘর মত করেছিলেন দাদা—এইরকম সব উৎসব পালন করার জন্য। শ্রাবণ মাসে জন্মদিনের আগেই আমরা নতুন বাড়িতে এলাম। এবার সঙ্গে আছেন ঠাকুমা ও বাবার পিসীমা—ধাত্রীদেবতার সেই মহিমময়ী মহিলা। এঁকে আমরা সকলে দাদু বলে ডাকতাম। আমাদের বাড়িতে তখন লোকসংখ্যা বেশ খানিকটা বেড়েছে। দাদা বৌদি, তাদের দুই পুত্র, আমি ও আমার স্ত্রী, খুড়তুতো ভাই, মামাতো ভাই ইত্যাদি। বাড়ি তখনও সম্পূর্ণ হয়নি তবুও হৈ হৈ করা হল সকলে মিলে। দেশ থেকে মাছ মিষ্টি এনেছিলেন ছোটকাকা। মোটকথা সেবারের জন্মদিন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের চাইতে বেশ বড় রকমের হয়েছিল। বাবাকে এবার আশীর্বাদ করেছিলেন তাঁর মা ও পিসীমা—সেবার জন্মদিনের পরমান্ন তুলে দিয়েছিলেন বাবার হাতে তাঁর মা নিজে।

পরের বছর থেকে আড়ম্বর আরও বেড়েছিল। বাবা এই আড়ম্বর সমর্থন করতেন না—তবে খুব যে অপছন্দ করতেন তাও মনে হয়নি। এতদিন নেমন্তন্ন হত মুখে মুখে—এবার চিঠি ছাপানো হল। বাবার প্রচণ্ড আপত্তি ছিল এই চিঠির ব্যাপারে। সুতরাং ঠাকুমাকে সামনে রেখে দাদাই সবকিছু ব্যবস্থা করলেন। জন্মদিনের নেমন্তন্ন চিঠিতে আহ্বায়ক হলেন আমাদের ঠাকুমা স্বয়ং প্রভাবতী দেবী। বাবার ভয় ছিল তাঁর সাহিত্যিক সমাজকে। এমন কোন ঘটনা যেন না ঘটে, যাতে ঐ সমাজ সমালোচনামুখর হবার কোন সুযোগ পান। সুতরাং নেমন্তন্ন চিঠির ব্যাপারে তিনি

মোটেই উৎসাহী ছিলেন না। কিন্তু যেহেতু ঠাকুমা মধ্যস্থতা করে তাঁর রায় দিয়েছেন —সুতরাং তা বাবাকে মেনে নিতেই হল। পরবর্তীকালে ঠাকুমাই তাঁর দীক্ষাগুরু হয়েছিলেন।

সকালে যাঁরা আসতেন, মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়িত করা হত তাঁদের।

বিকেলের দিকে ব্যবস্থা হল চায়ের সঙ্গে কিছু খাদ্যের। বলতে গেলে দুপুরটুকু ছাড়া লোক সমাগম হত সকাল থেকে রাত্রি নটা দশটা পর্যন্ত। আমাদের শেষ হতে প্রায় এগারোটা বেজে যেতো।

এ বাড়িতে আসার পর ঐ দিনটিতে বাবা-মা খুব ভোরে উঠে স্নান সেরে চলে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে। ফিরেই দেখা হত শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও সুমথনাথ ঘোষ মহাশয়দের সঙ্গে। মস্ত বড় একটা জুঁইফুলের মালা প্রায় পা পর্যন্ত লুটিয়ে পড়তো— পরিয়ে দিতেন বাবার গলায়। এ ঘটনাটা ঘটে যেতো, আমরা অর্থাৎ তাঁর শোণিতপুষ্ট বংশধারার মানুষরা প্রণাম করার আগেই।

একটু পরে আসতেন মালা হাতে সজনীকান্ত দাস ও তাঁর সহধর্মিণী শ্রীমতী সুধাদেবী। নির্মল বসু সাইকেলে করে হাজির হতেন বাগবাজার থেকে। পাশের থেকে আসতেন পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাটুজ্যেঠামশায়)।

দ্বারেশ শর্মাচার্য আসতেন আগামী বারো মাসের বর্ষফল নিয়ে। যতীন্দ্রমোহন দত্ত—যমদত্ত আসতেন—মায়ের হাতে তুলে দিতেন একখান সিন্দুর। মাকে বলতেন, আপনার সিঁথির সিন্দুরে রচিত হোক তারাশঙ্করের দীর্ঘ জীবন। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়—আমাদের পড়শী হয়েছেন—তিনিও আসতেন। তবে তাঁর আসার আগেই তিনি যেতেন শৈলজানন্দের বাড়ি, সেখানে তাঁর বোনের হাতে অর্থাৎ শৈলজানন্দের স্ত্রীর হাতের চা খেতে। আটটা-নটার মধ্যে হাজির হতেন শোভাবাজার রাজবাড়ির এক কন্যা শ্রীমতী অপর্ণা দেব—তারাশঙ্কর তাঁর ছেলে। এ সম্বন্ধ তিনি নিজেই পাতিয়েছিলেন বাবার সঙ্গে এবং সেইভাবে কথাবার্তাও বলতেন বাড়ির অন্য সকলের সঙ্গে। তাঁর হাতে থাকতো মালা ও মিষ্টি। বয়সে আমার চেয়ে ছোট এই দেবীকন্যাকে আমি আজও ঠাকুমা বলে ডাকি, প্রণাম করি, তিনিও সহজভাবে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করেন। এমনি সময়ে হাজির হতেন শ্রীবিনয় রায়। শ্রীবিনয় রায়ের সঙ্গে বাবার পরিচয় হয়েছিল বোধহয় কল্যাণী কংগ্রেসের সময়। তারপর কেমন করে তিনি বাবার বন্ধু ভাই এবং বড় ভরসার মানুষ হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে এই বিনয় রায়ের ভূমিকা অসীম। জ্ঞানপীঠ পুরস্কার আনতে দিল্লী যাবেন—সঙ্গে আছেন বিনয় রায়। আজও মাঝে মাঝে খোঁজ নেন আমাদের। দশটার মধ্যে হাজির হতেন মধুসূদন মজুমদার—বাবার খেয়ালখুশি মেটাবার মানুষ। আমরা ওঁকে বলতাম

'সম্রাট'। এবার এসে পৌঁছুলেন শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। তিনি কিছুকাল আমাদের পড়শী ছিলেন—শৈলজানন্দের বাড়িতে থাকতেন তখন।

গুণমুগ্ধ পাড়াপ্রতিবেশী অনেকেই এই সময়ে এসে পড়তেন। এমন সময় সহাস্য-মুখে মালা হাতে হাজির হতেন কুমার বিমলচন্দ্র সিংহ। বিকেলের পর থেকে সমা-রোহটা হত আরও বেশী, এবং বহু শ্রদ্ধেয় জন গুণী মানুষের দেখা পেতাম এই সময়ে। এই আসরেই দেখেছি নরেন্দ্র দেব ও তাঁর পত্নী শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে—বাবার দাদা ও বৌদি। দেখেছি শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীকে, বাবার বোন—আমাদের পিসীমা। আরও যাঁদের দেখেছি তাঁরা হলেন সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সঙ্গে থাকতেন আমাদের বৌদি শ্রীমতী শোভনা মিত্র। আসতেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধ সান্যাল, মনোজ বসু, ডঃ রমা চৌধুরী, শ্রীনারায়ণ সান্যাল, আনন্দবাজার থেকে আসতেন মন্মথ সান্যাল। একবার শ্রীবিমল মিত্র মহাশয়ও এসেছিলেন। এই আসরেই একবার পঙ্কজ মল্লিক মহাশয়ের গান শোনারও সৌভাগ্য হয়েছে। আসতেন শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য এবং তাঁর পত্নী—আমাদের জগদীশ কাকা ও কাকীমা। জগদীশ কাকা বাবাকে প্রণাম করে স্মিতহাস্যে বাবার পাশে বসতেন। বাবা ছিলেন ওঁর কাছে 'শঙ্করদা'। তারাশঙ্কর সাহিত্য বিশেষ করে গল্প-রচনা সম্ভার—এবং তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত জীবনের বহুতর ঘটনার রসের ভাণ্ডারী উনি। তারাশঙ্কর সাহিত্য সম্পর্কে ওঁর অথরিটি অনস্বীকার্য। আজও যখন কোন তরুণ তাঁর জ্ঞানপিপাসা মেটাতে এ বাড়িতে এসে তারাশঙ্কর সাহিত্য সম্পর্কে কিছু জানতে চান তখন তাঁদের বলি তারাশঙ্কর সাহিত্য সম্পর্কে কিছু জানতে হলে জগদীশ ভট্টাচার্যের সাহায্য অপরিহার্য। ওঁর বাড়ির ঠিকানা হাতে তুলে দি। সব শেষ করে বারোটার আগে ঘুমোবার ছুটি মিলতো না। মনটা বহু মার্জিত সম্মানী গুণীদের দর্শন পেয়ে আনন্দে ভরপুর হয়ে থাকতো। ফুলে ফুলে ঘরটা সুগন্ধে ভরে থাকতো।

পরবর্তী কালে নেমন্তন্ন চিঠিতে ঠাকুমার নামের বদলে আমাদের চার ভাই-বোনের নাম থাকতো আহ্বায়ক হিসাবে। এমনি করে ১৩৭৪ সালে (১৯৬৭) তাঁর সপ্ততিতম জন্মদিনের সময় এসে গেলো। এই সত্তরতম জন্মদিবস উপলক্ষে আমাদের বাড়িতে যেমনটি হয়—তেমনি হয়েছিলো। কিন্তু ২৫শে জুলাই ও ২৬শে জুলাই—এই দুদিন ধরে বিশেষ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছিলো মহাজাতি সদনে। সেই সময়কার কাগজগুলির রিপোর্ট-থেকে কিছু তথ্য তুলে ধরছি। ১৯৬৬ সালের জ্ঞানপীঠ পুরস্কার প্রাপক হিসাবে তখন তারাশঙ্করের নাম সিদ্ধান্ত ও ঘোষিত হয়েছে।

"কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠান আড়ম্বর এবং রুচিপূর্ণ পরিবেশে গত ২৫শে ও ২৬শে জুলাই মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয়।

এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন শ্রীফণীভূষণ চক্রবর্তী। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি ছিলেন উপাচার্য হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। দ্বিতীয়দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন।"

এই উপলক্ষে একটি স্মারক গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিলো। এতে বহু জ্ঞানী গুণী, সাহিত্যিক কবি এবং বুদ্ধিজীবীর রচনা প্রকাশিত হয়েছিলো। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ থেকে শুরু করে ভারতবর্ষের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির বাণী ও অভিনন্দনলিপি তাতে সংযোজিত হয়।

উত্তরে তারাশঙ্কর বলেছিলেন—"আজ স্মরণ করি বাংলা ভাষার আদি কবি জয়দেব থেকে চণ্ডীদাসকে, মুকুন্দদাস থেকে ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদকে, স্মরণ করি রাজা রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্রকে। তাঁদের সঙ্গে সাহিত্যবিশারদ আবদুল করিম সাহেব থেকে কাজী নজরুল ইসলাম পর্যন্ত ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির যাঁরা বঙ্গসাহিত্যের সেবা করেছেন, তাঁদের স্মরণ করি। বর্তমান পূর্বপাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে সমগ্র বঙ্গ—তার সমগ্র সাহিত্যের সকল সেবককে প্রণতি জানাই। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রণাম নিবেদন করি মহাকবি রবীন্দ্রনাথকে, যিনি নিজের সাহিত্য-সাধনাকে ভারত সাধনায় রূপান্তরিত করে আমাদের ভাষা-সরস্বতীকে বিশ্বভারতীয় সভায় বিশেষ মর্যাদার আসনে ব্রতী করে গিয়েছেন।" আরও যা বলেছিলেন, তা ৮ই শ্রাবণে লিপিবদ্ধ করা আছে।

অধিবেশনের শেষে তারাশঙ্করের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'কবি' অভিনয় করেন মহিলা শিল্পীমহল।

দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

পরবর্তীকালে ১৯৬৮ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে আমরা আরও চারটি জন্মদিন পালনের সুযোগ পেয়েছিলাম। যথারীতি বহু সজ্জন মানুষের পদধূলিতে রঞ্জিত হয়েছিল ২৭নং টালা পার্কের বাড়ি। তিনি নিজে বসে থেকে সকলের সঙ্গে প্রীতি বিনিময় করেছেন। তাঁর ৭১তম জন্মদিনের প্রাক্কালে মধুসূদন মজুমদার ১৩৭৪ শ্রাবণের নবকল্লোলে লিখেছেন—"আগামী ৮ই শ্রাবণ আমাদের প্রিয় সাহিত্যিক তারাশঙ্করবাবুর ৭১তম জন্মদিন। দেশবাসীর সঙ্গে আমরাও তাঁর দীর্ঘ জীবন ও অটুট স্বাস্থ্যকামনা করি। প্রতিবছর তাঁকে দেখেছি জন্মদিনের আগে তাঁর বৃদ্ধা মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আসেন। এইবার জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাবার পর তিনি আমায় বলে-

ছিলেন—'মধুসূদন একবার লাভপুর যাব।' আমি বলি—'আপনার কাছে এখন এত লোক আসছে, আপনার কি কলকাতার বাইরে যাওয়া ঠিক হবে?' তারাশঙ্করবাবু বলেন—'দেখ! সেখানে গেলে আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরবেন। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলবেন, 'কি সুসন্তান পেটে ধরেছি, আমার মুখ উজ্জ্বল হল।' সেটা জ্ঞানপীঠ পুরস্কারের চেয়েও আমার কাছে অনেক বড় সম্মান।'"

পরের বছর অর্থাৎ তাঁর ৭২তম জন্মদিনে তাঁর গ্রামবাসীরা এক বিশেষ সভার আয়োজন করেন তাঁর লাভপুর গ্রামে।

আবার কাগজের রিপোর্ট উদ্ধৃত করছি, যুগান্তর পত্রিকা থেকে। "তাঁর বাহাত্তর-তম জন্মদিনে তাঁর নিজের জন্মভূমিতে জন্মোৎসব পালিত হয় বেশ ঘটা করে। স্থানীয় অতুলশিব ক্লাব মঞ্চে এই উৎসব পালিত হয়। শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন, প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু।

প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন ও সম্বর্ধনার উত্তরে আবেগজড়িত কণ্ঠে তারাশঙ্কর বলেন, "আমি এই মৃত্তিকার সন্তান, আপনাদের ভাই বন্ধু ও আত্মীয়, আপনাদের এই প্রীতি ও সম্বর্ধনা একদিকে যেমন আমার অন্তর পরিপূর্ণ ও প্লাবিত করে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে সন্তান যেমন মায়ের কাছে বারবার স্নেহ ও সমাদরে অভিষিক্ত হয়েও পুনর্বার সমাদরের প্রত্যাশা করে, সেইরূপ বারবার আপনাদের সমাদরে অভিষিক্ত হয়ে আমার অন্তর পুনর্বার আপনাদের সমাদরের জন্য লালায়িত হয়ে থাকবে। আমার সাহিত্যের যদি কোন মূল্য বাংলাদেশ বা বাইরে সমাদৃত হয়ে থাকে এবং যেটুকু শ্রদ্ধাই সে অর্জন করে থাক, তার সবটুকুই আমার মাতৃভূমি লাভপুরের দান। এই লাভপুর ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যেই আমি বিশ্বমানবকে দর্শন করেছি, এখানকার সামাজিক সমস্যা থেকে বিশ্বের সামাজিক সমস্যাকে চিনতে শিখেছি, এখানকার অভিজ্ঞতাই আমার কাছে পৃথিবীর অভিজ্ঞতা বহন করে এনেছে। এই ভৌগোলিক বিন্দুটি আমাকে সিন্ধুদর্শন করিয়েছে।"

এরপর আসে তাঁর তিয়াত্তরতম জন্মদিন—কিছু পরিবর্তন ঘটেছে এই জন্মদিনে—উনি মাতৃহীন হয়েছেন। ১৯৬৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার পিতামহী পরলোকপ্রাপ্ত হন। তাই দেখতে পাই, তারাশঙ্কর তাঁর ৭৩তম জন্মদিনে—তাঁর মায়ের আশীর্বাদ না পাওয়ার জন্য আক্ষেপ করছেন। সেদিন জন্মদিনে তাঁর বাড়িতে এসেছিলেন জ্যোতির্ময়ী দেবী। ইনি রাজস্থানের পটভূমিকায় বহুতর রচনা সৃষ্টি করে বঙ্গসাহিত্যে মর্যাদার আসন করে রেখেছেন। তাঁর কাছ থেকে দুদিন পর একটি চিঠি আসে—লিখেছেন, আপনার কথাগুলি খুব মনে লেগেছিল, "এবারের জন্মদিনে আমার মা নেই।" আজ একটি লেখা আমার মনে এলো।

মহাভারতে যক্ষ-যুধিষ্ঠির সংবাদে একটি প্রশ্নোত্তরে পেয়েছিলাম।

প্রশ্ন—কতদিন মানুষ বর্ষীয়ান হয় না?

যুধিষ্ঠিরের উত্তর—পলিত কেশ বৃদ্ধও যদি মাতাকে সম্বোধন করে গৃহে প্রবেশ করেন—তিনি বালক। আপনি এতদিন বালক ছিলেন।

এরপর আসে ১৯৭১ সালে তাঁর ৭৪তম ও শেষ বেঁচে থাকা, ৮ই শ্রাবণ। আজ তিনি আমাদের সামনে ছবি হয়ে রয়েছেন তাঁর কীর্তির মধ্যে।

এখনও আমরা তাঁর শূন্যঘরে জন্মদিন পালন করি।

অতিথির সংখ্যা বলাবাহুল্যই অতিক্ষীণ। ফুলমালা ধূপ দিয়ে সাজিয়ে বসে থাকি আমরা। আসেন দুচারজন—শ্রীবিনয় রায় আসেন, সজনীকান্ত পুত্র রঞ্জন দাস, তার সঙ্গে থাকেন সনৎ গুপ্ত এই রকম দুচারজন। আরও একজন ফুলের মালা হাতে সকাল নটার মধ্যেই হাজির হন আগের মতই—তারাশঙ্করকে যিনি ছেলে বলে দেখতেন—সেই শোভাবাজার রাজবাড়ির দেবীকন্যা শ্রীঅপর্ণা দেব—আমার ঠাকুমা।

॥ ১১ ॥

তৃতীয় প্রজন্ম

টালা পার্কের একটি বাড়িতে পঞ্চাশোর্ধ্ব এক ভদ্রলোক খালি গায়ে, গলায় পৈতাটা মালার মত করে পরা, ব্যাঘ্রচর্মের উপর বসে ছোট কাঠের ডেস্কে গভীর মনঃসংযোগে কিছু লিখে চলেছেন। চোখে মেটাল ফ্রেমের চশমা। বেলা প্রায় বারোটা।

এমন সময় ছ-সাত বছরের একটি ফুটফুটে ছেলে এসে চিন্তিত ম্লান মুখে ভদ্রলোকের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। লেখা থেকে মুখ তুলে ভদ্রলোক জিজ্ঞাসু চোখে ছেলেটির মুখের দিকে তাকাতেই ছেলেটি অত্যন্ত কুণ্ঠিত হয়ে বললে—'দাদু, তুমি কি আমাকে আড়াইটে টাকা দিতে পারবে?'

ভদ্রলোক সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কেন ভাই? কি হবে এত টাকা দিয়ে?'

ছেলেটি আরও কুণ্ঠিত হয়ে বললে—'আমার স্কুলের মাইনে দেওয়া হয়নি। সামনেই পরীক্ষা। মাইনে না দিলে পরীক্ষা দিতে দেবে না বলেছে।'

ভদ্রলোক এবার উত্তর দিলেন—'খুব মুশকিল হ'ল তো তাহলে! তা সেটা কি আজই দিতে হবে?'

ছেলেটির উত্তর—'হ্যাঁ, কাল সকালেই তো স্কুল।'

ভদ্রলোক এবার হেসে বললেন—'তাই তো ভাই! খুব ভাবনার কথা। তা

দেখা যাক কি করতে পারি? কোথাও পাওয়া যায় কিনা খোঁজ করে দেখি।'

ভদ্রলোকের লেখার কাজ হয়ে গিয়েছিলো, তিনি উঠে পড়লেন স্নান-খাওয়ার জন্য। খাওয়ার পর বিশ্রাম। তারপর বেলা চারটে সাড়ে চারটের সময় গাড়ি করে বেড়াতে যান এবং ফেরেন সন্ধ্যা আটটা নাগাদ। অবশ্য যদি কোথাও কোন সভা-সমিতি থাকে তবে ফিরতে আরও খানিকটা দেরি হয়ে যায়।

সেদিন তখন প্রায় রাত্রি ন'টা। সেই ছেলেটি বসবার ঘরে চৌকিতে বসে বসে ঢুলছে। তার মা তাকে শুতে যেতে বলেছেন বার বার। তার পিতামহীও তাকে জিজ্ঞেস করলেন—'ভাই, বসে বসে ঢুলছো কেন? শুয়ে পড় গিয়ে। কাল তো আবার ভোরে উঠতে হবে!'

ছেলেটি কোন কথার জবাব না দিয়ে চৌকিতে বসে যেমন ঢুলছিলো তেমনি বসে রইলো। এমন সময় গাড়ি ফিরে আসার হর্ন বেজে উঠলো। মুহূর্তে ছেলেটির ঘুম ভেঙে গেলো। হালকা পায়ে উঠে এসে দাঁড়ালো পিতামহের কাছে। ভদ্রলোক তাকে দেখে হেসে ফেলে বললেন—'কি ভাই, এখনও জেগে আছো?' তারপর মুখ করুণ করে আবার বললেন—'সকলকে গিয়ে বললাম তোমার কথা। আড়াইটে টাকার জন্যে আমার নাতির পড়া হবে না, স্কুল থেকে নাম কেটে দেবে। এসব শুনে লোকেরা টাকাটা আমাকে দিলে। যোগাড় করে এনেছি তোমার টাকা—এই নাও আড়াই টাকা।' টাকাটা হাতে পেয়ে ছেলেটি এবার নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোতে গেলো। ঘটনার কাল ১৯৫০-৫১। সেদিনের সেই ছেলেটির নাম শ্রীমান হিমাদ্রিশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়—বর্তমানে রবীন্দ্রভারতীর ইতিহাস বিভাগের রিডার—ডঃ বন্দ্যো-পাধ্যায় আর তার পিতামহের নাম হল তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, হিমাদ্রি তাঁর জ্যেষ্ঠ-পুত্র সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম সন্তান।

তারাশঙ্করের দুই পুত্র দুই কন্যা। এরা চারজনে তারাশঙ্করকে পনেরোটি নাতি-নাতনীর পিতামহ-মাতামহের সম্মানে অলঙ্কৃত করে তাঁর চারপাশে ঘিরে থাকতো। নাতনীদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা হলেন আমার বোনের মেয়ে শকুন্তলা। ইংরেজীর অধ্যাপিকা। ইংরেজীতে ডক্টরেটও করেছেন। তাঁর জন্মকে উপলক্ষ করে তারাশঙ্কর লিখে-ছিলেন—'তুমি যখন হবে পঞ্চদশী তখন আমি ষাট বছরের বুড়ো। তুমি খাবে কড়-মড়িয়ে মেঠাই, আমি খাব চেটে চেটে ভুরো।' দাদার অর্থাৎ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছয়টি পুত্র—হিমাদ্রি—ডাকনাম বাবু, রতন, রণ্টু, ঝণ্টু, বাচ্চু, মুকুল। আমার দুই পুত্র, দুই কন্যা—মঞ্জু, রঞ্জন, গোরা ও পুষি অর্থাৎ অপর্ণা। বোন গঙ্গা ও শান্তিশঙ্করের তিন কন্যা এক পুত্র—শকুন্তলা, মণিকুন্তলা, কাঞ্চনকুন্তলা ও বাবলু বা দেবব্রত। আর কনিষ্ঠা ভগ্নী বাণী ও ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের একমাত্র কন্যা লালী। তারাশঙ্কর

তাঁর এই তৃতীয় প্রজন্মের বাহিনীর উদ্দেশে একটি কবিতা লিখেছিলেন। কবিতাটি রচনার কালে আমার কনিষ্ঠা কন্যা পুষি বা অপর্ণার জন্ম হয়নি বলে কবিতাটিতে তার কথা উল্লেখ নেই।

শকুন্তলে বাবলু বারু—
রতন রণ্টু মণি রুণি
মঞ্জু রঞ্জু ঝণ্টু বেচো—
মুকলী গোরা—ইনি উনি—
সকল জনই গরু জন—
হেথায় হাতে নিয়ে পাঁচন—
চরাচ্ছি ভাই কৈলে লালী—
ধমক কষে দিচ্ছি খালি
এবং ভাবছি, গরুরা সব
করছে কতই কলরব
এবং শিঙ উঁচিয়ে নিয়ে
একে ওকে গুঁতিয়ে দিয়ে—
হাঁকছে হোথা হাম্বা রবে—
রাখাল দাদু আসবে কবে?
রাখাল বলছে নেইকো দেরী—
গরুরা সব বাগিয়ে টেরি
কিংবা ছাঁদে পাকিয়ে বেণী
থাকে পথে চক্ষু মেলে—
শিগ্‌গির আমি গেলাম বলে—।

ইতি

দাদু রাখাল

এ ছাড়াও পাতানো নাতি-নাতনীদের সংখ্যা বেশ কয়েকজন—অবশ্য নাতনীদের সংখ্যাই বেশী। পাতানো নাতি-নাতনীদের আসল নাতি-নাতনীরা খুব সহজভাবে গ্রহণ করলেও দাদুর স্নেহের ভাগ অন্যত্র চলে যাওয়া তাঁদের বিশেষ পছন্দ ছিল না। সেই কারণে তাদের উদ্দেশে লেখা কোন কবিতা খাতায় 'কপি' করতে গিয়ে তারা ঠোঁট বেঁকাতো, দুই বোনে মুখ চাওয়াচাওয়ি হ'ত।

পাতানো নাতনীদেরও কেউ কেউ আসল নাতনীদের ঠিক ওই চোখেই দেখতো—সুগারকোটেড কুইনাইনের মত—বিশেষ করে যে নাতনীটি তারাশঙ্করের

বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতো।

এমনি এক নাতনী সন্তোষপুরের সুস্মিতা তারাশঙ্করকে রীতিমত কড়া কড়া চিঠি লিখতো। সে লিখছে—

'শ্রীচরণেষু

দাদু, প্রথমেই আমার ৺বিজয়া দশমীর প্রণাম নেবে। তোমার প্রাণটা এবার নিশ্চয়ই দুরু দুরু করছে—সতীনদের একটা প্রণামও কোরলাম না। কিন্তু কি করি বল, সতীনগুলোর সবগুলোকে আমি চিনি না। তাই বলে তুমি এবার যেন সব সতীনের তালিকা আমার চোখের সামনে উপস্থিত করো না। জানই তো যে ওদের উপর খু-ব সদয় নই। অন্তরে যা নেই—বাইরে তাকে মিথ্যার আবরণ দিই কেন?...'

সুস্মিতা এই ধরনের কাঁচামিঠে চিঠি লেখবার অধিকার পেয়েছিলো তার পাতানো দাদু তারাশঙ্করের কাছ থেকে। সুস্মিতার উদ্দেশে লেখা তারাশঙ্করের একটি কবিতা এখানে দিলাম—

ওষ্ঠাধরে স্মিত-হাস্য হে দেবী সুস্মিতা
অদেখা অচেনা তবু বহু পরিচিতা
তুমি। পরম কৌতুকে 'দাদু, টু-কি' ডেকে
লুকায়ে আড়াল দাও, হাসো থেকে থেকে
প্রশ্ন কর, 'কে বল তো?' আমি কিন্তু চিনি
নাতনী সুস্মিতা তুমি—দাদু-সোহাগিনী।

এরপর সুস্মিতা আমাদের টালার বাড়িতে এসেছে। বাবার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে, অন্য নাতি-নাতনীদের সঙ্গে তার আলাপও হয়েছে। আরও কয়েকটি চিঠি ছড়া সুস্মিতাকে লিখেছেন পিতৃদেব। সুস্মিতা ছাড়া আরও কয়েকজন এই রকম নাতনী ছিল তাঁর—যেমন অলকানন্দা, মণিদীপা, চিরশ্রী, ভারতী প্রভৃতি। এদের প্রত্যেককে নিয়ে কিছু-না-কিছু ছড়ার লাইন পাওয়া যায় পিতৃদেবের একটি খাতায়—সযত্নে তা আমার কাছে রক্ষিত আছে। অলকানন্দাকে লিখেছিলেন—

অলকানন্দা তুমি আকাশ থেকে ঝরো
ঝরো ঝরো ঝরো—
জটাজুট বাগিয়ে বেঁধে দাঁড়ানো শঙ্কর
ও তার মাথায় ঝরে পড়ো।
আমি তোমায় রাখি মাথায়
তোমার হৃদয় পুণ্য হোথায়
হায় অবুঝের মত তুমি মিছেই দুঃখ করো—

ঢাকা থেকে একটি ছেলে এসেছিল—মহবুব তার নাম—সেও তারাশঙ্করের নাতি হয়েছিলো। পিতৃদেব তাকে যে কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন তা এখানে দিলাম—

তোমার ভুবনে আমার ভুবনে
এক দিগন্তের আলো
এক আকাশের সাত ভাই তারা
একই রাত্রির কালো
একই অন্নের একই আস্বাদ
এক রক্তের ঢেউ
এপাড়ে ওপাড়ে আছাড়িয়া পড়ে
আলাদা নই'ক কেউ।

বারু অর্থাৎ সেই ছেলেটি তারাশঙ্করের প্রথম পৌত্র। সুতরাং তার সমাদর ছিল একটু বেশী। আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের ভাড়াবাড়িতে বাসকালীন বারুর জন্ম। শিলিগুড়ি ওর মামার বাড়ি। শুধু ওর নয়, আমার পুত্রকন্যাদেরও। শিলিগুড়ির একই বাড়িতে দুই ভগ্নীর সঙ্গে আমাদের দুই ভাই-এর বিবাহ হয়। শিলিগুড়ির ঐ পরিবারটির শিক্ষায়, সৌজন্যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠায় বাবা বিশেষভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজেই হয়েছিলেন আমার এই বিয়ের উদ্যোক্তা। ঐ দুই ভগ্নীর পরের ভাই, আমাদের মধুর সম্পর্কের মানুষটি বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের একজন মহামান্য বিচারক। সে কারণে বারু হয়েছিলো আমার ভাইপো আর আমার স্ত্রীর বোনপো। বারুকে ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে আমাদের ভাল লাগতো না। বাবা বেশী করে অস্থির হয়ে উঠতেন। একদিনের ঘটনা মনে পড়ছে। দাদা-বৌদি বারুকে সঙ্গে নিয়ে এক শ্বশুর আত্মীয়ের বাড়ি নেমন্তন্নে গেলেন সকালের দিকে বালিগঞ্জে। রাত্রের দিকে ফেরার কথা। সেখানে খাওয়াদাওয়ার পর সিঁড়ি ধরে খেলতে খেলতে বারুর থুতনীটা বেশ কেটে যায় এবং রক্ত পড়তে থাকে। রক্ত দেখে বারু চিৎকার করে কাঁদতে থাকে আর বলে—'তোমরা শীগগির তারাশঙ্করবাবুকে খবর দাও। গাড় করে আমাকে নিয়ে যাবে।'

বারু মামার বাড়ি শিলিগুড়ি গেলে তারাশঙ্কর এক চিঠিতে লিখেছেন—'বারু ভাইএর জন্য বাড়ি আমার খাঁ খাঁ করছে, সমস্ত বাড়িটা যেন ঝিমিয়ে গেছে চুপচাপ সব। ঘর ময়লা হয় না, কেউ হাসছে না—কেউ নাচছে না, কেউ কাঁদছে না…'

টালার বাড়িতে আসার পর বাবাকে একটা ভাল জাতের ময়নাপাখি দিয়েছিলেন

আমার ছোট বোন বাণীর এক বান্ধবী। সেটার কাজ ছিল—বাবার গলা নকল করে বারুকে ডাকা। সেটা ডাকতো—বারু বারু—অ বারু! পড়! পড়! বারু পড়!

এক সময়ে বারুর দল সকলে এবং আমার স্ত্রী বাণী (আমার ছোট বোনের নামও বাণী) সকলে মিলে গেলেন শিলিগুড়ি। এই সময় বাবা একটা সুন্দর চিঠি লেখেন তাঁর নাতিদের অর্থাৎ আমার ভাইপোদের উদ্দেশে। আমি তখনও পুত্রকন্যার জনক হইনি। চিঠিখানি তুলে দিলাম।

'ভাই বারু, রতন, খোকন,

আজ দোলের দিন। খুকুদিদি, বাবলুভাই, মনিবেন ফাগ দিলে। তোমাদের জন্য খুব মন কেমন করল।

তোমরা থাকলে খুব ভাল হ'ত। আরও ফাগ খেলতাম। গান করতাম। নাচতাম। তোমরা ওখানে দাদু দিদির পায়ে ফাগ দিয়েছ কিনা লিখো।...

...ময়না পাখীটা কেবলই ডাকছে।—বারু বারু—অ বারু! খোকন! খোকন!

তোমার বাণী মায়ের খোকা হলে আমাকে জানাবে। চিঠি লিখছ না কেন?

রোজ যখন দেবদূত মেঘদূত ওড়ে, তখন আকাশের দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি। ভাবি বারুদাদা আসছে; আমার মুখে দেবদূতের জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে টপ্ করে একটা রাজভোগ কি কমলালেবু ফেলে দেবে।

কবে আসছ, গাল দুটোতে টমেটো ধরেছে কিনা জানাবে। কালো রতনের রঙ কতটা ফরসা হল?

খোকন—রনটা কি করছে?

তোমার দাদু

টালা তারাশঙ্কর

এরপর আমিও পুত্রকন্যার জনক হয়েছি। সময়টা ১৯৫১ সাল। আমি তখন মানভূমের, বর্তমানে ধানবাদ জেলার মগমা'র ফায়ার ব্রিক্স্ কারখানাতে কর্মরত। জায়গাটা পশ্চিম বাংলার শেষ স্টেশন বরাকরের দুটো স্টেশন পরে। একসময় এখানে বসেই উনি লিখেছিলেন ওঁর প্রথম দিকের উপন্যাস 'আগুন'। আমার প্রথম সন্তান কন্যা মঞ্জুকে উদ্দেশ করে উনি লিখেছিলেন—

ও ভাই মঞ্জুলতা—এতদিন ছিলে কোথা—?
ভালুকসোঁদার সেই ডাঙ্গাতে—চিনকুঠির কারখানাতে,
মাথায় করে বইতে মাটি—মঞ্জু আমার বেটার বিটি।

মগমা'র ঐ জায়গাটার নাম ছিল ভালুকসোঁদার ডাঙ্গা। আমার দ্বিতীয় সন্তান

রঞ্জনের অন্নপ্রাশনের দিন ঠিক হলে উনি লিখেছিলেন—'তোমরা কেমন আছ? শ্রীমান রঞ্জু এবং মঞ্জু মহারাণী? রঞ্জুর ভাতের সময় ছুটি পাওনা থাকলে সেটা নিয়ে এস। বা কিছুদিনের জন্য ওদের রেখে যেয়ো। তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় চাই। তাদের বলে যেতে চাই আমি তাদের ভালবাসি।'

মঞ্জু কিশোরী হলে বাবাকে চিঠি লিখতো। মঞ্জুর হাতের লেখা ছিল বেশ সুন্দর। বাবা খুশী হয়ে মঞ্জুকে লিখেছিলেন—

'শোন ভাই মঞ্জুলতা

কানে কানে শোনাই কথা গোপন রেখো।
রঞ্জু, গোরা শুনতে না পায় এইটে দেখো।
যেমন তুমি সুন্দরী ভাই হাতের লেখা হয়েছে তাই,
ভারী ভাল লাগল চোখে সেইটে জানাই।
পাস কর ভাই তাড়াতাড়ি, হবে আমার সেক্রেটারী,
কিনে দেব রঙীন শাড়ী, পেঁচিয়ে পোরে,
করবে কপি দাদুর লেখা যত্ন করে।'

মঞ্জুকে ওঁর খুব পছন্দ ছিল। ওঁর রচনায় মঞ্জু তার নামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে—আরোগ্য-নিকেতনে একটি মিষ্টি বধূকন্যারূপে। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বিকেলের দিকে ওঁকে দেখেছি নাতি-নাতনীদের গল্প শোনাতে। গল্প বলতেন বেশ নাটকীয় ভঙ্গিতে। গল্প বলতেন মা কাজলহারার কথা, সত্যপ্রিয়ের কাহিনী, সন্ন্যাসীর গল্প, বিধাতা ও মানুষের কথা—কত কি। পরে ওগুলি প্রকাশিতও হয় কিশোরদের জন্য—

এর মানে এই নয় যে, উনি কখনও নাতি-নাতনীদের তিরস্কার করেননি। রতন ছেলেবেলায় খুব দুরন্ত ছিল—তাই মাঝে-মধ্যে প্রহৃত হয়েছে ওঁর কাছে। বাচ্চুও একই কারণে তিরস্কৃত হয়েছে—তবে তার পরিমাণ অল্প। ওঁর কাছে নাতি-নাতনীদের সমাদরের মাত্রাই ছিল বেশী।

পরিশেষে আর একটি ঘটনার কথা না বললে বোধহয় সবটুকু বলা হবে না। এও তারাশঙ্করের তৃতীয় প্রজন্মের কথা। টালাতে আসার পর আমাদের বাড়িতে বাসন পরিষ্কার করতো দাসী বলে স্থানীয় একজন বয়স্কা মহিলা। মাঝে মাঝে তাকে সাহায্য করতে আসতো দাসীর পুত্রবধূ। এই দাসীর নাতিপুতি ছিল বেশ কয়েকজন। তারাও আসতো। এই বালখিল্যের দল বসে থাকতো পাশের বারান্দায় বা পাশের খোলা জায়গাতে খেলাধুলো ছুটোপাটি করতো। আমাদের রান্নের উদ্বৃত্ত

খাদ্যের মালিক হয়েছিল তারা। দাসীপুত্র ছিল রুগ্ন—কোন কাজকর্ম করতে দেখিনি তাকে। অথচ তার হাতে বাঁশের বেড়ার কাজ ছিল খুব সুন্দর। বাবাও চাইতেন ওই ধরনের কাজের মাধ্যমে ও কিছু রোজগার করুক। সেইজন্যে মাঝে মাঝে ডেকে ওকে কাজকর্মও দিতেন। কিন্তু বাঁশের কাজ করতে তার মোটেই উৎসাহ ছিল না। সে ছড়া, কবিতা লিখতো। সম্ভবতঃ পিতৃদেবের লিখে মানসম্মান দেখে সেও কবিতা ছড়া এসব লিখতে শুরু করে দেয়। সেগুলি আবার বাবাকে শুনতে হত। এবং তার দাবি ছিল ঐগুলি প্রকাশ করে তার উপার্জনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এর পরিণাম তার ছেলেদের উপবাস। সুতরাং বাবাকে বাধ্য হয়ে দাসীর নাতিদের জন্য কিছু খাদ্য, দুধ এবং জামাকাপড়েরও ব্যবস্থা করতে হয়।

পরবর্তীকালে ১৯৭০-৭১ সালে গোটা দেশের যখন সর্বত্র অরাজক অবস্থা—তখন এই তৃতীয় প্রজন্মকে আবার দেখতে পাওয়া গেল। দাসীর নাতিদের দু-একজন তখন যুবক হয়ে উঠেছে এবং দেশের এই অরাজক অবস্থার সুযোগে তারা প্রায় পাড়ার মাতব্বর হয়ে উঠেছে। তারা সাইকেলে চড়ে আমাদের বাড়ির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলো—বাড়ির সামনে এসেই ঘণ্টি বাজায়। বাবা প্রথমটা ঠিক বুঝতে পারেননি। কিন্তু ওদের চলাফেরার রকমসকম দেখে বাবা স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণাতেই আসেনি—দাসীর ঐ নাতিরা তাঁর সম্পর্কে কোন অবজ্ঞা পোষণ করতে পারে। বিশেষ বাড়াবাড়ি করতে সাহস করতো না; বাবার পাশে রিভলবার পকেটে বসে থাকা সূর্য-মুর্মুকে দেখে ওরা ওপাশ দিয়ে কেটে পড়তো।

বাবা সমস্ত দেখেশুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলেন।

আমরাও ভেবে কারন খুঁজে পাচ্ছিলাম না। যাদের কাছে থেকে উনি কৃতজ্ঞতা দাবি করতে পারেন—তারা এমন বদলে গেল কেমন করে?

সূর্য-মুর্মু বলেছিলো—ওদের সঙ্গে নাকি নকশালদের যোগ আছে। হয়ত হবে। সাময়িক উত্তেজনায় জীবনের মূল্যবোধ চাপা পড়ে গেছে—কিম্বা হয়ত বাহাদুরির স্বপ্ন।

আমরা ভাবতে চেষ্টা করেছি—ওদের শিশুকালে ওরা যা পেতে চেয়েছিলো, যতখানি এবং যে সমাদরে পেতে চেয়েছিলো, তাতে নিশ্চয়ই কোন ফাঁক ছিল—যা ওদের মনকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল।

আবার তাই যদি হবে, তবে তারাশঙ্করের মৃত্যুতে ওদের চোখে জল দেখেছিলাম কেন?

১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর যখন বাবার মরদেহটা নিয়ে শ্মশানযাত্রার পথে ট্রাকটা পার্কের কাছে মোড় ঘুরছে, তখন দেখেছিলাম ঐ বীরপুঙ্গব দুটিকে আরও

কয়েকজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে জামা দিয়ে চোখ মুছছে। সূর্য-মুর্ ওদের দেখেই বিভল-ভাবে হাত দিয়ে ছিলো সে সময়। ওর দিকে চোখ পড়তেই দুজনে ম্লান হেসেছিলাম।

আজও বুঝতে পারিনি—ওদের এই দুটো পরস্পরবিরোধী আচরণের কারণ।

তারাশঙ্কর এইসব দেখে বোধহয় ক্ষুব্ধ হয়ে লিখেছিলেন মৃত্যুর কিছুদিন আগে—

শোক ভয় উন্মাদনা
লোভে ক্ষোভে আচ্ছন্ন চেতনা
ঈর্ষা হিংসা জর্জরিত প্রাণ
কে তারে করিবে পরিত্রাণ ?
ভয় নাই, ভয় নাই
অন্ধকারে জ্যোতিষ্মান
চিরদিন জাগ্রত ভগবান।

॥ ১২ ॥

ধুলোট

তারাশঙ্কর আমার জন্মদাতা ; সুতরাং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরমুহূর্ত থেকেই আমি তাঁকে দেখেছি। জ্ঞান হবার পর অর্থাৎ ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ সালে যেটুকু তাঁর সম্বন্ধে জেনেছি তা হল তাঁর অসাধারণ প্রাণপ্রাচুর্য—যার তাগিদে এই গ্রাম্য মানুষটি চারদিকে জীবন বিকাশের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

সে যুগের আকাশে বাতাসে স্বামী বিবেকানন্দ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, শহিদ ক্ষুদিরামের ত্যাগের আদর্শ প্রতিভাত বাতাবরণের মধ্যে বেড়ে ওঠা তারাশঙ্কর তাই কখনও সমাজসেবায়, কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে কলেরায় রুগীদের সেবা করে বেড়াচ্ছেন, কিম্বা পথে পড়ে থাকা অসুস্থজনকে চিকিৎসার জন্য দাতব্য চিকিৎসালয়ের দোরগোড়ায় দিয়ে যাচ্ছেন ; আবার কখনও দেখছি অসহযোগ আন্দোলনে মাদক বর্জনে পিকেটিং করে জেলখানায় বন্দী হচ্ছেন ; আবার দেখছি ঝোলা কাঁধে করে বৈরাগী বাউলের মত মেলায় মেলায়, এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—হঠাৎ কাগজ কলম নিয়ে লিখছেন কবিতা—"কতদূর কতদূর, মধুগীতি ভরপুর, পীরিতি সায়রতীরে মধুর নাগুর।" নাটক লিখে অভিনয় করছেন। এসবের মধ্যেই জমিদার সেজে মহালে গিয়ে খাজনা আদায় করছেন। টোপর দেওয়া গরুর গাড়িতে চেপে আমরাও এক-আধবার তাঁর সঙ্গে গেছি। আবার এসবে যখন মন ভরছে না তখন দেখা যাচ্ছে অতৃপ্ত মনে গিয়ে বসেছেন কুলদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের সামনে। ব্যাকুল প্রার্থনা জানাচ্ছেন। অর্থাৎ

চলছে তাঁর নানাদিকে অন্বেষণ। কোথায় যাবেন!

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"তারাশঙ্করের জীবন ১৯১৮ থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কালসীমার মধ্যে সেবাব্রতী গ্রাম্য পরিব্রাজক হিসাবেই তাঁর প্রধান পরিচয়। এর ফাঁকে ফাঁকে সাহিত্য সাধনা।"

জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পাওয়ার পর ১৯৬৭ সালে তাঁর সপ্ততিতম জন্মতিথিতে মহাজাতিসদনে তাঁকে যে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়, তার উত্তরে তিনি বলেছিলেন—"আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে, উত্তর রাঢ়ের এক অখ্যাত, নির্জন, শান্ত পল্লীগ্রাম, সামান্য জমিদারের ঘরে আমার জন্ম। আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন হয়ে বিধবা মা ও পিসীমার রক্ষণাবেক্ষণ ও সামান্য ভূসম্পত্তির কল্যাণে বিরূপ সংসারের স্রোতেও ভেসে যাইনি। গ্রামের হাইস্কুলে লেখাপড়া করেছিলাম। সেখান থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেছিলাম। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করার সময়েই স্বগ্রামে বিবাহ হয়। তারপর পড়তে এসেছিলাম সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজে। কিন্তু গুপ্ত রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পুলিসের নির্দেশে স্বগ্রামে ফিরে যেতে হয়।

"তারপর ব্যবসায়ী হবার চেষ্টা করেছি। নিজের বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করেছি, সমাজসেবা করেছি। ১৯৩০ সালের আন্দোলনে জেলে গিয়েছি। আবার উদ্দেশ্যহীনের মতই এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছি। যা করেছি তার কোনটাতেই যেন তৃপ্তি পাইনি। উদ্দেশ্য খুঁজে পাইনি বলেই বোধহয় উদ্দেশ্যহীনের মত ঘুরেছি। আবার এরই ফাঁকে ফাঁকে কবিতা লিখেছি, নাটক লিখেছি, অভিনয় করেছি। শেষে কবিতা নাটকের রাস্তা ছেড়ে, গল্পের পথ ধরে সাহিত্যের অঙ্গনে এসে পৌছেছি। অনেক পথ ঘুরেও যেখানে তৃপ্তিকর উদ্দেশ্য খুঁজে পাইনি, সেখানে সাহিত্যের অঙ্গনে পৌছে যেন মনে হয়েছে—সে উদ্দেশ্য বোধ হয় পথ পেয়েছে, তৃপ্তি পেয়েছে।"

২৬.৭.৬৭ আনন্দবাজার

. পরবর্তীকালে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে আলোচনার সময় আরও বিশদ ভাবে তাঁর সাহিত্য জগতে এসে পড়ার কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রশ্ন করছেন—"রাজনীতি সাহিত্য ও অধ্যাত্ম জীবন এই তিনের মধ্যে হয়ত মূলতঃ কোন বিরোধ নেই। তবুও ব্যবহারিক জগতে এগুলোকে আমরা আলাদা করে দেখি। তোমার মধ্যে এই তিনটির প্রতি প্রবণতা আছে। তার মধ্যে সাহিত্যকেই তুমি মুখ্য করে বেছে নিলে কেন?"

তারাশঙ্কর জবাব দিয়েছেন—"এর উত্তরে আমি বলবো প্রেমেন যে তুমি ধরেছো ঠিকই। তিনটি জিনিসই আমার মধ্যে ছিল। কিন্তু সাহিত্যকে বেছে নিলাম আমার রুচির জন্য একথা বললে ঠিক হবে না। বেছে নিলাম ঘটনাচক্রে। কারণ তুমি

একথা স্বীকার করবে যে মানুষের জীবনে যেগুলো ঘটে সবটাই নিজের ইচ্ছেয় ঘটে না। কিছু বাইরের ঘটনার চাপেও ঘটে।...সংক্ষেপে বলি সাহিত্য এবং আধ্যাত্মিক জীবনে কোন বিবাদ নেই। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবন এবং রাজনীতি ও সত্য এবং মিথ্যা নিয়ে কিছু বিরোধ আছে। এই অধ্যাত্ম জীবন—রাজনীতি আর সাহিত্য তিনটে আমার মধ্যে থাকার জন্যে রাজনীতি আমি মুখ্য ভাবে নিতে পারিনি, আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য, তার সত্য-মিথ্যার দ্বন্দ্বের জন্য। সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবন এবং সাহিত্য জীবন যেখানে কোন বিরোধ নাই। সেখানে সাহিত্যকে আমি বেছে নিয়েছিলাম আমার প্রকাশের জন্য, জীবন সাধনার জন্য।”

১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে ছ মাসের বন্দীজীবন কাটিয়ে—ভবিষ্যৎ জীবনে রাজনীতিকে বিসর্জন দেবার বাসনা নিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। উনি লিখছেন—“জেলখানার মোহ কাটল ১৯৩১ সালের সূচনায়।”

‘রসকলি’, ‘হারানো সুর’ প্রকাশিত হয়েছিল—১৯২৯ সালে। অর্থাৎ মাঝে দুটো বছর সাহিত্যজগতের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। তাই জেল থেকে ফিরে সংসার ধর্মে মন দিলেন। তারাশঙ্কর ও তাঁর ভাইদের সংসার—সচ্ছল ছিল বলবো না, আবার অভাবও খুব ছিল না। তবে গোলমাল বাধতো জমিদারীর রেভিনিউ দেবার সময়। প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় হত না ঠিকমত—। এই ধরনের ছোট জমিদারদের প্রজারা খাজনা দিত না। যারা ধনী জমিদার, তাদের মামলা করার ভয়ে প্রজারা খাজনা মিটিয়ে দিত ঠিক ঠিক। এইসব কারণে লাট অষ্টম প্রভৃতি সময়ে রেভিনিউ মেটাবার জন্যে এখান ওখান থেকে ধারদেনা করতে হত। তারাশঙ্করকেও তা করতে হয়েছে। আমার মা-কাকীমাদের গহনায় হাত দিতে হয়েছে সময়ে সময়ে। এসব ঘটনার নিখুঁত বিবরণ তিনি লিখে গেছেন তাঁর ‘ধাত্রীদেবতা’ বইতে।

আমার মা ছিলেন ধনীকন্যা—তাঁর মাতামহ ছিলেন সে যুগের বহু কয়লাখনির মালিক। সুতরাং বাবার দাবিটা ছিল বেশী মায়ের কাছেই। মা কখনও দিয়েছেন স্বেচ্ছায়, কখনও বা দিতে বিরক্ত হয়েছেন—বাবার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। বন্ধক দেওয়া গহনা মা তাঁর নিজের সঞ্চিত টাকা থেকে মুক্ত করে আনতেন। এই সব কারণে বাবাকে নিয়ে আমার মাতৃকুলের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। তারাশঙ্কর লিখছেন—“তাঁরা পড়ো জমিদার ঘরের অর্ধশিক্ষিত জামাইটিকে নিয়ে বিব্রত হয়েছিলেন যথেষ্ট। কখনও কলকাতার অফিসে কখনও কয়লা-কুঠিতে পাঠিয়ে কাজের লোক করে তুলতে চেয়েছিলেন। প্রতিবারই মাস ছয়েকের বেশী লেগে থাকতে পারিনি। পালিয়ে এসেছি। কাজের লোক হইনি—তবে সেখানকার অভিজ্ঞতা আমার জীবনের পাথেয় হয়েছে।” এইভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল তাঁর দিনগুলি।

এরই মধ্যে চলছে তাঁর সাহিত্য সাধনা। একসারসাইজ বুকের রুলটানা খাতায় তিনি গল্প লিখছেন—এক পাতায়, অন্যদিকটা সাদা। সেই সাদা পৃষ্ঠাগুলিতে আমার বোন অঙ্ক করেছে, হাতের লেখা লিখেছে। অথবা তিনি নিজেই ওই সাদা পাতাগুলিতে অন্য কোন গল্পের খসড়া করে রেখেছেন পেন্সিল দিয়ে। তবে ওই লিখিত গল্পগুলির সঙ্গে তাঁর প্রকাশিত গল্পের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। তারাশঙ্কর 'আমার সাহিত্য-জীবনে' লিখছেন—"তখন লিখতাম একসারসাইজ বুকে, কপিং পেন্সিলে।...সে আমলে আমি প্রতিটি গল্পই অন্ততঃ দুবার করে লিখেছি, প্রয়োজন হলে তিনবার চারবারও লিখেছি। পেন্সিলে লেখা খাতা থেকে আমার বাল্যকালের সেই পুরানো নিব লাগানো কলমে লিখতাম। রেডইঙ্ক নিব ছিল আমার প্রিয় নিব। কলমটি আমার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া কলম।"

তাঁর লেখা প্রথম গল্প প্রকাশিত হল 'কল্লোলে'—১৯২৮ সালের মার্চ মাসে। 'আমার সাহিত্য-জীবন' থেকে উদ্ধৃত করছি—"বাংলা ১৩৩৪ সালের ফাল্গুন মাসের কল্লোলে আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' প্রকাশিত হয়। ১৩৩৫ সালের বৈশাখে 'হারানো সুর'।" এই 'রসকলি' গল্পটি দীর্ঘকাল 'প্রবাসী' অফিসে পড়ে ছিল। 'আমার সাহিত্য-জীবনে' লিখছেন—"আমার প্রথম গল্প 'রসকলি' সর্বাগ্রে আমি 'প্রবাসী'তে পাঠিয়েছিলাম, আট মাস পড়ে ছিল 'প্রবাসী'র দপ্তরে; এর মধ্যে অন্ততঃ আটজোড়া রিপ্লাই-কার্ড অবশ্যই আমি লিখেছিলাম এবং প্রত্যুত্তরে বাঁধা গৎ—'গল্পটি সম্পাদকের বিবেচনাধীন আছে' জবাব পেয়েছি।..."

অন্য আর এক জায়গাতে লিখছেন—"এবার স্বয়ং গিয়ে অফিসে হাজির হলাম। টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলাম আমার একটা গল্প—

—দিয়ে যান—ওখানে।

—না অনেক আগে পাঠিয়েছি।

—পাঠিয়েছেন? কি নাম আপনার? গল্পের কি নাম?

বললাম নিজের নাম, গল্পের নাম। তাঁরা একখানা খাতা খুলে দেখেশুনে বললেন—ওটা এখনও দেখা হয়নি।

—দেখা হয়নি? বিবেচনাধীন থাকার এই অর্থ?...

—বললাম, দয়া করে আমার গল্পটা ফেরত দিন।

—নিয়ে যান। দেখি দিন মশাই।

অন্য একজন দেখেশুনে লেখাটা ফেরত দিলেন।"

প্রবাসীর ধাক্কায় তারাশঙ্কর ছিটকে এসে পড়লেন লাভপুরে। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ নিয়ে মেতে থাকেন। পোস্টঅফিসে যান চিঠির প্রত্যাশায়। তারাশঙ্করের লেখা

থেকে আবার উদ্ধৃত করছি—"সেদিন চোখে পড়ল একটি মোড়ক। মোড়কটির উপর সুন্দর একটি ছবি। সমুদ্রের বেলাভূমে নটরাজ নৃত্য করছেন—তাঁর পায়ে আছড়ে এসে পড়ছে সমুদ্র তরঙ্গ। 'কল্লোলে'র ঠিকানা পেলাম।"

ফিরিয়ে আনা 'রসকলি'র পাণ্ডুলিপির শেষ পৃষ্ঠায় পোস্ট অফিসের ছাপ পড়েছিল—কাজেই শেষ পাতাটি আবার নতুন করে লিখে পৃষ্ঠাখানা পাল্টে পাঠিয়ে দিলেন 'কল্লোলে'। এ সম্পর্কে তারাশঙ্কর লিখছেন—"আশ্চর্য, দিন চারেক পরেই, পোস্ট-অফিস থেকে পেলাম 'কল্লোলে'র গোলছাপ দেওয়া সাদা পোস্টকার্ড একখানি পত্র—...পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখছেন—

আপনার গল্পটি মনোনীত হইয়াছে। ফাল্গুন মাসেই ছাপা হইবে।"

প্রবাসীর পাথর চাপা রুদ্ধ জলধারা বয়ে যাবার মত ক্ষীণ রাস্তা খুঁজে পেলো কল্লোলের কল্যাণে। প্রকাশিত হল 'রসকলি'—'হারানো সুর'। নিমন্ত্রণ পেলেন 'কালি কলম' 'উপাসনা' 'ধূপছায়া' আরও অনেকগুলি পত্রিকা থেকে।

'আমার সাহিত্য-জীবনে' তারাশঙ্কর লিখেছেন—

" 'কল্লোল'-'কালিকলম' এমনিভাবে গুণগ্রাহিতার পরিচয় না দিলে আমি চলতাম অন্যপথে।"

যাই হোক সাহিত্যকে উপলক্ষ করে কলকাতা যাতায়াত শুরু হল তাঁর। কলকাতা গেলে ওঠেন ধনী আত্মীয়কুটুম্বের বাড়িতে। পকেটে ট্রেনভাড়া থাকতে থাকতে ফিরে আসেন লাভপুর গ্রামে। কারণ জীবিকা হিসাবে সাহিত্যের পথ তখন কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না—এবং তারাশঙ্কর নিজেও সেদিন পর্যন্ত লিখে একটি কপর্দকও পাননি। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য বলেছেন—

—"আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম যুগে তারাশঙ্করকে সংগ্রাম কম করতে হয়নি। সেই অবহেলা আর অবজ্ঞার যুগে দুটি দিনের কথা তিনি লিখে রেখেছেন। প্রথম উপন্যাস 'চৈতালী ঘূর্ণি' নিজের খরচেই ছাপিয়েছিলেন। প্রকাশকের দোকানে হিসাব নিতে গিয়ে কর্মচারীর মুখে শুনলেন—'বইগুলো নিয়ে যান আপনি। ঝাঁকামুটে ডেকে আনুন। বিক্রী হয় না। ও দিয়ে জায়গা জুড়ে রাখতে পারব না আমরা।' এইখানেই এই অপমানের শেষ হয়নি।

'চৈতালী ঘূর্ণি'র দপ্তরী একদিন বঙ্গশ্রী অফিসে গিয়ে উপস্থিত। তারাশঙ্করকে খুঁজে পেয়ে বললে—আমি চৈতালী ঘূর্ণির ফর্মা আর রাখতে পারব না। একশো বই বেঁধে দিয়েছি দেড়বছর আগে। তার কিছু টাকা আমি পাব। আর বাকী ফর্মাগুলি মলাট না দিয়ে বেঁধে রেখেছি, তার টাকা পাব। আপনি আমার টাকা মিটিয়ে বইগুলো নিয়ে নিন। গুদামে আমার জায়গা নেই। এ বই আমি রাখবো না। না

নিলে পুরনো কাগজের দরে বেচে দেব ফুটপাতের হকারদের কাছে।

দপ্তরীর উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন সজনীকান্ত। তারাশঙ্করের তখন 'ধরণী দ্বিধা হও' অবস্থা। সজনীকান্ত কিন্তু অপমানের হাত থেকে সাহিত্যসাধককে রক্ষা করলেন। দপ্তরীর সমস্ত পাওনা চুকিয়ে ফর্মাগুলি 'শনিবারের চিঠি'র অফিসে দিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। সেই থেকে উভয়ের মধ্যে লেখক প্রকাশকের সম্পর্ক গড়ে উঠল। সজনীকান্ত তারাশঙ্করের 'রাইকমল' উপন্যাস ও প্রথম গল্প সংকলন 'ছলনাময়ী' প্রকাশ করলেন। সজনীকান্তই তারাশঙ্করের প্রথম যুগের গুণমুগ্ধ উৎসাহদাতা এবং পরবর্তী জীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু।"

* *

তারাশঙ্কর সাহিত্যের ফল্গুধারাকে 'প্রবাসী সম্পাদকের বিবেচনাধীন' পাথর সরিয়ে মূলতঃ 'কল্লোল'ই প্রবাহিত করে দিয়েছিল। সেই ধারাকে পুষ্ট করেছিল 'কালিকলম' 'উপাসনা' 'ধূপছায়া'। কিন্তু সজনীকান্ত দাস সেই জলধারাকে স্রোতস্বিনী করে প্রবাহিত করেছিলেন বঙ্গসাহিত্যের অঙ্গনে। অবশ্য আরও দুটি বিরুদ্ধশক্তি এই স্রোতকে কল্লোলিনী করতে সাহায্য করেছিল।

প্রধান এবং প্রবল শক্তিটি জুগিয়েছিলেন—তারাশঙ্করের ধনী শ্বশুরকুল—অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ভাবে তারাশঙ্করকে অপমান করে। পড়ো জমিদার ঘরের এই জামাতাটিকে তাঁরা তাঁদের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তা হল না দেখে তাঁদের ক্ষুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। অতীতে তারাশঙ্কর যখন শ্বশুরকুলের কয়লাকুঠীতে চাকরি করতেন, তখন তাঁর জন্যে নাকি ঐ কোম্পানীর কিছু আর্থিক ক্ষতি হয়। সুতরাং শ্বশুরকুল এখন দাবি করলেন ক্ষতিপূরণ। যদিও আইনগত ভাবে ক্ষতিপূরণের দায় কিছুই ছিল না—তবুও নৈতিক কারণে দায়িত্ব স্বীকার করে নিয়ে লিখে দিলেন তারাশঙ্কর তাঁদের পুকুরের দুআনা অংশ। ঐ পুকুরের বাকি চোদ্দ আনার মালিক তখন ঐ শ্বশুরকুল। অতএব দুই বিঘা জমির মত—ঐ দুই আনা না পেলে ষোল আনা হবে না। তাই দিতে হল। এইখানেই শেষ নয়—লাভপুর গ্রামের পাশের গ্রামটি ছিল তারাশঙ্কর ও তাঁর শরিক আত্মীয়ের জমিদারী—আধাআধি। ঐ আত্মীয় শরিকের অংশটুকু কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর শ্বশুরকুলের দখলে গিয়ে পড়ল। সুতরাং বিপদ বাধলো সরকারের রেভিনিউ জমা দেবার সময়। অর্ধেক দেবেন নতুন মালিক তারাশঙ্করের ধনী শ্বশুরকুল—বাকী অর্ধেক দেবেন তারাশঙ্কর। ধনী শ্বশুরকুল সুযোগ বুঝে ওঁদের দেয় অর্ধেক রেভিনিউ জমা দেওয়া বন্ধ করলেন। সুতরাং তারাশঙ্করকে জমিদারী নীলাম বন্ধ করবার জন্য সমস্ত রেভিনিউ সেইসময় কালেক্টরীতে জমা দিতে হবে। অবশ্য ঐ অর্ধেক টাকা আদায় করার জন্যে পরে শ্বশুরকুলের

বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবেন। অন্যথা জমিদারী নীলামে উঠবে এবং সেই নীলামে শ্বশুরকুল বেনামীতে ঐ সম্পত্তি কিনে নেবেন। বাড়ির লাগোয়া জমিদারী—মস্ত সম্মানের। এই কথা মনে রেখে প্রথমবার তারাশঙ্কর সমস্ত রেভিনিউ দাখিল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে সিউড়ী গেলেন। সে যাত্রা রক্ষা পেল জমিদারী। কিন্তু তাঁর মত লোকের পক্ষে ঐ সম্পত্তি এইভাবে রক্ষা করা যাবে না, সেটা উনি বুঝেছিলেন। তাই বাধ্য হয়ে অত্যন্ত অপমানের সঙ্গে ওই সম্পত্তিটি বেশ অল্প দামে সিউড়ীর কোন এক ধনী জমিদারের কাছে বিক্রী করে দিলেন। অত্যন্ত আহত ও অপমানিত হয়েছিলেন সামাজিক জীবনে। এই অপমান তারাশঙ্করের ধূমায়িত অন্তর-বহ্নিকে প্রজ্জলিত করেছিল। এসবের কিছু কথা 'আমার সাহিত্য-জীবনে' লিখেও গেছেন। আর দ্বিতীয় শক্তিটি হল বীরভূম জেলার তদানীন্তন পুলিস সাহেব বিখ্যাত সামসুদ্দোহা—যে কোন ভাবে তারাশঙ্করকে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে পুনরায় কারাগারে প্রেরণের শুভেচ্ছা। এর থেকে বাঁচতে তারাশঙ্করকে সাময়িকভাবে ছাড়তে হল তাঁর বীরভূমের বাস। কলকাতা এসে একখানি টিন ছাওয়া কুঠরী ভাড়া করলেন—অশ্বিনী দত্ত রোড—মহানির্বাণ রোড—মনোহরপুকুর রোডের সঙ্গমস্থলের কাছাকাছি। তারাশঙ্কর লিখছেন—"উনিশশো তেত্রিশ সালে ওই মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে একখানি পাকা-দেওয়াল টিনের ছাউনি ঘরভাড়া করলাম। সাহিত্যিক জীবনের ভূমিকাপর্ব শেষ করে পুরোদস্তুর সাহিত্যিক জীবন শুরু হল। কল-চৌবাচ্চা ছিল না, একটা টিনের গোল জালা কিনলাম। ভোরবেলা কলে জল এলেই বালতি করে রাস্তার কল থেকে জল এনে জালাটা ভর্তি করে রাখতাম। তার আগেই ঘর পরিষ্কার, জল দিয়ে মোছা শেষ হ'ত। আসবাব কিছু ছিল না। একটা দেওয়ালের তাকে সামান্য জিনিস থাকত; মেঝের উপর সতরঞ্চি পেতে, স্যুটকেস টেনে সেইটিকেই রাইটিং ডেস্ক হিসেবে ব্যবহার করতাম।"

খরচ হত সে সময়ে মাসে প্রায় তিরিশ টাকা। তারাশঙ্কর একটা হিসাবও দিয়েছেন—"ঘর ভাড়া পাঁচ টাকা, লাইট চার্জ এক টাকা। চা জলখাবার সাত আট টাকা। খাবার খরচ আট টাকা—এ-বেলা দু আনা, ওবেলা দু আনা। ট্রামবাস অন্য খরচ আট টাকা। মাসে তিরিশ টাকা।" কিন্তু এতেও দোহাসাহেবের হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল না।

তারাশঙ্কর লিখছেন—"মাস খানেক পরেই খবর পেলাম, দোহাসাহেব তদন্ত করছেন আমার গ্রামে, কোন্ আয়ে আমি কলকাতা থাকি। কি আমার জীবিকা?

শঙ্কিত হলাম। গল্প লিখে মাসে ত্রিশ টাকা উপার্জন করি—এ প্রমাণ করা সহজ ব্যাপার নয় বলেই মনে হল। অনেক ভেবে অবশেষে ছুটে গেলাম সজনীকান্তের

কাছে। পরিমল গোস্বামী 'শনিবারের চিঠি'র সম্পাদক। ওঁর নীচে সহ-সম্পাদক হিসেবে আমার নামটা দিতে হবে। এবং 'শনিবারের চিঠি'র মাইনের খাতায় আমার নাম তুলে তিরিশ টাকা হিসেবে খরচ লিখতে হবে। মাইনে অবশ্য আমি নেব না ; এবং কুড়ি টাকার অধিক বলে খরচ দেখানোর বিশুদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী যে এক আনার টিকিট লাগে সেটাও আমি দেব।

সজনীকান্ত হেসে বললেন—তাই হবে।

এইভাবে আমি 'শনিবারের চিঠি'র সহকারী সম্পাদক হলাম।"

ওই টিনের ঘরে উনি বছর দেড়েক ছিলেন। এখানে থাকতেই অনেকগুলি ভাল গল্প লিখেছেন। এগুলির মধ্যে আছে শ্মশান-বৈরাগ্য, ছলনাময়ী, মধুমাস্টার, ঘাসের ফুল, ব্যাধি, রঙীন চশমা, জলসাঘর, রায়বাড়ি, টহলদার, আখড়াইয়ের দীঘি, ট্যারা, তারিণীমাঝি, প্রতীক্ষা, হুটু মোক্তারের সওয়াল—দুইপুরুষ নাটকের বীজ—, নারী ও নাগিনী এবং উপন্যাস আগুন।

সাহিত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে কলকাতা বাসের ঐ সময়সীমাকে তারাশঙ্করের অজ্ঞাতবাসের কাল বলে আমরা অর্থাৎ তাঁর পরিজনেরা মনে করে থাকি। আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে কোনরকম সাহচর্য ছিল না তাঁর সে সময়। সময়টা ১৯৩৩ থেকে ৩৫ সাল পর্যন্ত বলে আমরা আত্মীয়জনেরা মনে রেখেছি। কারণ ১৯৩৫ সালে আমার অগ্রজ সনৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য পিতৃদেবকে আবার লাভপুরে দেখতে পাচ্ছি। আর আমরা এই সময়টাকে 'হুটু মোক্তারের অজ্ঞাতবাস' বলে দাদার সঙ্গে পরবর্তী কালে পরিহাস করতাম।

* * *

১৯৩২ সালের শেষের দিকে সাবিত্রীপ্রসন্নের 'উপাসনা'র পরিবর্তে সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় 'বঙ্গশ্রী'র আবির্ভাব ঘটলো। এই প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর লিখেছেন—"'উপাসনা' উঠে গেল। সাবিত্রীপ্রসন্ন চলে গেলেন, এলেন সজনীকান্ত দাস। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের নূতন মাসিক পত্রিকা 'বঙ্গশ্রী' শুরু করলেন।...উপাসনায় তখন 'যোগ-বিয়োগ' নামে একখানি উপন্যাস ক্রমশঃ প্রকাশিত হচ্ছিল। এবং 'সর্বনাশী এলোকেশী' নামে একটি গল্পও দেওয়া ছিল 'উপাসনা'র দপ্তরে। 'উপাসনা'র শেষ সংখ্যায় আকণ্ঠ ঠেসে সাবিত্রীপ্রসন্ন সব শেষ করেছিলেন। এবং হিসাবনিকাশ চুকিয়ে দেবার সময় উপন্যাস ও গল্পের জন্য পারিশ্রমিক আদায় করে দিয়েছিলেন ষাট এবং দশ। উপ-ন্যাসের দরুণ বারো মাসে পাঁচ টাকা হিসেবে ষাট টাকা। এই আমার সাহিত্য জীবনের প্রথম উপার্জন।"

এই সময়ে তারাশঙ্কর সজনীকান্তের পরিচিত ছিলেন না—হয়ত সজনীকান্ত

তারাশঙ্করের নামও শোনেননি। এ সময়ের কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন—
"সেই সময় শনিবারের চিঠির দুরন্ত প্রতাপ। সাহিত্যিক মজলিস বললেই শনি-বারের চিঠির কথা ওঠে। গালাগালির অন্ত থাকে না।...একদা ইচ্ছা হল শনিবারের চিঠির দুর্দান্ত সজনীকান্তকে দেখে আসি, কেমন সে লোকটা।

রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীটে শনিবারের চিঠির অফিস।...মানিকতলা খালের কাছাকাছি রাজেন্দ্রলালা স্ট্রীটে সভয়ে প্রবেশ করে দাঁড়ালাম। চক মিলানো বাড়ি, উঠানের চারি-পাশে ঢাকা রোয়াক বা বারান্দা। সেই বারান্দার বেশ জবরদস্ত কাঠামো—মোটা নাক, বড় উগ্রদৃষ্টি চোখ, ফরসা রং চেয়ারে বসে গড়গড়ায় রবারের নল লাগিয়ে তামাক টানছে। মনে হল এই সজনীকান্ত, শনিবারের চিঠির সম্পাদকের মত জবরদস্ত চেহারাটা বেশ মিলে যাচ্ছে। তবে রবারের নলে গড়গড়া টানতে দেখে অশ্রদ্ধা হল। একি গুরুচণ্ডালী ব্যাপার। যাক গে। আমাকে দেখেই চোখ দুটো আরও খানিকটা বড় করে ভরাট গলায় প্রশ্ন করলেন—কি চাই?

পাতলা রোগা মানুষ—সদ্য জেল থেকে ফিরেছি—আরও রোগা হয়ে।...সর্বাঙ্গে একটা কালো ছোপ পড়েছে। মনে হল লোকটি আমার থেকে বয়সে বড়। সভয়ে উত্তর দিলাম—আমি শ্রীযুক্ত সজনীকান্তবাবুকে খুঁজছি। নাকের ডগাটা ফুলে উঠলো, বললেন—আমিই সজনীকান্তবাবু! কি দরকার আপনার?

লেখক বলে পরিচয় দেবার মতো যোগ্যতা ছিল না, ভরসা পেলাম না। চট করে বললাম—আমার বাড়ি বীরভূম, আপনার দেশের লোক—একটু সাহায্যের জন্যে এসেছি।

—কি সাহায্য?

—আমি একটি প্রেস কিনব। ছোটখাটো মফস্বলে কাজ করার মত প্রেস; আপনি নিজে প্রেস করেছেন, যদি এই কেনার ব্যাপারে একটু সাহায্য করেন।

আরও কয়েকটা কথা বলে আমি চলে এলাম। দেখে এলাম সজনীকান্তকে। সেদিন যদি আমি সাহিত্যের কথার অবতারণা করতাম তবে নিশ্চয় সজনীকান্ত উত্তরে সেদিন বীরভুমের ধান চালের প্রসঙ্গ উত্থাপন করতেন বলেই আমার ধারণা।"

সেদিন সজনীকান্ত দাস তারাশঙ্কর সম্পর্কে কোন কৌতূহল দেখাননি, তাঁর পরিচয়ও জিজ্ঞাসা করেননি। সুতরাং দেখাই হয়েছিলো—কিন্তু পরিচয় হয়নি সেদিন। এই পরিচয় হয়েছিল আরও অনেক পরে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—

"পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় হল 'বঙ্গশ্রী'র আসরে। সেও সংক্ষিপ্ত। দূরে থেকে গেলাম পরস্পর থেকে। 'বঙ্গশ্রী'তে লিখবার জন্য একবার বললেন না পর্যন্ত। পনেরো দিনের মধ্যে সজনীকান্তের সম্মুখ থেকে একপ্রস্থ আবরণ সরে গেল। একটি গল্প লিখে-

ছিলাম। সে গল্পটি কিরণ রায় আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে চলে গেলেন এবং আমার অসাক্ষাতেই সজনীকান্তকে শোনালেন। সাহিত্যপ্রেমিক বোদ্ধা সজনীকান্ত সেই মুহূর্তে টেলিফোন তুলে আমাকে ডাকলেন; আমি তখন বালিগঞ্জে আত্মীয় বাড়িতে রয়েছি। বললেন, আপনি দয়া করে এখানে আসুন। প্রথম সংখ্যাতেই (বঙ্গশ্রী) ছাপাতে চাই আপনার গল্প।

গুণগ্রাহী সম্পাদক সজনীকান্তকে পৃষ্ঠপোষক হিসাবেই পেলাম সেদিন।"

আমাদের কাগজপত্র থেকে দেখা যায়—সে গল্পটি সম্ভবতঃ 'সন্ধ্যামণি'—১৩৩৯ সালের মাঘ মাসে প্রকাশিত হয়েছিল বঙ্গশ্রীতে। কয়েকমাস পরে 'মেলা' নামে আর একটি গল্প প্রকাশিত হয় ঐ কাগজে—১৩৪০ সালের বৈশাখ মাসে। তখন সজনীকান্ত বলেছিলেন—"এই লোকটি বাংলা সাহিত্যে অনেক কথা—এ যুগের লেখকদের সকলের চেয়ে বেশী কথা—বলতে এসেছে। এঁর পুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।"

আবার তারাশঙ্করের লেখাতে আসছি। উনি লিখছেন—"বঙ্গশ্রীতে আলাপের মাস তিনেক পর আমার নিজ ব্যয়ে প্রকাশিত প্রথম বই 'চৈতালী ঘূর্ণির' দপ্তরী বঙ্গশ্রী অফিসে এসে আমাকে ধরলে।...সজনীকান্ত অন্তরাল থেকে কথাটা শুনে ফেলেছিলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে দপ্তরীর টাকা মিটিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছিলেন—আপনি সঙ্কুচিত হবেন না তারাশঙ্করবাবু—আজ থেকে আপনার পাবলিশার হলাম। বইয়ের ভার আমার রইল।

সেদিন-পৃষ্ঠপোষক থেকে আত্মীয় হয়েছিলেন আমার। বয়সে বড় ছিলাম আমি। —মুখ ফুটে অনেকের মত সজনীদাদা বলতে পারিনি। কিন্তু সম্ভ্রমে আচারে তাঁকে জ্যেষ্ঠের সম্মান দিয়েছিলাম। তিনিও সহজভাবে নিয়েছিলেন।"

সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি'তে ঐ ঘটনার তারিখ পাই ১৯৩৪সালের ২৬শে নভেম্বর সজনীকান্তের বঙ্গশ্রী ছাড়ার মাত্র এক মাস উনিশ দিন পূর্বে। আরও কিছু পাই সজনীকান্তের 'আত্মস্মৃতি'তে তারাশঙ্করের সম্পর্কে লিখছেন—"বঙ্গশ্রী বাহির হইবার তিন মাস পরেই অর্থাৎ ১৩৪০ বঙ্গাব্দের বৈশাখে আরও দুইটি মাসিক পত্রিকা কলিকাতায় জন্মলাভ করে—অভ্যুদয় ও উদয়ন।...সদ্য উপাসনাভ্রষ্ট সাবিত্রীপ্রসন্ন অনেক তোড়জোড় করিয়া 'অভ্যুদয়ে'র অভ্যুদয় ঘটান। প্রারম্ভেই রবীন্দ্রনাথ প্রশস্তি কবিতা "অভ্যুদয়ে" এই ইঙ্গিত করেন—

শত-শত লোক চলে শত শত পথে
তারি মাঝে কোথা কোন্ রথে
সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়।
দিক্‌লক্ষ্মী গাহিল না জয়,...

আজো রাজটীকা
ললাটে হল না তার লিখা।
নাই অস্ত্র নাই সৈন্যদল,
অস্ফুট তাহার বাণী, কণ্ঠে নাহি বল।
সে কি নিজে জানে
আসিছে সে কি লাগিয়া, আসে কোন্‌খানে।
যুগের প্রচ্ছন্ন আশা করিছে রচনা
তার অভ্যর্থনা...

আজ বাইশ বৎসর পরে মাত্র এক বৎসরের ক্ষণজীবী অভ্যুদয়ের সূচী ও পাতা উল্টাইয়া কবির "সে আসিছে যার আজি নব অভ্যুদয়" এই উক্তি একমাত্র তারাশঙ্করের উপর আরোপ করিতে পারিতেছি। এক বৎসরে 'অভ্যুদয়ে' যাঁহারা লিখিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই তখনই লব্ধপ্রতিষ্ঠ। গত বাইশ বৎসরে ইঁহাদের গৌরব বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। দেখিতেছি সেদিনকার অস্ফুট বাণী ও দুর্বল কণ্ঠ তারাশঙ্করেরই অভ্যর্থনা রচনা করিয়াছে সে যুগের প্রচ্ছন্ন আশা।"

কল্লোলের গুণগ্রাহিতা, সজনীকান্তের পৃষ্ঠপোষকতা, বন্ধুত্ব এবং আরও দুজন মনীষী, মোহিতলাল ও স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও অভয়বাণী তারাশঙ্করকে সাহিত্য জীবনের পথে দুস্তর বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে সাহায্য করেছিল।

তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবনে লিখেছেন, "মানুষের জীবনে উৎসাহের প্রয়োজন আছে। তন্ত্রসাধনায় শুনেছি সাধককে 'ভয় নাই'—মাভৈঃ এই কথা শোনাবার জন্য আর একজন সিদ্ধ সাধকের প্রয়োজন হয়। শবাসনে বসে সাধক যে মুহূর্তে ভয় পায়, চিত্ত যে মুহূর্তে দুর্বল হয়, সেই মুহূর্তেই সে শুনতে পায়, ওই সিদ্ধ সাধকের ওই অভয়বাণী। সাধনায় রত সাধকের ভয় দূর হয়, নববলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহবাণী আমার কাছে সেই অভয়বাণী।"

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "নবীন সাধকের উৎসাহদাতা এই সিদ্ধ সাধককেই তন্ত্র সাধনায় বলে 'উত্তরসাধক'। তারাশঙ্কর তাঁর সারস্বত জীবনের প্রারম্ভে তিন জন উত্তরসাধকের দ্বারা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রথম সম্পাদক সজনীকান্ত দাস দ্বিতীয় সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার এবং তৃতীয় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ।" মোহিতলাল লিখেছিলেন—"গল্পলেখকগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান কে, এই প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার সমাধান করিতে হইলে তারাশঙ্করের কৃতিত্ব যেরূপ উত্তরোত্তর স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শেষপর্যন্ত তাঁহার দাবিই গ্রাহ্য হইতে পারে এমন ভবিষ্যদ্বাণী করিবার দুঃসাহস আমি করিতেছি।" মোহিতলালের

এই সমালোচনা ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসের প্রবাসীতে বের হয়।

আর কবিগুরু বলেছিলেন—"তোমার মত গাঁয়ের মানুষের কথা আগে আমি পড়িনি।" তখন তারাশঙ্করকে কারোরই পক্ষে আর অস্বীকার করার উপায় ছিল না। কিন্তু সমসাময়িকদের তখনও কেউ বলেছেন—বড্ড গ্রাম্য, কেউ বলেছেন—অত্যন্ত লাউড, মনে হয় যেন ঢাকের বাদ্যি—ও থামলেই ভাল। আবার কেউ বলেছেন—আজও তোর লেখার স্টাইলটা রপ্ত হল না। এ ছাড়া আঞ্চলিকতাবাদের অপবাদ তো ছিলই। অনেকে এসেছেন উনি টমাস হার্ডি পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লিখেছেন কিনা জানতে।

একবার একজনের মন্তব্য শুনে বিশেষ দুঃখিত হয়েছিলেন উনি। মন্তব্যটি হল—'গল্প লেখে বটে, জমাটও বটে, কিন্তু বড় লাউড অর্থাৎ স্থূল। সূক্ষ্মতার অভাব আছে।'

জিজ্ঞাসু তারাশঙ্কর এ বিষয়ে কবিগুরুর অভিমত জানতে চাইলেন। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ ১৩৪৩ সালে (১২।৩।১৯৩৭) লিখলেন—"তোমার স্থূল-দৃষ্টির অপবাদ কে দিয়েছে জানিনে কিন্তু আমার তো মনে হয় তোমার রচনায় সূক্ষ্ম স্পর্শ আছে, আর তোমার কলমে বাস্তবতা সত্য হয়েই দেখা দেয় তাতে বাস্তবতার কোমর-বাঁধার ভান নেই, গল্প লিখতে বসে গল্প না লেখাটাকেই যাঁরা বাহাদুরি মনে করেন তুমি যে তাঁদের দলে নাম লেখাও নি এতে খুশি হয়েছি। লেখায় অকৃত্রিমতাই সবচেয়ে দুরূহ।"

তারাশঙ্করের তখন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কিছু আর্থিক সচ্ছলতাও এসেছে যার জন্যে দেড় বছর মনোহরপুকুর রোডের ভাড়াটে ঘরে কাটিয়ে বউবাজারের একটি মেসে উঠে এলেন। ২৩৬ বউবাজার স্ট্রীট। সামনেই গির্জা, একটু দূরে ফিরিঙ্গী কালীতলা—অর্থাৎ চীনেম্যান, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান, এবং মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলটায়। সেখান থেকে এসে উঠলেন শান্তিভবন বোর্ডিংএ—মির্জাপুর ও হ্যারিসন রোডের—বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী রোডের জংসনের উপরই তিনতলা বাড়ি। বেশ ভদ্র পরিবেশ—একেবারে খাঁটি শহুরে আবহাওয়া, ঘরখানিও চমৎকার। লম্বায় ১২।১৪ ফুট, চওড়ায় বড়জোর আট ফুট। উনি এখানে এসেছিলেন ১৩৪৪ সালের হোলির কাছাকাছি সময়ে অর্থাৎ ইংরাজীর ১৯৩৮ সনের মার্চ মাসে। তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্য জীবনে লিখেছেন—"...আমার সাহিত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এইখানে। জীবনের পটপরিবর্তনের ভূমিকা রচিত হয়েছিল এই শান্তিভবনে থাকতেই। এখানে প্রায় দেড় বছর ছিলাম। এখানে থাকতেই "ধাত্রীদেবতা" রচনা আরম্ভ ও শেষ, কালিন্দী এইখানেই আরম্ভ করি। প্রথম ছ-মাসের লেখা এখানেই লিখেছি। এখানে থাকতেই

ক্রমশ প্রকাশিত লেখাগুলি কিস্তিতে কিস্তিতে লেখার অভ্যাস আয়ত্ত করেছি।··· সবদিন ভাত খাইনি। স্নানেরও সময় নির্দিষ্ট থাকেনি। সমস্তদিন শুধু লিখেছি এবং চা খেয়েছি; মধ্যে তার সঙ্গে দু-এক টুকরো পাউরুটি, কখনও বা একটা ডিম।" এতদিন তারাশঙ্করের খ্যাতি এসেছিল শুধু ছোটগল্পের মাধ্যমে—'ধাত্রীদেবতা' 'কালিন্দী' তাঁকে প্রথম সারির ঔপন্যাসিকের সম্মানও এনে দিলে। এই সময় এল অর্থের প্রলোভন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের প্রধান আচার্য ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন সারা শহর খুঁজে বেড়াচ্ছেন তারাশঙ্করকে। আচার্য সেন তারাশঙ্করের ফোন পেয়ে বললেন—"আরে বাবা, আপনাকে খুঁজে হয়রান। বৃদ্ধ বয়সে 'আনন্দবাজার' পর্যন্ত গিয়েছি।···আপনাকে আমার বিশেষ দরকার। কখন আসছেন বলুন।"

আচার্য সেন তখন থাকতেন বেহালাতে এবং সেখান থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যাতায়াত করতেন ঘোড়ায় টানা ব্রুহাম গাড়িতে। এটি ছিল তাঁর নিজের গাড়ি।

তারাশঙ্করের সঙ্গে দেখা হতে যে কথা বলেছিলেন, তা তারাশঙ্করের সাহিত্য-জীবন থেকে উদ্ধৃত করছি—'বম্বের বম্বে-টকীজের হিমাংশু রায়কে জানেন? সে আমার শ্যালকপুত্র। আর ডাঃ সুরেন্দ্র দাশগুপ্তের সম্বন্ধী। সে আমাকে চিঠি লিখেছে। আপনাকে বম্বে যেতে হবে বাবা।'

আমি অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি বললেন—সেখানে তারা একজন বাঙালী গল্প লেখক নেবে। আপনার লেখা পড়ে ভালো লেগেছে। আপনাকে চায় সে।

—আমাকে চান তিনি?

—হ্যাঁ লিখেছে, আবার কাল সুরেনকে তারও করেছে। আপনি চলে যান সেখানে। তিন বছরের কণ্ট্রাক্ট হবে আপনার সঙ্গে—প্রথম বছর ৩৫০, দ্বিতীয় ৪৫০ এবং তৃতীয় বছরে ৫৫০ পাবেন।

আমি হতবাক হয়ে গেলাম। আমি এখানে মাসে চল্লিশ টাকা নিয়মিত উপার্জন করতে পারি না। পথে আজ শৈলজানন্দের মুখে শুনে এসেছি—নিউ থিয়েটার্স তাঁকে দেড়শো কি দুশো দেয়। সেন মশায়ের কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না।

সেন মহাশয় বলে গেলেন—তিন বছরের পর আবার কণ্ট্রাক্ট হতে পারবে। হবেও। তবে সে তো আর লেখাপড়ার কথা নয়। আপনি চলে যান, যেতে টাকা-কড়ি দরকার হলে আমি দেব আপনাকে।···সেন মহাশয় সস্নেহে বলেছিলেন—তা হলে কবে যেতে পারবেন বাবা? আমি তার করব।" উনি সময় প্রার্থনা করেছিলেন এবং বলেছিলেন—"আমার মা আছেন তাঁর অনুমতি চাই—"

তাঁর মায়ের কাছ থেকে চিঠি এলে উনি আবার দেখা করলেন আচার্য সেনের

সঙ্গে। সাহিত্য জীবনে লিখেছেন—"আমি মায়ের চিঠিখানি তাঁর হাতে দিলাম। আমার মায়ের হাতের লেখা সেকালে ছিল অতি সুন্দর। সোজা সারিতে নিটোল মুক্তার মতো হরফগুলি নিপুণ গ্রন্থনে তারে গাঁথা মালার মত সাজানো মনে হত; দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যেত। তিনি বললেন, আপনার মায়ের লেখা!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

ততক্ষণে তিনি পড়েছেন মায়ের চিঠির প্রথম পঙ্‌ক্তি। মা লিখেছিলেন—তুমি এমন প্রলোভন জয় করিয়াছ জানিয়া আমি পরম তৃপ্তি পাইয়াছি। সুখী হইয়াছি। আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিতেছি। এরপর আরও ছিল।

তিনি চিঠি থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—আপনি তা হলে যাওয়ার পক্ষে মত চাননি, যাবেন না এরই পক্ষে মত চেয়েছিলেন।

—আমি আমার মত লিখেছিলাম।

—কেন বাবা? আপনার অমত কিসে? চরিত্র চরিত্রবানের উপর নির্ভর করে। ভয় করলেই ভয়, সাহস করলেই ভয় জয় করা যায়।

আমি আমার মনটাকে তাঁকে বুঝাবার চেষ্টা করলাম। বললাম, এ ছেড়ে যেতে আমার মন চাইছে না। আমার মনে হচ্ছে সব হারিয়ে যাবে আমার।

—সব হারিয়ে যাবে?

—হ্যাঁ, তাই মনে হচ্ছে আমার।

—আপনি তো কোথাও চাকরি করেন না?

—না।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন বৃদ্ধ। তারপর অকস্মাৎ তাঁর হাতখানি বাড়িয়ে আমাকে আকর্ষণ করে বললেন, কাছে আসুন আমার।

আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর ছেলে—তৃতীয় ছেলেকে ডাকলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক। তাঁর স্ত্রীকে ডাকলেন। ডেকে বললেন, শোন এঁর কথা। তারপর বললেন, গাড়ি আনতে বল।

তাঁর ব্রুহাম গাড়িখানির কথা সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিচিত নয়। সেই গাড়িতে আমায় নিয়ে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে।

নিয়ে প্রথমেই গেলেন তাঁর বড় ছেলের বাড়ি। পৌত্র কবি সমর সেনকে ডেকে আমার পরিচয় দিয়ে সেই কথা বললেন।...

ওখান থেকে আরও দু-তিন জায়গায় তিনি আমাকে সেদিন দেখিয়ে আমার কথা শুনিয়ে বেড়িয়েছিলেন। তার মধ্যে কবি কালিদাস রায় দাদার বাড়িও ছিল। কালিদার সঙ্গে তখন পরিচয় স্বল্প।

সে যে তাঁর কী আনন্দ সে প্রকাশ করতে পারব না। তিনি শেষে আমাকে আশীর্বাদ করে কালীঘাটের মোড়ে ট্রাম ধরিয়ে দিয়ে বিদায় নিয়েছিলেন। আমি তাঁর আশীর্বাদ নিয়ে শান্তিভবনে ফিরেছিলাম।

...এরপর আরও একবার লোক এসেছিল। এবার লোক পাঠিয়েছিলেন ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশায়। এসেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্র মিত্র। এবার বেতনের হার ১০০ টাকা বাড়িয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন।

৪৫০ টাকা থেকে ৬৫০ টাকা। কিন্তু তাতেও না বলতে আর আমার দ্বিধাই ছিল না।

এরই ঠিক দিন তিনেক পরে শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে দেখা হল। তিনি বললেন—আপনি নিলেন না—আমি নিলাম ও কাজ। বম্বে যাচ্ছি আমি।"

এর পরের অধ্যায় সম্পর্কে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন—"কিন্তু শান্তিভবনে বেহিসাবী জীবনযাপনের ফলে আবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। একমাসে চায়ের বিল পঞ্চাশ টাকা ছাড়িয়ে গেছে শুনে সজনীকান্ত বললেন—এভাবে অনিয়ম করলে তুমি বাঁচবে না। অতএব চলে এস আমার কাছে। তারাশঙ্কর ছাড়লেন শান্তিভবন। গেলেন মোহনবাগান রোয়ে। 'শনিবারের চিঠি' অফিসের কাছেই থাকতেন ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে বাড়িতে থাকতেন তার নীচের তলায় সজনীকান্ত একখানি ঘর রেখেছিলেন। সেই ঘরে স্থান পেলেন তারাশঙ্কর। খাওয়াদাওয়া সজনীকান্তের বাড়িতে। তারাশঙ্কর লিখেছেন—"সজনীকান্তের স্ত্রী সুধাদেবী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। এমন মিষ্টভাষিণী মধুর চরিত্র সচরাচর দেখা যায় না। এখানে এসে তাঁর হাতের রান্নায় এবং নিয়মিত পরিমাণ চায়ের ব্যবস্থায় কিছুদিনের মধ্যে সুস্থ হলাম।"

এই সময়ে তাঁর মনে পড়েছিল শিল্পসাধক যামিনী রায়ের কথাগুলি। প্রথম পরিচয়েই তিনি তারাশঙ্করকে বলেছিলেন, "দেশে কেন? চলে আসুন এখানে। কলকাতায়। শ্মশান না হলে শবসাধনা হয় না। প্রত্যেক সাধনায় সাধনপীঠের প্রয়ো-জন হয়। এ যুগে কলকাতাই হল বাংলার সাহিত্যের-শিল্পের সাধনপীঠ। এখানে আসুন, কষ্ট করুন, একবেলা খেয়ে থাকুন—তবে পাবেন।" ১৩৪৭ সালের ৬ই বৈশাখ তারাশঙ্কর সপরিবারে কলকাতার বাসিন্দা হলেন। বাগবাজারে ১।১এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে এসে উঠলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর ব্যবস্থাপনায়। সামনেই অমৃতবাজার পত্রিকার ছ'তলা বাড়ি। আমাদের বাড়ির একই পাঁচিলের ওপাশে থাকেন যামিনী রায় স্বয়ং। তারাশঙ্করকে ভাই সম্বোধন করে যামিনী রায় বলেছিলেন—"এইবার আপনার সাধনা পাকা হবে। হয় মরবেন নয় সত্যকার

বাঁচবেন। এ কাজ ঠিক করলেন। হেসে বললেন—এতদিন তো ভূমিকা করেছেন। এবার জীবন নাট্য শুরু হল। নির্মল সূত্রধারের কাজ করলে।"

আমাদের ঐ বাড়িতেই নীচের তলায় দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন অধ্যাপক নির্মল বসু—যিনি পিতৃদেবকে খোঁজ দিয়েছিলেন ঐ বাড়িখানির। আমাদের ছিল চারখানি ঘর—ছোট এককালি বারান্দা, একটা বাথরুম আর একটা ছোট রান্নার জায়গা। মাসিক ভাড়া পঁচিশ টাকা।

আমাদের কলকাতার বাসিন্দা হওয়ার দুটো মুখ্য কারণ মায়ের ঘুষ-ঘুষে জ্বর কিছুতেই ছাড়ছে না—চিকিৎসার প্রয়োজন। আর আমি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়েছি। দাদাও পাটনাতে বি. এ. পাঠ সমাপ্ত করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন—অর্থাৎ আমাদের দুজনের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা। ডাঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের সুচিকিৎসায় মা সুস্থ হয়ে উঠলেন। সুস্থ হবার পর মা বাবাকে বলেছিলেন—"এবার বাড়ি যাই, কি বল?" কারণ কলকাতাতে থাকার জন্যে অন্তত একশত টাকার সংস্থান তারাশঙ্করের সাহিত্য থেকে তখনও অনিশ্চিত। জিনিসপত্র বলতে আমাদের কিছুই নেই। মাটিতে বিছানা পেতে শয়ন—বৈদ্যুতিক পাখা তখন আমাদের কাছে স্বপ্নের বস্তু। বাবা লিখতেন মেঝেতে একটা আসনের উপর বসে, কোলের উপর ফাইবারের ছোট একটা সুটকেশ, সেটার উপর আমার সাইজ করে কেটে দেওয়া কাগজগুলো নিয়ে লিখে চলেছেন পাতার পর পাতা। কয়েকটা মাস কাটলেই পূজোতে দেশে যাব। গাঁয়ের ছেলে কলকাতাকে তেমন পছন্দ হয় না। আমি কলেজে ভর্তি হয়েছি—দাদা পূর্বেই ভর্তি হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে।

পূজোর খরচ মেটাবার জন্যে বাবা লিখে চলেছেন অনবরত—লিখলেন 'বন্দিনী কমলা'। নিতাই কবিয়ালের প্রেমের উপাখ্যান 'কবি', 'রাঙাদিদি', 'দিল্লীকা লাড্ডু', 'চন্দ্রজামাইয়ের জীবন কথা', 'পিঞ্জর', 'চোরের পুণ্য' আর 'একরাত্রি'।

সেই সময়ের কথা ও কাহিনী শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের লেখায় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাই সেখান থেকেই উদ্ধৃত করছি—"পূজার সময় লাভপুর যাওয়া তারাশঙ্করের বাৎসরিক কৃত্যেরই অন্তর্গত ছিল। একমাস পরে ফিরে আসতেন। তাতে একদিকে বাঁচতো কলকাতার এক মাসের বাসাখরচ, অন্যদিকে লাভ হত দেশের ম্যালেরিয়া। কলকাতায় ফিরে এসেও মাসেক কাল চলত তার জের, নিতে হতো কুইনিন ইঞ্জেকশন।

সেবার পূজাবকাশের শেষে সপরিবারে তারাশঙ্কর যখন আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে পৌছলেন তখন রাত এগারোটা। বাসায় পৌছেই উমাশশী বললেন, গঙ্গার জন্যে একবার ডাক্তার ডাকলে হত না? তারাশঙ্কর ছুটে গেলেন পশুপতিবাবুর ডাক্তারখানায়

কিন্তু অত রাত্রে তাঁকে পাওয়া সম্ভব হল না। ফিরে এসে তারাশঙ্কর স্ত্রীকে বললেন, 'আজই তো জ্বর হয়েছে, নিশ্চয়ই ম্যালেরিয়া। অতএব ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নেই। কাল সকালে ডাক্তার ডাকলেই হবে।'

এর বক্তব্যের অন্তরালে কিছুটা ছলনাও লুকিয়ে ছিল। পূজার উপার্জন দেশেই নিঃশেষ হয়েছে। বাগবাজার পৌছে গাড়িভাড়া চুকিয়ে দিয়ে হাতে অবশিষ্ট ছিল পাঁচটা টাকা। আর কিছু খুচরো পয়সা।

এবার তারাশঙ্করের সাহিত্য জীবনে লেখা রয়েছে— "…রাত্রি প্রায় তুটোর সময় আমার বড় মেয়ে জ্বরের মধ্যে ছটফট স্থরু করলে। আমার স্ত্রী ডাকলেন আমাকে। বোধহয় মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই মেয়েটি চিৎকার করে উঠে অজ্ঞান হয়ে গেল। হাত-পা তখন ঠাণ্ডা। আমি অন্ধকার দেখলাম চারিদিক। প্রথম মুহূর্তে যেন বিমূঢ় হয়ে গেলাম। কি করব?

…উপর থেকে নেমে এলেন আমার বাড়িওয়ালা বলাইবাবুর স্ত্রী—আমার দিদি ও তাঁর মেয়ে পারুল। সামনের দিকে ওবাড়ির বারান্দায় বেরিয়ে এলেন যামিনীদা, তাঁর স্ত্রী, তাঁদের বড় ছেলে ধর্মদাস।

দিদি অর্থাৎ বলাইবাবুর স্ত্রী সংসারে পাকা গিন্নী। অভিজ্ঞতা অনেক। তাঁর সাহস ও ধৈর্য দেখবার মত। আমার মেয়ের মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে নিজের মেয়ে পারুলকে বললেন জল ঢাল মাথায়।

ও বাড়ি থেকে যামিনীদার স্ত্রী এলেন। আমি বেরিয়ে যাচ্ছিলাম ডাক্তার ডাকতে; কিন্তু থমকে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল সম্বলের কথা। সঙ্গে সঙ্গে যামিনীদার কণ্ঠস্বর শুনলাম—ধর্মদাস, যাও ডাক্তার ডেকে আন। ধর্মদাস ছুটে বেরিয়ে গেল। বোধ করি দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই ডাক্তার নিয়ে ফিরে এল।

ডাক্তার তুটো ইনজেক্শন দিলেন, ধীরে ধীরে মেয়ের জ্ঞান ফিরল। হাত-পা গরম হ'ল। ডাক্তার সমস্ত শুনে বললেন—বোধহয় খারাপ ধরণের ম্যালেরিয়া। বোধহয় নয়—ঠিক তাই। আমার মেজ মেয়ে বুলু এই ম্যালেরিয়াতেই মারা গিয়েছে। …সে রাত্রি কাটল। সকালবেলা পশুপতিবাবুকে ডাকলাম। তিনি আবারও একটা কুইনিন ইন্জেক্শন দিলেন। বলে গেলেন, ভয় নেই।

আমি বিমূঢ় হয়ে ভাবছিলাম, টাকা কোথায় পাব?

…বড় কাগজের আফিসে যেখানে পঁচাত্তর টাকা পাওনা আছে, যেটা পুজোর আগে থেকে পাওনা হয়ে রয়েছে, সেইটের জন্য ওখানে যাব স্থির করলাম। নিয়ম যাই হোক, আমি যেখানে এমনই বিপদে পড়েছি সেখানে কি টাকাটা তাঁরা দেবেন না। একি হতে পারে? তার উপর তাঁরা তো সাধারণ ব্যবসায়ী নন, কাগজের

পরিচালক। দেশজোড়া খ্যাতি।

প্রায় ছুটেই গেলাম। দশটার আগে পৌঁছুতে হবে। কারণ কাগজের সর্বময় কর্তা যিনি, তাঁর অনুমোদন ব্যতীত একটি পয়সাও বের হয় না; এবং কর্মকর্তার আফিসে আসা-যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। দশটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত যে কোনও সময় আসতে পারেন। আধঘণ্টা থেকে ভাউচার সই করে এবং প্রাপক যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁদের পাওনার জন্য দিন নির্দিষ্ট করে দিয়ে চলে যান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে দশটার সময় না গেলে হয়তো শুনব এই কয়েক মিনিট হ'ল তিনি চলে গেছেন। গিয়ে বসলাম আফিসের সম্পাদকীয় বিভাগে। সকলেই বন্ধু-স্থানীয়, একজন ছিলেন অগ্রজতুল্য শ্রদ্ধার পাত্র। বিজয়া সম্ভাষণের পর তাঁদের কাছে বসলাম। আমার কেন সেথা আগমন শুনে সকলেই চুপ করে গেলেন। বিবরণ শুনে দু-একজন সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু সে প্রকাশ যেন সহজ স্ফূর্তি পেল না। একজন বললেন, তাইতো, এই অবস্থায় কতক্ষণ যে আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে!

হেসে বলেছিলাম, যতক্ষণই হোক, করতে হবে।...

...দেড়টার সময় অগ্রজতুল্য ব্যক্তিটি চঞ্চল হলেন, বললেন, তাইতো ভায়া? এখনও স্নান করেন নি, খান নি?

—কিন্তু আমার যে টাকা না হলেই নয় দাদা।

—কিন্তু—তিনি থেমে গেলেন। যে কথাটা তাঁর মনে হয়েছিল সেটা আমার কাছে লুকনো রইল না, কিন্তু ওই প্রতিষ্ঠানের কর্মী বলেই কথাটা উচ্চারণ করতে পারলেন না। কথাটা—কিন্তু টাকা কি পাবেন? দেবেন?

আমার কিন্তু ধারণা ছিল, নিশ্চয় পাব। আমার এতবড় দুঃসময়। এত বড় কাগজের প্রতিষ্ঠাবান কর্তা, তিনি কি এ শুনেও না বলতে পারেন? অন্তত কিছু তো দেবেনই। ঢং ঢং ক'রে দুটো বাজল। কয়েকমিনিট পরই গাড়ির হর্ন বাজল নীচে। জানলা থেকে উঁকি মেরে দেখলাম, সেই বিরাটকায় মাস্টার-বুইকখানিই বটে। উঠে দাঁড়ালাম। অগ্রজতুল্য ব্যক্তিটি হেসে বললেন, বসুন বসুন। আর দশ মিনিট ধৈর্য ধরুন। অর্থাৎ কর্তাকে অফিসের হিসেবনিকেশ দেখতে দিন। আজ কার পেমেণ্ট আছে দেখবেন, চেক সই করবেন। পাওয়া চেকের পিঠে সই করবেন। খাতায় সই করবেন। এগুলি হয়ে যাক।

আরও মিনিট দশেক পর তিনি নিজেই উঠে গেলেন। ফিরে এলেন গম্ভীরমুখে। বললেন, হবে না আজ। আমি নিজে গিয়েছিলাম আপনার জন্যেই। তবু যান আপনি, দেখুন, বলুন।

গেলাম। সবিনয়ে নিবেদন করলাম, নিজের বিপদের কথা। বললাম এ বিপদে—

—আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আপনাদের মত লোকেরও বিপদ হয়! একটা দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, কিন্তু আজ তো কিছুই করতে পারব না তারাশঙ্করবাবু। আপনি তো জানেন, আমাদের নিয়ম আমরা দিন নির্দিষ্ট করে দিই। নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট পেমেণ্টগুলি হয়। তার একটার ব্যতিক্রম হলে সব গোলমাল হয়ে যাবে। আপনি দশদিন পর আসবেন। আমি লিখে রাখলাম।

—কিন্তু টাকা—কুড়ি পঁচিশ অন্তত—। আমার কণ্ঠস্বর যেন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। আমি শুনতে প্রস্তুত ছিলাম না এমন কথা। ভাবতে পারি নি।

—আজ কিন্তু পারব না। আপনি দশদিন পরে আসবেন। নমস্কার।

চোখ ফেটে জল এল। বেরিয়ে এলাম। সম্পাদকীয় বিভাগ থেকে ডাকলেন, ভায়া। কিন্তু চোখের জলের লজ্জায় সে ঘরে ঢুকলাম না। প্রায় ছুটেই নেমে এলাম নীচে। ফটক পার হয়ে ফুটপাতে দাঁড়ালাম। খাঁ খাঁ করছিল দুপুরের রাজপথ। শীতের আমেজ পড়েছে। পিচ গলছিল না, তবু নরম হয়েছে, ধুলো উড়ছে। জনবিরল ট্রাম ছুটছে। ক্ষিদেয় আমার পেট জ্বলছে। ক্ষোভে দুঃখে দুশ্চিন্তায় ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাচ্ছে মনে হল।

কয়েক মিনিট একটা বাড়ির ছায়ায় দাঁড়িয়ে আত্মসম্বরণ করলাম। পকেটে তখন আনা তিনেক পয়সা অবশিষ্ট ছিল। এক আনার মুড়ি, দুপয়সার ছোলা কিনে পকেটে পুরে চিবুতে চিবুতে গলিপথ ধরে হেঁটে এসে পৌছলাম কাত্যায়নী বুক স্টলে গিরীন সোমের কাছে।

কালিন্দীর দরুন গিরীনবাবুর কাছে দুশো টাকা পাব। আগেই বলেছি গিরীন-বাবু কথার মানুষ। কথার খেলাপও করেন না, আবার কথার বাইরে প্রশ্রয়ও দেন না।

…গিরীনবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলেন। কৃষ্ণবর্ণ ক্ষীণকায় মানুষ আমি, তার উপর স্নান নেই, আহার নেই, বেলা সওয়া তিনটে; বুকে দুশ্চিন্তা মনের মধ্যে জ্বালা—সব মিলিয়ে বোধ করি আমাকে এমনই হতভাগ্যের শ্রী বা চেহারা দিয়েছিল যা দেখে পূজোর পর বিজয়া সম্ভাষণ করতে গিয়ে চমকে উঠলেন গিরীনবাবু। প্রশ্ন করলেন, কি হয়েছে তারাশঙ্করবাবু? এমন চেহারা আপনার?

আমি কোনরকমে বিপদের কথাটুকু বলেই বললাম, 'কালিন্দীর টাকা আমার এখনও পাবার সময় নয়, কিন্তু আমার এই বিপদ। আপনি কি—'

গিরীনবাবু বললেন, বসুন। উঠে গেলেন তিনি। কোন দোকান থেকে তিনি দুটো সন্দেশ এক গ্লাস জল এনে আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে বললেন, আগে খান।

তারপর একশো টাকা আমায় দিয়ে বললেন, বাড়ি যান। মেয়ে কেমন থাকে খবর দেবেন।

সেই এক আমার জীবনের অক্ষয় স্মৃতি।" (আমার সাহিত্যজীবন—২য় খণ্ড)

অথচ এই কাগজের টাকাটা ভরসা করেই উনি কলকাতায় সংসার পাততে সাহসী হয়েছিলেন। উনি লিখেছেন—"প্রবাসীতে তখন 'কালিন্দী' বের হচ্ছে তার একটা টাকা আছে। সে টাকাটা মাসে মাসে পাই না। প্রবাসীতে 'কালিন্দী' লিখে বোধহয় দেড়শো কি একশো পঁচাত্তর টাকা মোট পেয়েছিলাম, সেকালে এই রকমই দক্ষিণার হার ছিল।"

* * *

পরিশেষে লিখেছেন—"কারও বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আমার উদ্দেশ্য নয়। সে সময়ে বাংলা-সাহিত্যের সেবকদের মধ্যে আমার পর্যায়ের বন্ধুদের অবস্থার কথাই জানাচ্ছি আজকের অনুজদের, পাঠকদের।"

* * *

আমার মা উমাশশী দেবী ছিলেন ধনী কন্যা, তিনি তাঁর পিতার উইলমত পেয়েছিলেন কয়েক হাজার টাকা। সেটা দিয়ে ক্যাশ সার্টিফিকেট কেনা ছিল তাঁর। বরানগরের গায়ে কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে, কাশীনাথ দত্ত রোডে, একটি দোতলা বাড়ি, সবসুদ্ধ ছ'খানা ঘর, কিনে ফেললেন সেই টাকা দিয়ে। ঠিকানা ছিল ৩৬।৪।১ কাশীনাথ দত্ত রোড।

আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে বছর খানেক থেকে ১৩৪৮ সালের চৌঠা বৈশাখ পিতৃদেবের সঙ্গে উঠে এলাম আমাদের নতুন বাড়িতে। সেই সময়কার কথা তাঁর সাহিত্যজীবন থেকে স্পষ্ট জানা যাক। "হাতে তখন দুখানি উপন্যাস রয়েছে। ভারতবর্ষে চলছে 'গণদেবতা'; পাটনার প্রভাতী কাগজে সবে সুরু করেছি 'কবি'। এই বাড়িতে এসে প্রথম সুরু করলাম নাটক। 'কালিন্দী' উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে বসলাম। নাট্যরূপ শেষ হ'ল। ভাবনা হ'ল কোথায় যাই?"

এইখানেই পরিচয় হ'ল প্রাচীন হাটখোলা দত্ত বাড়ির বংশধর ব্যবহারজীবী যতীন্দ্রমোহন দত্তের সঙ্গে—সংক্ষিপ্ত পরিচয় য. ম. দত্ত। এই পরিচয় পরবর্তী জীবনে প্রগাঢ় বন্ধুত্বের রূপ নেয়। তারাশঙ্করের নির্দেশে তাঁর ইচ্ছামত উইল তৈরী ইনিই করেছিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর আমাদের বাড়িতে এসে উইল পড়ে শুনিয়ে আমাদের হাতে তা তুলে দিয়েছিলেন।

'কালিন্দী' মঞ্চস্থ হয়েছিল—১৩৪৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। এ নাটকটি তখন দর্শক সমাজে সমাদৃত হয়েছিল।

তারাশঙ্কর বুঝেছিলেন এ একটা নতুন দিক এবং এদিকে সাফল্যের সম্ভাবনা আছে যথেষ্ট। তাছাড়া নাট্যজগৎ থেকে তরুণ বয়সে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার জ্বালা তাঁর অন্তর থেকে তখনও যায়নি। সে সময়ের কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "আমার জীবনে সেদিন একটা জয়ের দিন। আর্ট থিয়েটারে আমার প্রথম নাটক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তিনি নাটক না পড়েই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। ক্ষোভে দুঃখে নাটকখানিকে আগুনের মুখে সমর্পণ করেছিলাম।"

কালিন্দীর পর শুরু করলেন নতুন নাটক—'মুটু মোক্তারের সওয়াল' গল্প অবলম্বনে লিখলেন 'দুই পুরুষ'। মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে—কালিন্দীর ঠিক এক বছর পর।

'দুই পুরুষ' মঞ্চস্থ হবার পূর্বে তারাশঙ্কর সজনীকান্ত দাসকে নাটকটি পড়ে শোনান, "সজনীকান্ত বললেন পড়, ফিন পহেলে সে—আবার নতুন করে আরম্ভ করলাম। প্রথম অঙ্কের শেষ দিকে আসতেই সজনীকান্ত সহসা সোজা হয়ে বসে বললেন, তাই তো হে, এ তো বিচ্ছিরি কাণ্ড করেছ, শক্ত ব্যাপার করেছ। মুখের দিকে চাইলাম। সজনীকান্ত বললেন, আমাদের দেশে নাটক তো বড় একটা সাহিত্য হয় না! তুমি দেখছি তাই করেছ। এ রকম করে তো শোনা চলবে না। ভাল করে শুনতে হবে। পড়। পড়ে যাও।

পড়া শেষ হতেই খাতাখানি হাত থেকে নিয়ে বললেন, আসছে মাস থেকে 'শনিবারের চিঠি'তে বেরুবে।"

শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "সাহিত্য গুণান্বিত রচনায়, চরিত্রানুগ ভূমিকাভিনয়ে এবং কলাকৌশল প্রয়োগনৈপুণ্যে তারাশঙ্করের 'দুই-পুরুষ' বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় কীর্তি।"

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন ভারতবর্ষের দোরগোড়ায় এসে পড়েছে। রেঙ্গুনের পতন হয়েছে। কলকাতার মানুষ ভীত হয়ে উঠেছেন। দলে দলে কলকাতা ত্যাগ করে অন্যসব স্বাস্থ্যকর জায়গাতে বাস শুরু করেছেন। পুরুষেরা মধ্যে মধ্যে কলকাতা আসেন—অথবা থাকেন। 'ড্যাঞ্চি' শব্দটা তখন শুনতে শুরু করেছি। বরানগরের বাড়ি বন্ধ করে আমরাও লাভপুর চলে গেলাম। আমাদের যাওয়ার অবশ্য অন্য কারণও ঘটেছিল। আমার বোন গঙ্গার বিয়ে ঠিক হয়েছে ২৪শে বৈশাখ ১৩৪৯। সুতরাং ১৩৪৮ সালের চৈত্র মাসে আমরা লাভপুর চলে গেলাম। এই সময়ের কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছেন, "১৩৪৮ বাংলা সাল গত হল। ইংরিজী ১৯৪২ সালের এপ্রিল, ১৩৪৯ সাল। ভারতের ইতিহাসের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। ইতিহাসের মাইলপোস্ট। ভারতবর্ষের মধ্যে আবার বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪২—

১৩৪৯ অধিক গুরুত্বপূর্ণ। আগস্ট বিপ্লব, সাইক্লোন,—ছুটো একসঙ্গে। ১৯৪২—১৩৪৯ আমার জীবনেরও মাইলপোস্ট।" অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নলহাটীতে বীরভূম সাহিত্য সম্মেলন আহ্বান করেছেন। মূল সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত। তারাশঙ্কর সাহিত্যশাখার সভাপতি। তারাশঙ্কর লিখছেন—"সে সাদর নিমন্ত্রণ পেয়েছিলাম ১লা বৈশাখ তারিখেই। শ্রীকুমার বাবু আমার দেশের লোক। এর আগেও তাঁকে দেখেছি। স্বল্প পরিচয়ও আছে। সে শুধু পরিচয়ই—দূর থেকে সবিস্ময়ে তাঁকে দেখেছি।···

তাই তাঁর নিমন্ত্রণে যেমন আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলাম, তেমনি শঙ্কিত হয়েছিলাম। সেই শঙ্কা দ্বিগুণিত বা আরও বহুগুণে গুণিত হয়ে উঠল অতুল গুপ্ত মশায়ের নাম শুনে। তখন পর্যন্ত গুপ্তমশায়কে চোখে দেখি নি। নাম শুনেছি। শুনেছি নানা কথা। এত বড় তীক্ষ্ণবুদ্ধি সমালোচক, এবং এমন সূক্ষ্ম রস-রসিক ব্যক্তি আর নেই। রবীন্দ্রনাথ তখন নেই। আরও শুনেছি অতি বড় আধুনিক তিনি। ···এই মানুষের সম্মুখে তাঁদের সঙ্গে এক সারিতে বসে কি বলব আমি? বসবই বা কোন্ অধিকারে? তাছাড়া আমার বক্তব্য শুনে তাঁরা যদি বক্র-হাস্য করেন?" শ্রীকুমার বাবুকে চিঠি লিখলেন তারাশঙ্কর—"আপনারা যোগ্যতর ব্যক্তিকে সাহিত্য-শাখায় সম্মানিত করুন। শৈলজানন্দ আছে, সজনীকান্ত আছেন, তাঁহারাও বীরভূমের সন্তান।"

উত্তর এল—"আপনার কুণ্ঠা কিসের? সম্মান আপনার প্রাপ্য হইয়াছে; আমরা বিচার করিয়াই আপনাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

এই সময়টা তিনি বিশেষ কষ্ট পাচ্ছিলেন শারীরিক কারণে—মেয়ের বিয়ের আগে থেকেই অসুস্থ ছিলেন। তার উপর কোমরে কুইনাইন ইনজেকশন নিয়ে একেবারে খোঁড়া হয়ে পড়লেন। তার সঙ্গে দেখা দিল অর্শ—ভয়ানক যন্ত্রণা। এরই মধ্যে গেলেন নলহাটী। সেখানে তারাশঙ্করের পরিচয় দিলেন অতুল গুপ্ত। সভাপতির ভাষণে বললেন, 'বঙ্গসরস্বতীর খাসতালুকের মণ্ডল প্রজা'। এত যন্ত্রণার মধ্যেও তারাশঙ্কর অতীব আনন্দিত হয়ে লাভপুরে ফিরে এসেছিলেন।

* * *

বাড়ি ফিরেই দুখানি চিঠি পেলেন তিনি। প্রথম চিঠিতে নাট্যভারতীর কর্তৃপক্ষ লিখেছেন,—'তুই পুরুষে'র মহলা চলছে। তিনি যেন সত্বর কলকাতা আসেন। অন্যটি লিখেছেন, যম দত্ত, তিনি জানিয়েছেন, বরানগরের বাড়িতে তালা ভেঙে চোর ঢুকেছিল। সুতরাং প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও অর্শের যন্ত্রণা উপেক্ষা করেই তারাশঙ্কর রওনা হলেন কলকাতা, মেজভাই দুর্গাশঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কল-

কাতাতে কোথায় উঠবেন? বরানগর অনেক দূর, তাছাড়া রান্নাবান্না আছে, সেবা-যত্নেরও প্রয়োজন আছে। সুতরাং এসব বিবেচনা করেই তারাশঙ্কর আবার গিয়ে উঠলেন তাঁর সেই পুরোনো ১।১এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে—যেখানে তাঁর স্নেহময়ী দিদি আছেন, কন্যাসমা পারুল আছে।

উঠলেন বাগবাজারে। প্রসন্ন হাসিমুখে সহোদরার মতই তারাশঙ্করকে গ্রহণ করলেন তিনি। তারাশঙ্করের কোন সংকোচ রইল না ওঁদের আহ্বানের আগ্রহে।

'দুই পুরুষ' মঞ্চস্থ হল। কাগজে কাগজে অকুণ্ঠ প্রশংসা। আনন্দবাজার লিখলো: "বাংলার রঙ্গমঞ্চের রুদ্ধপ্রায়গতি নতুন গতি পেল এই নাটকে এবং সেই গতির সঙ্গে বাংলার জাতীয় জীবনের গতির নিবিড় একাত্মতা আছে। বাঙালীর জাতীয় জীবনের সত্য ও সার্থক নাটক। তারাশঙ্কর নাট্যকার হিসাবে বিপুল সম্ভাবনা ও শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন।"

'দুই পুরুষে'র তৃতীয় রাত্রির অভিনয় দেখে তারাশঙ্কর ফিরে গেলেন লাভপুরে।

বরানগর বাড়িতে আবার একবার চোরে তালা ভাঙলো। বাড়িতে মূল্যবান বস্তু কিছুই ছিল না। সামান্য যেটুকু সৌখিন জিনিসপত্র ছিল তা একখানা ছোট ঘরে বন্ধ করে—তার দরজা জানালা সিমেণ্ট দিয়ে গাঁথনি করে বন্ধ করে এসেছিলেন। সুতরাং দুবারই চোরেরা কোন সুবিধাই করতে পারেনি। এই খবর পেয়ে আমার মাতৃদেবী অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁর ধারণা হল চোররা দুবার তালা ভেঙে কিছু না পেয়ে অবশ্যই ক্রুদ্ধ হয়ে আছে, সুতরাং পরের বারে তারা সুযোগ বুঝে নিশ্চয়ই এবার গলা কেটে দিয়ে যাবে।

অতএব ও বাড়ি এখন আর নিরাপদ নয়—ওখানে তিনি আর যাবেন না। সুতরাং তারাশঙ্কর স্থির করলেন—থাকুক বরানগরের বাড়ি যেমন পড়ে আছে। এখন গিয়ে উঠবেন ১।১এ আনন্দ চ্যাটার্জি লেন, বাগবাজার। সে বাসা খালিই পড়ে আছে। উনি লিখছেন—

"তাই এসে উঠলাম। বাড়ির মালিক, তাঁর স্ত্রী—আমাদের দিদি আপনজনের মতই গ্রহণ করলেন। শ্রদ্ধেয় যামিনী দাদা হেসে বললেন, ভাল করলেন ভাই। জনশূন্য কলকাতা, সন্ধ্যে হলে ঠুঙি পড়ে জুজুবুড়ির মত ভয় দেখায়। এখন এখানেই ভাল, একবছর গেছেন ভাল লাগছিল না।"

দ্বিতীয়বারে আমরা বাগবাজারে এলাম ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে এবং এখানে আমাদের বাসের মেয়াদ এবারে বেশ দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

সেই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ এক মহাসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে। তার কিছু চিত্র পাওয়া যাবে তারাশঙ্করের লেখায়।

লিখেছেন, "একদিন শনিবারের চিঠির আপিসে এলেন অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু। পিঠে বাঁধা হ্যাভারস্যাক। পরনে ঢিলে পায়জামা, গায়ে পাঞ্জাবি, পায়ে যতদূর মনে পড়ছে রবারসোল ক্যাম্বিসের জুতো। বললেন এ. আই. সি. সি-র প্রোগ্রাম আনতে যাচ্ছি। আগস্ট মাস, নেতৃবৃন্দ সবে ধরা পড়েছেন কি পড়বেন এমন দিন।

'ভারতবর্ষে' 'গণদেবতা' নামে উপন্যাস তখনও ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে চলেছে, শেষ হয়নি। গণদেবতা যখন লিখতে শুরু করি তখনই মনে পরিকল্পনা ছিল, বইখানির নাম হবে 'গণদেবতা', তার দুটি ভাগ থাকবে—প্রথমভাগ 'চণ্ডীমণ্ডপ', দ্বিতীয়ভাগ হবে 'পঞ্চগ্রাম'। চণ্ডীমণ্ডপ প্রেসে দেবার সময় মনে হল, যা বলতে চেয়েছিলাম, তা ঠিক বলা হয় নি। মাসে মাসে কিস্তিবন্দিতে লিখতে গিয়ে গ্রন্থ শিথিল হয়েছে, গল্প এলোমেলো হয়েছে ; বক্তব্য স্পষ্ট হয় নি। তখন পাঁচ ফর্মা—আশি পৃষ্ঠা ছাপা হয়ে গেছে। আমি প্রকাশক গিরীনবাবুকে বললাম, বাকি কপি প্রেস থেকে ফিরিয়ে আনুন। ও ছাপা হবে না।

শঙ্কিত হয়ে গিরীনবাবু বললেন, তা হলে ?

বললাম, বাকি আমি নতুন করে লিখব। আপনি ভয় পাবেন না। আপনার প্রেসের কাজ বন্ধ হবে না। আমি ঠিক চালিয়ে দেব।

বসলাম লিখতে। তখন শরীরে ছিল বল, মনে ছিল অফুরন্ত উৎসাহ। লিখে যেতে লাগলাম। গিরীনবাবু রোজ আসতেন দশটার আগে, কপি তৈরী থাকত, নিয়ে যেতেন।

এই সময়েই 'কবি' পুস্তকাকারে বের হল।…

'কবি' বই উৎসর্গ করেছিলাম পরম শ্রদ্ধেয় সাহিত্যাচার্য মোহিতলালকে।… কয়েকদিন পরেই মোহিতলালের পত্র পেলাম। দীর্ঘ পত্র। অকুণ্ঠিত প্রশংসা করেছিলেন।

…সেদিন মনে আছে, কলকাতায় আগস্ট বিপ্লবের আগুন জ্বলে উঠেছে। ফড়েপুকুর থেকে কর্নওয়ালিস স্ট্রীটে ঢুকবার মুখেই শুনলাম গুলির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দ করে চলে গেল খাস ইংরেজ সেপাই বোঝাই মিলিটারী লরি। থমকে দাঁড়ালাম। ফিরতে হলে কর্নওয়ালিস স্ট্রীট পার হয়ে পশ্চিম পাড়ে। তখনও মধ্যে মধ্যে ফট ফট শব্দে রিভলভারের আওয়াজ হচ্ছে। অতি সন্তর্পণে ফড়েপুকুরের মোড়ে ফ্রেণ্ডস কেবিনের দেওয়ালের আড়ালে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, ট্রাম ডিপোর সামনে ডাস্টবিন ময়লাগাড়ি দিয়ে তৈরী ব্যারিকেড সরাচ্ছে তারা এবং মধ্যে মধ্যে রিভলভার উঁচিয়ে ফট করে একটা দুটো ফায়ার করছে। লরির গর্জন উঠল। আমি ছুটে এসে বাঁ পাশের একটা সরু গলিতে ঢুকলাম। সারকুলার রোড হয়ে মোহনলাল স্ট্রীট হয়ে শ্যাম-

বাজারের বাজারটা বেড় দিয়ে বাড়ি ফিরেছিলাম সেদিন।

বাড়িতে তখন গিরীন সোম বসে। গণদেবতার কপি চাই। কপি তৈরী ছিল। তখন হাতের জোর ছিল অসাধারণ। অন্তত দিনে এক ফর্মা দেড় ফর্মা অনায়াসে লিখে যেতে পারতাম। গণদেবতার ভাবনা কল্পনা সবকিছু সুসম্পন্ন আয়োজনের মত মনের মধ্যে থরে থরে সাজানো ছিল।

...'গণদেবতা' বের হয়েছিল ষষ্ঠীর দিন রাত্রে। কপি শেষ করেছিলাম চতুর্থীর সন্ধ্যায়। বিকেলবেলাতেই শেষ করেছিলাম। শেষ করে বেড়াতে বেরিয়েছিলাম, হঠাৎ পথ থেকে আবার ফিরে এসেছিলাম; আবার মনে নতুন কল্পনা গুঞ্জন করে উঠেছে। এসেই আবার বসে নতুন করে লিখলাম।...

লেখা শেষ করে কেঁদেছিলাম। ওই কটি লাইনের মধ্যে সেদিন ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের আহ্বানধ্বনি আমার অন্তরকে যেভাবে বিচলিত করেছিল, সেই ভাবটুকু ফুটে রয়েছে। সেদিন আমিও ওইভাবে হাত বাড়িয়ে ভগবানকে মনে মনে ডেকে-ছিলাম।...বই বের হয়েছিল ষষ্ঠীর সন্ধ্যায়।...সপ্তমীর সকালে উঠে রওনা হলাম লাভপুর। বাড়ির ছেলে-মেয়েরা আগেই চলে গেছেন।...১৯৪২ সনের সপ্তমীর প্রভাত। বঙ্গোপসাগরে তখন প্রবল তাণ্ডব। কলকাতার আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। এলোমেলো বাতাস, রিমঝিম বৃষ্টি। কিন্তু আসন্ন প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ তখনও কল্পনার বাইরে। তবু যেন কেমন মনে হয়েছিল আমার।...

বোলপুরে ট্রেন যখন পৌছল, তখন বৃষ্টি হচ্ছে। সজনীকান্ত বোলপুর স্টেশনে দাঁড়িয়েছিলেন আমার জন্যে। তিনি রেঙ্গুন পতনের কাল থেকেই বোলপুরে একটা পাকা আড্ডা করেছিলেন।...আমি বলেছিলাম, সপ্তমীর দুপুরের ট্রেনের সময় নিশ্চয় যেন স্টেশনে থেকো। বই দিয়ে যাব।...

বাড়ি পৌছলাম একটার সময়।...ওদিকে সপ্তমীর পূজাশেষে তখন ভোগের পর আরতি হচ্ছে। ঝড় এল শেষ রাত্রে, তার সঙ্গে বর্ষণ। সকালে অষ্টমী পূজার আয়ো-জন সব ভেসে যাবে বলে মনে হল। বাড়ির পিছনে খিড়কির পুকুরপাড়ে তালগাছ উপরে পড়ল, শ্রীপতিবাবুর মাটির ঘর বসে গেল। রাস্তার উপর এককোমর জল বেয়ে চলেছে। কলকাতায় সাইক্লোন প্রবল হয়েছিল সপ্তমীর সন্ধ্যায়, আমাদের ওখানে প্রবল হল সপ্তমীর শেষ রাত্রে অষ্টমীর প্রভাতে; সারাদিনের শেষে অষ্টমীর প্রায় এক প্রহর রাত্রে ঝড়ের বেগ কমল।"

ঝড়ে, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে, বন্যায় ভেসে গেল মেদিনীপুর আর পূব বাংলার অনেক জায়গা। আগস্ট আন্দোলনের চূড়ান্ত রূপ ফুটে উঠেছিল মেদিনীপুরে। মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত-ছাড়ো' সিংহনাদের প্রতিধ্বনি সেদিন মেদিনীপুরের প্রতিটি

গৃহে অনুরণিত হয়ে উঠেছিল। বহু থানা বিপ্লবীরা দখল করে ফেলেছিল—প্রতিষ্ঠা করেছিল স্বাধীন-সরকার। তারাশঙ্করের সাহিত্যজীবনে লিখছেন, "আগস্ট বিপ্লবে কলকাতায় খুব বেশী কিছু হয়নি। কিন্তু মেদিনীপুর অবিস্মরণীয় সংগ্রাম করেছে। যুদ্ধ করেছে, মরেছে, তখনও যুদ্ধ করছে। প্রচণ্ড সাইক্লোনে মেদিনীপুর ভেসে গেছে, ভেঙে গেছে; ইংরেজের রাজকর্মচারী তিনদিন কোন সাহায্য দেয়নি। বলেছে, এ শাস্তি। উপযুক্ত শাস্তি। বিপ্লবের সময় কলকাতার রাস্তায় কবি বিজয়লালকে মাথায় গান্ধী টুপি পরার অপরাধে প্রহারে জর্জরিত করে দিয়েছে। বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে যে কোন মানুষকে গুলি করে মারলে পুলিস বা সৈনিকদের কিছু হয় না, এমনি সময় তখন।"

এর পরেই দেখা দিল মনুষ্যরচিত ভয়াবহ খাদ্যাভাব—দুর্ভিক্ষ। অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক রাস্তায় মরে পড়ে রইল। সেই সময়ের কথা বলতে গিয়ে তারাশঙ্কর তাঁর 'মন্বন্তর' উপন্যাসে লিখছেন,—"দোকানে ভাঙ্গানী মেলে না। ট্রামে না বাসে না। খুচরার অভাবে গরীবের জিনিস কেনা বন্ধ হয়েছে। গোটা টাকার জিনিস না নিলে খুচরোর অভাবে জিনিস কেনা হয় না। অবশ্য দু চার পয়সায় জিনিসও কিছু কেনা যায় না। চাল ত্রিশ টাকা। আটা ত্রিশ থেকে ছাড়িয়ে গেছে, তাও মেলে না। চিনি বাজারে নেই। ত্রিশ-চল্লিশ টাকার কেরানীর ঘরে অর্ধাশন আরম্ভ হয়েছে। চারিদিক হতে অনাহারে শীর্ণ নরনারী ছুটে আসছে দলে দলে এই মহানগরীতে দুমুঠো আহার্যের প্রত্যাশায়। দিনে দোরে দোরে ঘুরে বেড়ায়—চারটি ফেন-ভাত দেবা মা? মাগো! মা! মাগো!

—দুটি ভাত দাও মা! একমুঠো খেতে দাও মা! মা—মা গো! বাবা গো!

—ভাত! দুটো ভাত!

অবসর সময়ে ফুটপাথে বসে থাকে সারি দিয়ে। জীর্ণ, শতচ্ছিন্ন কাপড়ে, প্রায় বিবস্ত্র। কঙ্কালসার চেহারা। তৈলহীন জটাবাঁধা রুক্ষ চুল। কঙ্কালসার দেহে শুষ্ক স্তনে মুখ দিয়ে চিৎকার করছে প্যাঁকাটির মত ছেলে, পাশে উলঙ্গ কয়েকটা বসে বিস্মিত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে দেখছে মহানগরী। বিরাট প্রাসাদগুলির শীর্ষদেশ, চলন্ত মোটরের সারি। বসে আপনাদের মধ্যে ঝগড়া করে গল্প করে, মানুষ দেখলে ভিক্ষা চায়। সারি সারি মানুষ। শীতের রাত্রে অনাবৃত ফুটপাথের উপর পড়ে থাকে। মোটরের তলায় চাপা পড়ে। দু'একটি অনাহারেও মরতে আরম্ভ করেছে। সেদিন একটা বাজারে ডাস্টবিনের পাশে একজন পুরুষ মরে পড়ে ছিল—কাল একটা ওষুধের দোকানের সামনে—একটা পুরুষ ঠেস দিয়ে বসে থাকতে থাকতে মরেছে। মৃত্যু-পাণ্ডুর মুখে স্থির দৃষ্টি—মুখখানা হাঁ হয়ে দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে।...অবস্থা সবচেয়ে

অসহনীয় হয়ে ওঠে, যখন ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার রাত্রে পথচারী হতভাগ্যরা বাড়ির দুয়ারে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে—চারডি খেতে দাও মা! চারডি এঁটো-কাঁটা! দুটো ফেন-ভাত! অন্ধকারের মধ্যে মানুষকে দেখা যায় না, শোনা যায় শুধু সকরুণ ক্ষুধার্ত চিৎকার। সমস্ত শরীর শিউরে ওঠে, মনে হয় চিৎকার উঠছে বুঝি মাটি থেকে। মহানগরী যেন চিৎকার করছে—ম্যয় ভুখা হুঁ!—ম্যয় ভুখা হুঁ।"

এরপর ১৯৪২ সালের ২০শে ডিসেম্বর কলকাতায় বোমা পড়ল। ঐ দিন 'দুই-পুরুষে'র শততম অভিনয় রাত্রি ছিল। আমরা সকলেই নাট্য-ভারতীতে অভিনয় দেখতে গেছি। তারাশঙ্কর লিখছেন, "রাত্রি নটা কি সাড়ে নটা—চতুর্থ অঙ্কের অভিনয় সবে শুরু হয়েছে, এমন সময় সমস্ত মহানগরী যেন ভয়ার্ত ক্রন্দনে কেঁদে উঠল। বেজে উঠল সাইরেন।...মূক হয়ে গেছে সবাই। কথা নেই, শুধু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ।...হঠাৎ কে একজন, তার সঙ্গে আরও কয়েকজন বললে, হাউইয়ের মত আকাশে কি যেন ফাটছে।...সঙ্গে সঙ্গে দু-তিনটে শব্দ হল। তিনটে কি চারটে। সকলে চমকে উঠল—ও কি?...অল ক্লিয়ার হল রাত্রি প্রায় বারোটার সময়। ওঃ, সে কি মুক্তি!...সকালে উঠে কাগজে দেখলাম কলকাতায় জাপানী বিমান আক্রমণ।...

একুশে রাত্রি নির্বিঘ্নে কেটেছে। সাইরেন বাজে নি।...

সেদিন বাইশে ডিসেম্বর, তিথিতে বোধহয় ত্রয়োদশী।...বাড়ি ফিরে সেকালে সকাল সকাল খেয়ে শোয়ার তাগিদ ছিল বড়। ঘুমুলেই নিশ্চিন্ত। ঘুমিয়েই ছিলাম, হঠাৎ বাড়ির দোরে অমৃতবাজারে ফিট করা সাইরেনটা বিকট শব্দে ককিয়ে কেঁদে উঠল। জেগে উঠলাম ধড়ফড় ক'রে। জাগাতে কাউকে হ'ল না। বিবর্ণ মুখে বিহ্বল দৃষ্টি নিয়ে উঠে বসল সব।...দোতলার সিঁড়ির মাথায় জটলা হচ্ছিল।...ঠিক সেই সময় স্পষ্ট শব্দ উঠল শূন্যপথে—গুর গুর—গুর গুর...মনে হল, ক্রমশ কাছে আসছে। গঙ্গার দিক থেকে পূর্ব মুখে।

ওই—ওই—বলতে বলতে শূন্যলোকে বিদ্যুৎ চমকের মত আলো চমকে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বিস্ফোরণের মত শব্দ।...

কে যেন বললে, দূর এই জাপানী বোমা!

কথা তার শেষ হল না—একটা প্রচণ্ড দীপ্তিতে আকাশ ঝলসে গেল, মুহূর্তে প্রচণ্ড বিস্ফোণের শব্দে বাড়িঘর জানলা দরজা সব ঝন ঝন করে উঠল। কাছেরই একটা বিরাট বড় বাড়িতে ছেলেমেয়েরা কোলাহল করে কেঁদে উঠল। আমাদের সকলে আতঙ্কে চমকে উঠল। অস্ফুট আর্তনাদ করলে।"

বোমাটা পড়েছিল হাতিবাগান বাজারে। পরের বছর ১৩৫০ সালের ১৪ই

ফাল্গুন (১৯৪৩ ফেব্রুয়ারী) তারাশঙ্কর এই বাড়ি থেকে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সনৎকুমারের বিবাহ দিলেন।

এরপর আরও দু-তিনটে বছর কেটে গেছে—ফ্যাসিবিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুনাম দুর্নাম দুই-ই পেয়েছেন। বিমুক্ত হয়েছেন সেখান থেকে। তারই মধ্যে এসে পড়ল ১৯৪৬ সালে কলকাতায় নরমেধ যজ্ঞ—হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। বাগবাজার থেকেই দেখলাম এই মনুষ্যনিধন যজ্ঞ। 'কলকাতার দাঙ্গা ও আমি'তে তারাশঙ্কর লিখছেন, "কালো কলকাতা—রক্তাক্ত কলকাতা—নারকীয় কলকাতা—কোনও নামে অভিহিত করে মন শান্ত হচ্ছে না; কথার কারবারীর পুঁজি ফুরিয়ে গিয়েছে। উপযুক্ত নাম—এই দিনরাত্রিগুলিকে চিহ্নিত করার মত নাম খুঁজে পাচ্ছি না। কলকাতার আকাশ ধোঁয়ায় ছেয়ে গিয়েছিল—পেট্রোলের সাহায্যে পাকা বাড়ি পুড়ে গেল, পণ্যসম্ভার-ভরা দোকান লুট হয়ে গেল, কাঠকাঠরা আসবাব আগুনে ছাই হয়ে গেল—সাদা বা ধূসর ছাই নয়, কালো আঙারের স্তূপ, মূল্যবান কাঠের দগ্ধাবশেষ। আর্ত নরনারীর মর্মন্তুদ চিৎকারে আর্ত হয়ে উঠল কলকাতার বায়ুস্তর—অনন্তকালের ইথার-তরঙ্গে একটি অনুচ্ছেদ রচনা করে রাখলে।...রক্তে মাটি ভেসে গেল, পোড়া ছাই সে রক্ত শুষে নিলে। মায়ের কোল থেকে ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে ফেলে দিলে আকাশস্পর্শী অট্টালিকার ছাদ থেকে—পাথরে বাঁধানো রাজপথে। নারীকে ধর্ষণ করে ধারালো অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড করে কাটা হল। অসহায় শান্তিপ্রিয় গৃহস্থকে হত্যা করলে। লাঠির আঘাতে কুকুরের মত মারলে নিরীহ গরিবের দলকে।"

তিনি আক্ষেপ করে লিখলেন,—"কতিপয় স্বার্থান্বেষী রাজনীতিকের আপনার সম্প্রদায়, সমাজ এবং রাজনৈতিক দলের মধ্যে আসন কায়েমী করবার জন্য এটা একটা সামন্ততান্ত্রিক নীতি।"

দাঙ্গা একটু থামলে ঐ সব দেখে শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে কিছু দিনের জন্য লাভপুর চলে গেলেন। সামান্য কয়েকটা দিন দেশের অবস্থা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আবার কলকাতা ফিরে এসেছিলেন। তবে সঙ্গে নিয়ে এলেন ম্যালেরিয়া—সে কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, "কলকাতায় ফিরে যখন এলাম তখন এত দুর্বল যে চলাফেরাও কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এবং তার সঙ্গে প্রেসারের গোলমাল প্রথম দেখা গেল। ৯৮এ নেমে গেল কয়েকদিন।"

মহাকালের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা একদিন থামল। হিন্দু মুসলমানে কোলাকুলি করলে, কিন্তু যা ঘটবার তা ঘটে গেল। বঙ্গদেশ হল দ্বি-খণ্ডিত।

*　　*　　*

ইংরেজীর ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে—১৩৫৪ সালের ৮ই শ্রাবণ তারাশঙ্কর তাঁর পঞ্চান্ন বৎসরে পদার্পণ করলেন। এইদিনে সাহিত্যিক শিল্পী ও সাহিত্যরসিক বন্ধুরা একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে তারাশঙ্করকে অভিনন্দন জানান।

আর কয়েকটা দিন পরেই এল ১৯৪৭ সালের (বঙ্গাব্দ ১৩৫৪) ১৫ই আগস্ট—স্বাধীন ভারতবর্ষের পুণ্য জন্মলগ্ন।

তারাশঙ্কর এক নিবন্ধে লিখেছেন,—"আজ এই মুহূর্তকে প্রণাম করি ভূমিষ্ঠ হয়ে। ললাটে লাগবে যে ধরিত্রীর স্পর্শ চিহ্ন, তা থাক আমার ললাটে অক্ষয় হয়ে, তারই মধ্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাক ১৫ই আগস্টের প্রভাত। আবার আরম্ভ করি যাত্রা। কাঞ্চনজঙ্ঘার শীর্ষে হবে যে অভিনব সূর্যোদয়—তাকে আবাহন করবার পথে যাত্রা। আজিকার প্রভাত সমীরস্পর্শে সঞ্জীবনী শক্তিকে অনুভব করছি। সঞ্জীবিত দেহমন নিয়ে যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হয়েছি। 'নূতন উষার স্বর্ণদ্বার' উন্মোচিত হয়েছে। আজ প্রশ্ন—সেই মুক্ত দ্বারপথে হে সূর্যদেবতা, তোমার আবির্ভাবে আর বিলম্ব কত, যে সূর্য আমাদের অহরহ আহ্বান জানিয়ে বলবে, আলোক-উৎস সন্ধানী বিহঙ্গ। এখনই অন্ধ, বন্ধ করো না পাখা ?"

তারাশঙ্কর কিন্তু এই দিনটিতে কলকাতায় ছিলেন না। তাঁকে যেতে হয়েছিল লাভপুরে জন্মভূমির ডাকে। সঙ্গে আমিও ছিলাম ওঁর সঙ্গে। আমরা ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যাতে গিয়ে লাভপুরে পৌঁছুলাম।

তাঁর কালান্তর উপন্যাসেরও উপজীব্য তাই। কালান্তরের নায়ক তারাশঙ্কর নিজেই বলেছেন--"তার আত্মা আমারই আত্মা। সে সুদীর্ঘকাল পর ফিরে এসেছে তার গ্রামে। এই গ্রাম থেকে একদা সে দেশকে ভালবাসার অপরাধেই চলে গিয়েছিল।

শুধু রাজশক্তির অত্যাচারেই নয়, এই গ্রামের যারা ধনী, জমিদার, ইংরেজ সাম্রাজ্যের পোষক তাদের চক্রান্তেও বটে। দীর্ঘদিনে সে-জীবন সাধনায় সার্থক হয়েছে—সে এখন প্রতিভাবান সাহিত্যিক, তার সাহিত্য এই স্বাধীনতা যুদ্ধের পটভূমিতে মানুষের জীবনসঙ্গীত, সে সাহিত্য দেশের অন্তর জয় করেছে, স্পর্শ করেছে, এতকাল পরে ১৯৪৭ সনের ১৫ই আগস্ট সে ফিরে আসছে তার গ্রামে।"

দেশ স্বাধীন হল—১৯৪৭ সালেই উনি সম্মানিত হলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে শরৎস্মৃতি পদক ও পুরস্কার দিলেন। এবং সরস্বতীর এই একনিষ্ঠ সাধকের প্রতি লক্ষ্মীরও অকৃপণ দাক্ষিণ্য বর্ষিত হতে শুরু করেছে তখন।

এই বছরেই অনুষ্ঠিত প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কলিকাতা অধিবেশনের তিনি উদ্বোধন করেন এবং বম্বেতে অনুষ্ঠিত রজতজয়ন্তী অধিবেশনে সাহিত্য-শাখার

সভাপতিত্ব করেছিলেন। এই বছরেই টালাপার্কে জমিও কেনা হল। ১৯৪৮ সনের ৩০শে জানুয়ারী ডায়েরীতে কয়েকটি লাইন লিখে রেখেছেন,—"মহাত্মাজী অহিংসার বেদীমূলে হিংসায় উন্মত্ত ভ্রান্ত আদর্শবাদীর আক্রমণে জীবন উৎসর্গ করেছেন। হে শান্ত, হে শুভ্র, হে অনন্তপুণ্যের মূর্তপ্রতীক, তোমাকে প্রণাম। হে জিতেন্দ্রিয়, হে জিতহার, হে জিতসুখদুঃখ, হে অজেয়, তোমাকে প্রণাম। হে শশাঙ্করেখানিভ মধুর হাস্যময়, হে মধুতুল্য মধুরভাষী, তোমাকে প্রণাম। তোমার ক্ষয় নেই লয় নেই। অশান্তি ব্যাধিজর্জরিত পৃথিবীতে তুমি শান্তির অমৃতপাত্র হাতে ধন্বন্তরীর মতো আবির্ভূত হয়েছিলে আমাদের মধ্যে; আমাদের ভ্রান্তি সত্ত্বেও তুমি আমাদের কর্মে আমাদের মর্মে আমাদের ধর্মে অক্ষয় হয়ে অবস্থান কর বুদ্ধের মতো। তাঁরই মতো সঞ্জীবিত হয়ে ওঠো নিত্যপ্রভাতে প্রতি মুহূর্তে।"

আমাদের আনন্দ চ্যাটার্জি লেনে থাকার মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে।

এখানকার বাড়ি ছাড়বার আগে ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ বাংলার ১৩৫৫ সালের ২২শে ফাল্গুন আমারও বিবাহ দিলেন পিতৃদেব। এরই মাসখানেক পরে ঘটল একটি দুঃখজনক এবং মারাত্মক বেদনাদায়ক ঘটনা। তারাশঙ্কর হাওড়ায় লাঞ্ছিত হলেন সেখানকার সাহিত্য সম্প্রদায়ের কিছু লোকের হাতে। ঘটনা ঘটেছিল সন্দীপন পাঠশালার সিনেমা রূপান্তর নিয়ে। এতে সাহিত্য সম্প্রদায়ের কেউ কেউ অপমানিত বোধ করেন এবং তাঁকে জুতো ও ইট দিয়ে প্রহার করে তাঁর ঠোঁটটা দু ফাঁক করে দিয়েছিল। আইডেন্টিফিকেশন প্যারেডে তারাশঙ্কর তাদের চিনেও ছিলেন কিন্তু সনাক্ত করেননি—তারিখটা ছিল ১৩৫৫ সালের ২৭শে চৈত্র রবিবার—ইংরাজী ১০ই এপ্রিল ১৯৪৯। পরের বছর অর্থাৎ ১৩৫৬ সালে রথযাত্রার দিন—১৯৪৯ সালের জুলাই মাসে আমরা টালার বাড়িতে গৃহপ্রবেশ করলাম—ঠিকানা ১৭১ সি. সি. ও. এস.—কলিকাতা-২।

*　　*　　*

১৯৪৯ সালের রথযাত্রার দিন থেকে তারাশঙ্কর তাঁর মহাযাত্রার দিন পর্যন্ত দীর্ঘ তেইশ বছর টালাপার্কের এই বাড়িতে কাটিয়ে গেছেন। পরবর্তীকালে টালাপার্ক নাম পরিবর্তন করে, তাঁর নামে রাস্তার নাম হয়েছে 'তারাশঙ্কর সরণী'। নতুন বাড়িতে এসে তাঁকে আমরা বড় বিমর্ষ দেখতাম—অথচ তখন তাঁর উপর একের পর এক সম্মান বর্ষিত হয়ে চলেছে। অবশ্য এর একটা প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। বাড়ি করতে গিয়ে তিনি ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। পাওনাদারদের তাগাদা তাঁকে অশান্তি দিয়েছে অনেক।

১৯৫০ সালের জুন মাসের প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে একদিন বললেন—কাল

বোধহয় পিসীমা চলে গেলেন—যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। খবরটা ঠিকই। কারণ দুপুরে লাভপুর থেকে খবর এল, তারাশঙ্করের ধাত্রীদেবতা—তাঁর পিসীমা দেহত্যাগ করেছেন আগের দিন রাত্রে। এই ধরনের স্বপ্ন উনি ইদানীং দেখতেন। এ সম্পর্কে তারাশঙ্করের লেখা থেকে জানা যায়—"তখন (১৯৪৪-৪৫) আমি প্রাণপণে বিজ্ঞানবাদী এবং নাস্তিকতায় বিশ্বাসী।" তারপর ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত নাস্তিক্যবাদ ও আস্তিক্যবাদের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছেন। এই দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে উপস্থিত হয় ওই সব স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমে। আট বৎসর বয়সে পিতৃহীন তারাশঙ্কর পঞ্চাশোত্তর বয়সে প্রায়ই স্বপ্নে দেখতেন তাঁর পিতৃদেবকে—তিনি আসনে বসে পূজা-উপাসনা করছেন। আর একদিন দেখলেন পিতৃদেব উপাসনা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন এবং তাঁকে বললেন, বাবা চণ্ডীটি তুমি নিত্য পাঠ করো তো। বলেই তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তিনি লিখেছেন, "স্বপ্ন আমার জীবনে বড় বেশী প্রভাব ফেলে। আমি ভেবে দেখি, কেন এ স্বপ্ন দেখলাম। আমার মা তখন এখানে ছিলেন, তিনিও খুব ভোরে ওঠেন। তাঁকে গিয়ে স্বপ্নের কথাটা বললাম। মা বললেন, বেশ তো বাবা, তুমি তো বই অনেক রকম পড়ে থাক। আর চণ্ডী, গীতা বইগুলি তো খারাপ নয়। তা পড় না কেন? ভাল না লাগলে ছেড়ে দেবে।"

এই সময়ে হঠাৎ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অকালে তিরোধান ঘটে গেল ১৯৫০ সালের ১লা নভেম্বর। কদিন আগেই তো এসেছিলেন তারাশঙ্করের বাড়ি দেখতে। তারাশঙ্করের হাত থেকে তুলে নিয়েছিলেন মর্নিং গ্লোরির বীজগুলি—বলেছিলেন, "ফুল হলে তোকে লিখব। বারাকপুরে ঘাটশিলায়—দু জায়গায় ছড়িয়ে দোব। দেখলেই মনে পড়বে তোকে।"

বিভূতিভূষণের মৃত্যুতে আরও নীরব হয়ে গেলেন তারাশঙ্কর। তাঁর উদ্দেশে লিখলেন—"বাংলা সাহিত্যের নাটমণ্ডপে পথের পাঁচালীর আসর ভাঙ্গিয়া গেল। মেঘমল্লার রাগিণী শেষ হইয়া গেল। অরণ্যভূমের বিচিত্র সঙ্গীত অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া গেল। বাংলাদেশের ভাঁটফুল-বনতুলসী-কাশফুল মাটির একতারা বাজাইয়া যে বাউল টহল দিয়া ফিরিতেছিল—নগরের রাজপথে ঐশ্বর্য বিলাসের ছটায় আত্মহারা মানুষ যে গানের ধ্বনি শুনিয়া শান্ত ছায়ানিবিড় গ্রামের স্মৃতিতে বিভোর হইয়া উঠিয়াছে, অশান্তি-অতৃপ্তি ক্ষোভ হইতে মুক্তিপথের ইশারা পাইয়াছে, এক শাশ্বত আনন্দময় মর্মলোকের সন্ধান পাইয়াছে—সেই বাউলের কণ্ঠ নীরব হইয়া গেল। অপরাজিত রচয়িতা অপরাজিত বিভূতিভূষণ নাই।" আরও এক জায়গায় লিখেছেন, "বঙ্গসরস্বতীর মন্দিরে যে প্রদীপটি নিভল সেটি ঘৃতপ্রদীপ। আজ নূতন যুগে—যে যুগে বৈদ্যুতিক আলোকমালায় দীপাবলীর শোভার ব্যবস্থা—সে যুগে মন্দির অন্ধকার

হবে না। বৈদ্যুতিক আলোয় হয়ত উগ্র দীপ্তিতে ঝলমল করবে—কিন্তু ঘৃতদীপ? যার শিখার স্নিগ্ধতায় চোখ জুড়ায়, যার স্নিগ্ধ শিখার গন্ধে একটি হোমগন্ধের পবিত্র আভাসে বুক ভরে ওঠে সেই ঘৃতদীপটি' সে আর জ্বলবে না।"

*　　　　*　　　　*

তারাশঙ্কর বরাবরই ভারতীয় মতে মেঝেতে আসনে বসে ডেস্কের উপর ঝুঁকে লিখতেন। আমার মতে এটি তাঁর উপর যামিনী রায়ের প্রভাবে ঘটেছিল।

এই সময় তারাশঙ্করের সাহিত্যক্ষেত্রে বিচিত্র স্বাদের বইগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হচ্ছে—১৯৪৯ সালে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ১৯৫২তে নাগিনীকন্যার কাহিনী এবং ১৯৫৩তে আরোগ্য নিকেতন। তবু মনের অস্থিরতা যাচ্ছে না। মনের এই ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় তাঁর জীবনে এই সময় কিছু বিচিত্র ঘটনা ঘটে গেল। এর বিবরণ আগেই দেওয়া হয়েছে।

উদ্‌ভ্রান্ত জীবনযাত্রা চলছে তখন তাঁর।

তারাশঙ্কর-বিদ্বিষ্টজনে বলছেন—তারাশঙ্কর শেষ, তিনি ফুরিয়ে গেছেন। ওঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি, "লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। ছেলেদের কাগজে দু-তিনটি গল্প লিখেছি। তখন নানান জনে নানান কথা বলছে। অনুযোগ, অভিযোগ, ক্ষেত্র-বিশেষে অপবাদ। অপবাদটাই বড় হয়েছে। শনিবারের চিঠিতে তখন এক তরুণ প্রসঙ্গ-কথা লেখেন।

এই তরুণটি আমার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি আমার উপর নিরন্তর অভিযোগ এবং আক্রমণ করে লিখছেন, নানান অপরাধ আবিষ্কার করেছেন। আমাকে আক্রমণ করবার জন্য রাজশেখর বসু মশায়কেও একবার আক্রমণ করলেন। সেটা তাঁর 'পদ্মভূষণ' খেতাব গ্রহণের জন্য।" অন্য আর এক জায়গাতে লিখছেন, "এই তরুণটিই একটি অভিযোগ করে বেড়াচ্ছিলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে আমি পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছি কেন? অভিযোগের কথাটি আমাকে জানালেন জগদীশ ভট্টাচার্য। বর্ধমান যাবার পথে হাওড়া স্টেশনের ওয়েটিং রুমে।...

কথাটা আমাকে চমকে দিয়েছিল।

পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছি? পথ কি সংসারে কেউ কারুর আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? বিশেষ করে গুণ প্রকাশের ক্ষেত্রে? গুণীজনের ক্ষেত্রে? এ ক্ষেত্রে একজন এগিয়ে চলে, যে শক্তি হারায়, তার গতি মন্থর হয়, তখন পিছনের যাত্রীদল এগিয়ে এসে তাকে অতিক্রম করে চলে যায়, এমন কি পদদলিত করেও দিয়ে যায় অন্ধকারে চলমান দ্রুততরগামী জনতার মত। সুতরাং পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকার অর্থ কি? সরে যেতেই যদি বলেন—তবে সরেই বা যাই কি করে? আমাকে

নিঃশেষ আমি করব কি করে?"

এই সব কারণে তখন তাঁর কলকাতার পরিবেশ ভালো লাগছিল না। বিরক্ত হয়েছিলেন গোটা সংসারটার উপরই। তাই কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন কাশী। কেন কাশী চলে গিয়েছিলেন বলতে গিয়ে উনি লিখেছেন, "এই সময়ের মধ্যে আমি একবার কাশীও চলে গিয়েছিলাম। মন তখন এত অধীর, এত চঞ্চল, এত তৃষ্ণার্ত যে কোথায় আমার জীবনের প্রশ্নের উত্তর, কোথায় কিসে আমার তৃপ্তি সেই চিন্তায় আমি এত একক, এত উদ্‌ভ্রান্ত যে সমস্ত সংসারের সঙ্গে আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি। গোটা সংসার ভাবছেন আমি থেকেও নেই, আমি পর হয়ে গেছি। গোটা সংসারের প্রতিনিধি হিসাবে আমার পত্নী আমাকে প্রচণ্ড ব্যাকুলতায় আঁকড়ে ধরতে চাইলেন। শত প্রশ্ন তাঁর।—

কেন এমন হয়ে গেলে তুমি? কি চাও তুমি? কি ভাব তুমি? আমি কি উত্তর দেব? যে উত্তরহীন প্রশ্ন আমাকে এমনভাবে অধীর অস্থির একান্ত বিচ্ছিন্ন একক করেছে সে প্রশ্নের কথা উত্তর হিসেবে বললেও সে উত্তর তো উত্তর নয়। সে প্রশ্নই।...শ্রীমান গজেন মিত্র, শ্রীমান সুমথ ঘোষ আমার স্নেহাস্পদ এবং আমাকে তাঁরা আমার যোগ্যতার অধিক শ্রদ্ধা করেন। তাই করেন বলেই কোন রকম প্রতি-বাদের বা বিতর্কের আশঙ্কা তাঁদের তরফ থেকে আমার ছিল না। আমি তাঁদের দোতলার ঘরে ডেকে নিয়ে বললাম, আমি কাশী যাব। এখুনি যে ট্রেন মেলে সেই ট্রেনেই আমি যাব। আমাকে দুখানা কম্বল, একটা বালিশ, একখানা ধোয়া সুতোর কাপড়, একটা লংক্লথের পাঞ্জাবি, একটা টিনের সুটকেশ কিনে দাও এবং কিছু টাকা দাও।

তাঁরা কোন প্রতিবাদ করেনি। শুধু আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে-ছিলেন।

আমি বলেছিলাম—গজেন?

গজেন সজাগ হয়ে উঠে বলেছিলেন, চলুন আপনি, আমি সব কিনে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

আমি বলেছিলাম, বাড়িতে যেন টেলিফোন করে দিয়ো না। তিনি হেসে বলে-ছিলেন, তাই পারি! আপনি যাচ্ছেন কেন, কি পাবেন, আপনি জানেন। অনেক জনে যায়—পায়ও বলে শুনেছি। আমি কেন আপনার বিঘ্ন করে দেব! কথাটা আমার মনে আছে, চিরকাল মনে থাকবে।"

কাশী গিয়ে উঠলেন এক হোটেলে। হোটেল মালিক নাম শুনে বলেছিলেন, 'আমি আপনার দেশের লোক। আমার বাড়ী কান্দী।' তারাশঙ্কর চমকে উঠে-

ছিলেন। "গজেন হাওড়া স্টেশনে একজন ডাক্তারের ঠিকানা দিয়েছিলেন। বলে-ছিলেন, আপনি গিয়েই এঁর সঙ্গে দেখা করতে ভুলবেন না। আপনার সন্ধানে ইনি অনেক সাহায্য করবেন। ডাক্তার মৈত্র।"

কাশীতে আর একজনের সঙ্গেও আলাপ হয়েছিল—প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের আনন্দসুন্দর ঠাকুর। রয়টারের প্রতিনিধি ছিলেন ১৯৩২-৩৩ সালে। এই ডাক্তার মৈত্র কলকাতার বাড়িতে টেলিগ্রাম করে দিয়েছিলেন। মা ও দাদা গিয়ে ওঁকে বাড়ি ফিরিয়ে এনেছিলেন। সেবার কাশী থেকে ফিরে এসেই জননীকে গুরু করে তাঁর কাছেই দীক্ষা নিয়েছিলেন। শাস্ত্রসম্মত ক্রিয়াগুলি করে দিয়েছিলেন গৌরীনাথ শাস্ত্রী মশায়ের নির্দিষ্ট একজন বৃদ্ধ। তিনি সম্পর্কে গৌরীনাথের খুড়ো।

এইবার লিখেছেন—"এবার জীবন আমার একটা সোজা পথ ধরল।"

১৯৫৬ সালে কলির ব্রাহ্মণের আর একবার জাগরণ হল। কথাটা উনি নিজেই বলতেন—'নিভে যাবার আগে কলির ব্রাহ্মণ আর একবার জ্বলে উঠতে পারে কিনা দেখা যাক।'

ডি. এল. রায়ের 'চন্দ্রগুপ্ত' নাটকে এমনি কয়েকটি লাইন আছে, উক্তিটি ছিল চাণক্যের। তাই হল, উনি লিখেছেন, "১৯৫৬ সনের পূজার সময় তিনটি বা চারটি লেখা আমি লিখেছি। আনন্দবাজারে 'বিচারক', দেশে 'রাধা', এবং তরুণের স্বপ্নে 'পঞ্চপুত্তলী'। এবং আর একটি লেখা একাঙ্কিকা শনিবারের চিঠিতে। হয়ত এই বিশ্বাসেই পরবর্তী কালে লেখার শুরু করতেন ইষ্টনাম লিখে।

*　　*　　*

এই ১৯৫৬ সনে লেখার মগ্নতার মধ্যেই এল আকাদেমী পুরস্কারের খবর।

ওঁর আরোগ্য নিকেতনের জন্য ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে পেলেন রবীন্দ্র পুরস্কার, সেপ্টেম্বরে আকাদেমী, নানা দিক থেকে নানা রকমের সম্মান আসতে লাগল এবার। উনি লিখছেন, "এরই মধ্যে দিল্লী থেকে টেলিগ্রাম এল—শিক্ষা ও সংস্কৃতি দপ্তরের টেলিগ্রাম—'ভারত সরকার চীনের নবযুগের সাহিত্যের জনক লু-সুনের বিংশতিতম মৃত্যুদিবস উপলক্ষে আহূত পৃথিবীর সর্বদেশীয় সাহিত্য সম্মেলনে দুজন সাহিত্যিক প্রতিনিধি পাঠাবেন। তার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে আপনাকে মনোনীত করা হয়েছে। আপনার সম্মতি জানান।' আমার মন বলেছিল—

মনোহারী বস্তুপুঞ্জ অন্তরাল দিয়ে
জীবন রহস্যময়ী নিঃশব্দ চরণপাতে
গেল মিলাইয়ে॥"

সেবারে কিন্তু তিনি চীন পর্যন্ত যেতে পারেননি। যাবার পথে রেঙ্গুনে অসুস্থ হয়ে

পড়েন এবং ফিরে আসেন কলকাতা। পনেরোদিন যেতে না যেতেই দিল্লী থেকে আমন্ত্রণ এল আকাদেমী পুরস্কার গ্রহণের।

অসুস্থ শরীর নিয়েই গেলেন নভেম্বর মাসে দিল্লীতে পুরস্কার আনতে। সঙ্গে গেলেন মা, ছিলেন অনিল চন্দের বাড়িতে—ওঁর স্ত্রী রাণী চন্দকে উনি ডাকতেন 'রাণীবহিন' বলে। উনি লিখছেন, "না গেলেও চলতে পারত। কিন্তু তবু গেলাম। গেলাম সস্ত্রীক, প্রলোভন দুটি। একটি পার্থিব রাজসিক, অন্যটি মানসিক ও আন্তরিক। দিল্লীতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতো ভারত-দর্শনবিৎ শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতের হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড নেব। তাঁর খুব নিকট থেকে তাঁকে দেখব। তারপর সস্ত্রীক যাব উত্তরভারতের তীর্থদর্শনে। ভারতবর্ষের মধ্যে দুটি ভারতবর্ষ আছে। আশ্চর্যভাবে আছে। একটি তীর্থময় ঈশ্বর-মহাত্মাময় ভারতবর্ষ। অন্যটি ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক ভারতবর্ষ।"

ঘুরলেন হরিদ্বার, লছমনঝোলা। ফিরে এলেন দিল্লী। ডাঃ মুল্করাজ আনন্দের টেলিফোন পেলেন—বললেন, দেখা করতে চাই। তারাশঙ্কর জানালেন, খুব খুশী হবেন দেখা হলে। তখনই চলে এলেন মুল্করাজ। তারাশঙ্কর লিখছেন, "এশিয়ান রাইটার্সের কনফারেন্সের বার্তা আনছিলেন ডাক্তার আনন্দ। ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের চাকা যে ঘুরছে প্রচণ্ডবেগে। একটার পর একটা ঘটনা ঘটছে।"

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে দিল্লীতে হল এশিয়ান কনফারেন্স। তারাশঙ্কর হলেন বাংলা প্রস্তুতি কমিটির ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। প্রথম দিন হল ভারতীয় লেখক সম্মেলন। এতে সভাপতিত্ব করলেন হুমায়ুন কবীর। কবীরসাহেব একদিন মাত্র থেকে চলে গেলেন। যাবার সময় তিনি নিজে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে নির্বাচিত করলেন জৈনেন্দ্রকুমারকে। তারাশঙ্কর লিখছেন, "কিন্তু বিস্ময়বোধ করলাম যে হিন্দী লেখকেরাই তার তীব্র প্রতিবাদ করে উঠলেন, বললেন—নির্বাচন আমরা করব।... এবং আমাকে তাঁরা কবীরসাহেবের অনুপস্থিতিতে ভারতীয় লেখকদের নেতা নির্বাচিত করলেন। কবীরসাহেব তাতে প্রতিবাদ করতেও পারলেন না।"

দিল্লীতে নবনির্মিত বিজ্ঞান-ভবনে এই সম্মেলন বসেছিল।

১৯৫৭ সালের ৬ই শ্রাবণ কনিষ্ঠা কন্যা বাণীর বিবাহ দিলেন ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের সঙ্গে। এবারেই পূজা সংখ্যা আনন্দবাজারে বের হল তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'সপ্তপদী'। আর এল পুনরায় চীন থেকে আমন্ত্রণ। লিখছেন, "এবার তাঁরা আবার আমাকে নিমন্ত্রণ জানাচ্ছেন অক্টোবর বিপ্লবের উৎসবের সময় চীন দেশে এসে চীন-দেশ ভ্রমণ করে যেতে।...চীন দেশ গিয়ে সেবার এক মাস ছিলাম। এবং চীন দেশের লেখকবৃন্দ যে আতিথেয়তায় আমাকে আপ্যায়িত করেছিলেন তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে

স্মরণ করি।" সেখানে অনেকে গিয়েছিলেন। যে কয়েকজনকে দেখে তিনি আকৃষ্ট এবং মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূরণচান্দ যোশী এবং তাঁর স্ত্রী চট্টগ্রামের মেয়ে কল্পনা যোশী। কল্পনা যোশীর পরিধানে ছিল খদ্দরের শাড়ি। বিনীত নম্র সলজ্জা কল্পনা যোশীকে বাঙালী মেয়ে বলে চিনতে মুহূর্ত দেরী হয় না কারও। পরিশেষে লিখেছেন, "চীনের নবজাগরণ কালের প্রথম মহানস্রষ্টা, সাহিত্যিক লু-সুন-এর প্রতি তাঁদের আশ্চর্য গাঢ় শ্রদ্ধা, যা দেখে এসেছি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার আর শেষ নেই সাহিত্যিকবৃন্দের এবং জনসাধারণের। তাঁর স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁরা যা করেছেন সে সত্যসত্যই দেখবার মত। বিশাল একটা পার্ক, তার মধ্যে তাঁর স্মৃতিমন্দির। সেই স্মৃতিমন্দিরে আমি মালা দিতে গিয়ে ভারতীয় প্রথামত জুতো খুলে উপরে উঠে মালাটি দিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করেছিলাম এবং তাঁদের যে স্বাক্ষর বই আছে, তাতে দু ছত্র কবিতা লিখে নিজের স্বাক্ষর রেখে এসেছি। লাইন ক'টি আমার চীনের নোট-বুক থেকে তুলে দিলাম।

> যে গান গেয়েছ তুমি মানুষের লাগি—
> চীনের প্রাচীরে সে তো আজ বন্ধ নয়—
> লঙ্ঘিয়া পাহাড় নদী মানুষের মাঝে
> ছড়ায়ে পড়েছে আজ সর্ববিশ্বময়।"

চীন থেকে ফিরে এসেছিলেন অক্টোবরের শেষে—বোধহয় ৩১শে অক্টোবর। এর ঠিক ছ-সাত মাস পর টেলিগ্রাম পেলেন রাশিয়ান অ্যাম্বাসী থেকেও, এখানকার রাশিয়ান কনস্যুলেটের একজন এসে তারাশঙ্করকে নিমন্ত্রণ জানালেন মস্কোতে আফ্রোএশিয়ান রাইটার্স কনফারেন্সের প্রিপেটারী কমিটিতে যোগ দেবার জন্যে। উনি লিখেছেন, "এখান থেকে দিল্লী হয়ে মস্কো রওয়ানা হয়েছিলাম ২৫শে মে ১৯৫৮। ওই তারিখে ভোরবেলা আমার ছোট মেয়ে বাণীর একমাত্র মেয়ের জন্ম হয়েছিল। লাল রাশিয়ায় যাত্রার দিন ওর জন্ম—এই কথাটি ওর নামের সঙ্গে জড়িয়ে রাখবার জন্যই ওর নাম রেখেছিলাম লালী।"

সেখানে ছিলেন দশ-বারো দিন। এই দশ-বারো দিনের ইতিহাস আনন্দবাজারে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়ে পরে 'মস্কোতে কয়েকদিন' নামে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়। ওই সমিতির মধ্যে ছিলেন ভারতবর্ষের দুজন—তারাশঙ্কর আর মুল্করাজ আনন্দ, চীনের দুজন, ইউনাইটেড আরবের দুজন, জাপানের একজন এবং রাশিয়ার জনকয়েক লেখক। সভাপতিত্ব করেছিলেন উজবেকীস্তানের খ্যাতনামা লেখক এবং উজবেকী-স্তানের সোভিয়েটের প্রেসিডেন্ট এবং সুপ্রীম সোভিয়েটের অন্যতম সহ-সভাপতি মিস্টার রশিদভ।

এখানকার পরিণতি সম্পর্কে শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখেছেন, "তাসখন্দে আফ্রো-এশিয়ো সম্মেলন কিন্তু প্রস্তুতি সমিতির প্রতিশ্রুত আদর্শ থেকে সরে এল। এর নীতি ও কর্মপন্থার বদল হল। তারাশঙ্কর এতে আপত্তি জানালেন এবং ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাইলেন। কিন্তু সে অব্যাহতি তাঁকে দেওয়া হয়নি, তাসখন্দ সম্মেলন শেষ হল আটদিনের দিন। এই আটদিন তারাশঙ্কর আত্মমগ্ন হয়ে কেবলই ভেবেছেন কি করে ভারতের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকবে। সম্মেলনের শেষদিন তিনি সভাপতিমণ্ডলের অধিনেতা মিঃ রশিদভকে বললেন, আপনারা ভোটের জোরে যা করতে যাচ্ছেন তা এখানে এই কয়েকজন ভারতবর্ষের লেখক মেনে নিলেও সারা ভারতের লেখকরা তা মেনে নেবেন না। হয় আপনারা ভারতকে আপনাদের সিদ্ধান্তের অংশীদার করবেন না, নয় ভারতকে একটি আসন দিয়ে দিল্লীর সাহিত্য আকাদেমীকে সে আসনে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য লিখুন। রশিদভ এই প্রস্তাব মেনে নিলেন। জয় হল তারাশঙ্করের। তিনি নেতৃত্বের সকল দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতি পেলেন। তখনকার মত ভারতবর্ষ বাইরে রয়ে গেল। আসন গ্রহণ করা না করা আকাদেমীর মতের উপর নির্ভরশীল হয়ে রইল।"

এর কিছুদিন পরে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ এক চায়ের আসরে তারাশঙ্করকে সর্বসমক্ষে বলেছিলেন, Well Banerjee, what happened in Tashkend? Dr. Sree Dharani was speaking very highly. সে আসরে পণ্ডিতজী ছিলেন, ওড়িষ্যার হরেকৃষ্ণ মহাতাপ এবং বাংলাদেশের নরেন্দ্র দেব ও তাঁর স্ত্রী রাধারাণী দেবীও উপস্থিত ছিলেন।

এই প্রসঙ্গে বিগত কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করতে হয়—১৯৫২ সালে তারাশঙ্কর পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল কর্তৃক বিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৫৩ সালে জমিদারী প্রথা বিলোপের জন্য এস্টেট অ্যাকুইজিশন বিল ২৫শে নভেম্বর গৃহীত হয়। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার অনুচ্ছেদটি সম্পর্কে বামপন্থীদের যুক্তিকেই তারাশঙ্কর সেদিন সমর্থন জানিয়েছিলেন। জমিদারী বিলোপের প্রেক্ষাপটে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন তাঁর সুবৃহৎ উপন্যাস—কীতিহাটের কড়চা। এটি তাঁর সাহিত্যজীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। অমৃতে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল, রেখে দিয়েছিলেন মার্জনা করবার জন্যে—কিন্তু সে সময় তিনি আর পাননি। তাঁর মৃত্যুর পর এটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন মিত্র ও ঘোষ।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে তারাশঙ্করকে সভাপতিরূপে মনোনীত করা হয়। প্রথমটি হয় দিল্লীতে এবং দ্বিতীয় সম্মেলন হয় কলকাতায়। ঐ দুটি অধিবেশনেই সভাপতিত্ব

করেছিলেন হুমায়ুন কবীর। মাদ্রাজে তারাশঙ্কর তাঁর ভাষণে বললেন, "Let not our voice falter to speak as only Indian Culture can speak in the face of danger,…I shall reaffirm here what I stated in a much larger conference in an atmostphere vitiated by the provocative political propaganda, sponsored and fanned by Chinese writers claiming to be protagonists of peace.

I said, the spirit of the writer is the song of freedom, we have faught against imperialism and colonialism and will continue to fight against all injustice and wrongs to humanity social and political. against all aggression on life in any form. Yet focus of the conference should be literary and not political."

১৯৬০ সালে ওঁকে দেওয়া হল জগত্তারিণী পদক। উনি লিখেছেন, "১৯৬০ সালের প্রথমেই বোধহয় ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে জগত্তারিণী পদকে সম্মানিত করেছিলেন। আমার বিচারে জগত্তারিণী পদকের সম্মানের মূল্যমান আজও শ্রেষ্ঠ এবং একক ও অদ্বিতীয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সম্মানের প্রথম প্রাপক।"

ঐ বছরই ৩১শে মার্চ রেডিওতে ঘোষিত হয়েছিল "মাননীয় রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট সাহিত্যিক হিসাবে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজ্যসভার একজন সভ্য হিসেবে মনোনীত করেছেন।" অর্থাৎ তারাশঙ্কর বিধান পরিষদ থেকে ৩১. ৩. ৬০ সালে অবসর গ্রহণ করলেন এবং ১. ৪. ৬০ থেকে রাজ্যসভার সদস্য হলেন। এই সময়-টাতে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। প্রেসার কখনও বেড়ে হয় ১৬০, ২০০ আবার পরমুহূর্তে নেমে যায় ১৪০-এ। ৬১ সালে মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠলেন। লাভপুরের গ্রামবাসীরা তাঁকে সেখানে আন্তরিক শ্রদ্ধা ও সম্বর্ধনা জানালেন। ১৯৬২ সালের গোড়াতেই তারাশঙ্করকে ভারত সরকার 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত করলেন। সকলেই এতে খুশীর চাইতে অখুশীই হয়েছিলেন বেশী। এই সময় তাঁর জীবনে এল এক বিষাদময় লগ্ন। তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ, তাঁর পরমাত্মীয় সমান সজনীকান্ত দাসের জীবনাবসান ঘটল। দিনটি ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারী রবিবার। এই সজনীকান্তের কাছে তারাশঙ্কর আবদ্ধ ছিলেন প্রীতির বন্ধনে। বিপদে-আপদে, সম্পদে সহোদরের মত। সজনীকান্তের হাত ধরেই উনি এসেছিলেন বঙ্গসাহিত্যের আসরে, সৌধে উঠবার প্রথম সোপানে। সজনীকান্তের অকুণ্ঠ সাহায্য না পেলে তারাশঙ্করের অগ্রগতি হয়ত অনেক মন্থর হত। তাঁর মৃত্যুর পর তারাশঙ্কর স্মৃতিতর্পণ করলেন, "সজনীকান্ত আর

নাই। তাঁর বাষট্টি বৎসরের জীবন বহু সংঘাত ও সংঘর্ষের জীবন। বহু কীর্তির জীবন। কীর্তিমান সজনীকান্তের কীর্তিতে ছেদ পড়েনি, জীবনের প্রায় মধ্য গগনেই দীপ্ত জ্যোতিষ্কের মত কক্ষচ্যুত হয়ে মৃত্যুর আকর্ষণে অকস্মাৎ বিলীন হয়ে গেলেন। তাঁর মৃত্যুতে আমাদের মত বন্ধুজনের জীবনে অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা বন্ধু হারিয়েছি, তাঁর পত্নী পরম জনকে হারিয়েছেন, পুত্রকন্যারা পিতৃহীন হয়েছে, বাংলা সাহিত্য প্রতিভাশালী লেখক হারিয়েছে—শনিবারের চিঠি হারিয়েছে কর্ণধারকে; যদি সজনীকান্তের পুত্রকন্যার মতোই সেও পিতৃহীন হয়েছে বলি, তবে ভুল বলা হবে না। শনিবারের চিঠি সজনীকান্তের মানস-কন্যা।"

পূর্বজীবনে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হওয়ার ঘটনার স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তারাশঙ্কর কৃতজ্ঞচিত্তে বলেছেন, "এরপর ক্রমে ক্রমে নিকটে এসে বন্ধু হয়েছি। তাঁর সঙ্গে চরিত্রগত অমিল আমাদের বন্ধুত্বের পথে অন্তরায় ছিল না। তিনি হাসির মানুষ—আমি তার উল্টো।...তিনি বাক্যে ছিলেন রসিক, ভোজনে রসিক ছিলেন, উল্লাসের প্রকাশে রসিক ছিলেন, আমি তা ছিলাম না, আমি তা নই। কিন্তু তবুও বন্ধু হয়েছিলাম, সম্ভবত অতিক্রম করেছিলাম বাইরের সব কিছুকেই।

হঠাৎ একদিন আমাকে ডাকলেন, বড়বাবু বলে।

প্রশ্ন করলাম, কেন? এ নাম কেন? রসিকতা?

না। তুমি বড় হয়ে গেছ বলে।

আমি হেসে বলেছিলাম, তাহলে তুমি ছোটবাবু।

খুব ভাল।

বাংলা দেশের অনেকেই এ নাম জানেন। এই স্বীকৃতি—একি আমি পারি? বা আর কজনে পারে?"

এর পরেও আবার এসেছিল নতুন করে আঘাত। ১৪ই অক্টোবর তাঁর জ্যেষ্ঠ জামাতা, আমার ভগ্নীপতি শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায় মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে অকাল প্রয়াণ করলেন। ক্যানসার হয়েছিল। আমার ভগ্নী গঙ্গা স্বামীহারা হল—একটি পুত্র আর তিনটি কন্যা নিয়ে। আমার ভগ্নীপতি কৃতী ছাত্র এবং কর্মজীবনে ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। স্বভাবধর্মে ছিলেন কবি ও বিদগ্ধ রসিক। সৎ সরকারী কর্মচারী—তার উপর ভাইকে ডাক্তারী পড়িয়ে—শান্তিশঙ্কর শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন, পুত্র-কন্যাদের বিশেষ ব্যবস্থা না করেই।

সুতরাং তারাশঙ্করকে যুগান্তরে চাকরি নিতে হল—১৯৬৩ সালে। সপ্তাহে সপ্তাহে 'গ্রামের চিঠি' লিখতেন, নানা ফিচার লিখতেন অমৃতে। এই অমৃতেই বেরিয়েছিল তাঁর বৃহত্তম সুবিখ্যাত উপন্যাস 'কীর্তিহাটের কড়চা',—১৯৬৪ সাল থেকে

আড়াই বৎসর। প্রতি সপ্তাহে লিখে গেছেন ধারাবাহিক ভাবে। উপন্যাসটি সাত পুরুষের কাহিনী কালসীমার দিক থেকে ১৭৯৯ থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জমিদারী বিলুপ্তি আইনের দিন পর্যন্ত এবং তারও কিছু পরবর্তী কাল পর্যন্ত।

তারাশঙ্কর লিখেছেন, "অক্টোবরে শান্তি মারা গেল, জানুয়ারীতে আমি শয্যাশায়ী হলাম। সেই রোগশয্যাতে শুয়েই হঠাৎ ছবি আঁকার ইচ্ছা হল।...আমার ছবি আঁকার কথা আমার গোপন প্রেমের কথার মতো গোপনে রাখতে চেয়েছি বরাবর।...রোগশয্যায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল মাস তিনেকের উপর। সেই সময় যখন সময় কাটছে না—তখন হঠাৎ বিছানার সামনে দেওয়ালের গায়ে সিমেন্ট দিয়ে মাজা অংশের উপর কতকগুলো কর্ণির দাগ, ছবি হয়ে উঠে, আমাকে ডাকলে। বললে আমার দাগে দাগে দাগ বুলিয়ে ফুটিয়ে তোল। আমি ছবি।...অরেঞ্জ রঙের টিউব রঙ নিয়ে তুলি চালাতে আরম্ভ করলাম।...সেদিন ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই ছবিটা শেষ হল।...আমার গৃহিণী যখন বললেন বাঃ, এ তো চমৎকার হয়েছে, তখন সত্যিই আমি পুলকিত হলাম খুশী হলাম।...তাঁকে আমি সেদিন খুব খুশী হয়েই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, সত্যি বলছ?

তবে কি তোমার মন রেখে বলছি? আমি তা বলিনে।

জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তাহলে ছবি আঁকব?

ছবি যখন ভাল হল, তখন আঁকো না ইচ্ছে হলে। কিন্তু বাপু, ও দেওয়ালে নয়। না, দেওয়াল জুড়ে জুড়ে তুমি ছবি এঁকে ভরাবে সে হবে না।

তাহলে?

তাহলে আর কি? যেমন করে যাতে মানুষ ছবি আঁকে তেমনি করেই আঁকো। যামিনীদার ছবি আঁকা তো দেখেছি। কাপড়ের উপরে আঁকেন তিনি। তাই আঁকো। দেওয়ালে আঁকা হবে না।

এই আমার ছবি আঁকার কথা।"

১৩৭৪ সালের ৭ই শ্রাবণ আকাডেমি ও ফাইন আর্টস ভবনে তারাশঙ্করের চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল। উদ্বোধন করেন ভারতের বিখ্যাত ভাস্কর দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। অনেকেই প্রশংসা করেছেন। কিন্তু একজন খ্যাতিমান কবি তাঁর বন্ধুদের কাছে ব্যঙ্গ করে বলেছিলেন—শুনেছো হে, তারাশঙ্কর আজকাল ছবি আঁকছে; মাঝে মাঝে পুত্রকে ভুল করে 'রথী' বলে ডেকে ফেলছে। তারাশঙ্কর এই বিদ্রূপ সহ্য করেছিলেন নীরবে। ভাস্কর দেবীপ্রসাদ কিন্তু বলেছিলেন, "ছবির জগতে তিনি আনন্দের সন্ধানেই ঘুরেছেন।" এই প্রদর্শনীতে ২৭খানি ছবি এবং কয়েকটি কাঠের ভাস্কর্য স্থান পেয়েছিল।

১৯৬৭ সালে তারাশঙ্কর সত্তর বছরে পদার্পণ করলেন। এই বছরটি ওঁর পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৎসর। উনি নিজে বলেছেন, "১৯৬৭ সাল আমার জীবনে একটি সফলতার বৎসর।" এই সময়ের ঘটনাগুলি শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি, "১৯৬৭ সালে তিনি সত্তর বৎসরে পদার্পণ করেছেন। নাগপুরে নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করতে গেলেন। সভাপতির ভাষণ পাঠ করতে করতেই তিনি অনুভব করেছিলেন, জীবনটা যেন অকস্মাৎ সৌভাগ্যে সৌগন্ধে ভরে উঠেছে। সেই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ও প্রাণপুরুষ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তারাশঙ্করের অভিভাষণ শুনে অগ্রজের আশীর্বাদের মতোই তিনি মুখ ফুটে বলেই ফেলেছিলেন, "বড়বাবু দেখবেন, সবের মালিক যিনি তিনি আপনাকে বড় করবেন।...১৯৬৭ সালেই তিনি পেলেন রজত কৌলীন্যে ভারতের মহার্ঘতম জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। জ্ঞানপীঠ পুরস্কারকে ভারতের নোবেল পুরস্কার হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু সত্যকার নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মত সারাভারতে সমকালীন সাহিত্যিকগণের মধ্যে যদি কারো কথা চিন্তা করা যেতে পারতো তাহলে তিনি তারাশঙ্কর।...এ প্রসঙ্গে মার্কিন-প্রবাসী বহুশ্রুত কবি অধ্যাপক অমিয় চক্রবর্তী বলেছিলেন, নোবেল পুরস্কার তারাশঙ্কবাবুকে দেওয়া হলে ধন্য বোধ করব। তাঁর চেয়ে যোগ্য লেখক ভারতবর্ষে বা অন্যত্র কেউ আছেন বলে জানি না, কিন্তু উপযুক্ত ইংরেজি তর্জমা করানো, প্রকাশন ও যথাযুক্ত প্রচারের কাজ সহজ নয়।" চারিদিক থেকে এসেছিল শ্রদ্ধা প্রীতি ও সম্বর্ধনার সমারোহ। কলকাতা পৌরপ্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাঁকে জানানো হল নাগরিক-সম্বর্ধনা, সম্মানপত্রের সঙ্গে উপহার দিলেন রৌপ্যনির্মিত মনুমেন্টের প্রতিকৃতি, তার মাথায় একখানি বই, নাম গণদেবতা। এই গণদেবতার জন্যই ওঁকে দেওয়া হয়েছিল জ্ঞানপীঠ পুরস্কার। মহাজাতি সদনে বিপুল সমারোহ হয়েছিল তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। ঐ সময়ের দৈনিক পত্রে যে অনুষ্ঠান-সূচী বিজ্ঞাপিত হয়েছিল—তা ছিল এই রকম।..."তারাশঙ্কর-জন্ম-জয়ন্তী" কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগামী ৮ই শ্রাবণ সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ করবেন। এই উপলক্ষে তারাশঙ্কর সম্বর্ধনা সমিতি নিম্নলিখিতরূপ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন: ছয়ই শ্রাবণ রবিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা আকাদেমী অফ ফাইন আর্টস ভবনে ছয়ই থেকে তেরোই শ্রাবণ পর্যন্ত তারাশঙ্করের অঙ্কিত চিত্রাবলীর প্রদর্শনীর উদ্বোধন, উদ্বোধক দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী। আটই শ্রাবণ মঙ্গলবার: সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা, মহাজাতি সদন, মূল অনুষ্ঠান: সম্বর্ধনা জ্ঞাপন, মঙ্গলাচরণ: প্রভুপাদ শ্রীপ্রাণকিশোর গোস্বামী, উদ্বোধক: প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী; সভাপতি: জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়,

প্রধান অতিথি : ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশ্যামল মিত্র ও শ্রীবসন্ত চৌধুরী। নাট্যানুষ্ঠান 'তারাশঙ্কর', রূপায়ণে প্রাচ্যবাণী। নয়ই শ্রাবণ,বুধবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা, মহাজাতি সদন : সভাপতি ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি : শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, তারাশঙ্করের সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কিত আলোচনা। নাট্যানুষ্ঠান—কবি, রূপায়ণে মহিলা শিল্পী মহল।

১৯৬৮ সালে ভারত-সরকার তারাশঙ্করকে পদ্মশ্রী থেকে পদ্মভূষণে উন্নীত করলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও পিছিয়ে থাকলেন না এবার। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় এবং এরপর রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তাঁকে সম্মানসূচক ডি. লিট উপাধিতে সম্মানিত করেন। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সম্মান দেখাতে কিছু বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল, যার ফলে তারাশঙ্করের মৃত্যুর পর—তাঁর শ্রাদ্ধশেষে ঐ মণ্ডপেই তাঁর বাড়িতে এসে আমার মায়ের হাতে সম্মানপত্রটি তুলে দেন তদানীন্তন রাজ্যপাল—এবং আচার্য ডায়াস। এই সালেই তিনি সাহিত্য আকাদেমীর ফেলো মনোনীত হন। এই সময়েই বাংলার সবচেয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত সাহিত্যসত্র তাঁকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতি পদে বরণ করলেন।

এতো যে সম্মান, এতো যে সম্বর্ধনা, তবু কখনও ওঁকে আমরা খুশীতে হৈচৈ করে উঠতে দেখিনি। সম্মানপ্রাপ্তির খবরে অবশ্যই খুশী হয়েছেন—তবে সে ওই সময়-টুকুরই জন্য—পরমুহূর্তেই অন্যমনস্ক হয়ে যেতেন। অত্যন্ত বিষণ্ণ থাকতেন। ওঁকে অবধূত একটা রুদ্রাক্ষের মালা দিয়েছিলেন—সেটা থাকতো গলায়—পৈতার পাশেই। এপাশ ওপাশ ঘোরাঘুরি করেই বসে পড়তেন লেখার জায়গাটিতে। ওঁর সাহিত্য-সাধনার ফসল বেশ গুরুভার—গল্প লিখেছেন ১৯০টি, উপন্যাস প্রায় ৬৬।৬৭খানি, আত্মজীবনী স্মৃতিকথা জাতীয় বই ৮খানার মত, নাটক ১৩।১৪খানি, এর মধ্যে ৭।৮-খানি পাবলিক স্টেজে অভিনীত। প্রবন্ধ লিখেছেন অজস্র—তার মধ্যে কিছু পুস্তকা-কারে মুদ্রিত হয়েছে, তার সংখ্যাও ৫।৬খানি। ছবি এঁকেছেন ৩০খানির মত, কাঠের ভাস্কর্য—সেও দশের কাছাকাছি। আর লিখেছেন গান—৫০খানির মত। গাঁয়ের ভাষায় গান, তাঁর আর এক অনবদ্য সৃষ্টি।

তারাশঙ্করের সাহিত্য-কীর্তির যাঁরা নায়ক-নায়িকা, পাত্রপাত্রী, যাঁরা লাভপুর, মস্তলী, মহুগ্রাম, কাদিপুর, দোনাইপুর, বাকুল, কুসুমগড়ে শীতলগ্রাম, গোগার মানুষ এবার তাঁরাই এগিয়ে এসেছিলেন, তারাশঙ্করকে তাঁর ৭২তম জন্মদিনে অভিনন্দিত করতে, ১৯৬৯ সালের শ্রাবণ দিনে, লাভপুর অতুলশিব ক্লাবে। শ্রীমতী আশাপূর্ণা

দেবী ছিলেন সভানেত্রী এবং দক্ষিণারঞ্জন বসু ছিলেন প্রধান অতিথি।

তারাশঙ্কর সাহিত্যের পাত্রপাত্রীরা সব বাস্তব এবং ওই অঞ্চলেরই লোক। এবং এঁরাই—ন্যায়রত্ব, স্কুলপণ্ডিত, চাষী, কুমোর, কামার, ছুতোর, কবিয়াল, ডাকহরকরা, বাউল, বহুরূপী, গরুমারা—বৈষ্ণবী, নাগিনীকন্যা, ডাইনী, ঝুমুরদলের মেয়ে, গোয়ালিনী, যাযাবরী এমনি আরও কত; বিরাট ছিল তাঁর সঞ্চয়-ভাণ্ডার।

এরকম কথা অতুলচন্দ্র গুপ্তের লেখাতেও দেখতে পাই। তিনি লিখেছেন, "তারাশঙ্কর বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুর প্রসার বাড়িয়েছেন। তাঁর গল্পের অনেক চরিত্র আমাদের সমাজের এমন স্তরের নরনারী, যারা এমন করে পূর্বে আমাদের সাহিত্যের উপজীব্য হয় নাই। অথচ বুঝতে কষ্ট হয় না যে, হীনজনের উপর বর্তমান দেশপ্রেমিকের কর্তব্যবোধে তারাশঙ্কর তাদের নিয়ে সাহিত্য গড়েন নাই। এ স্তরের নরনারীর জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় পরিচয়। সে পরিচয় তাঁর মনের উপর দিয়ে অতি পরিচয়ের উপেক্ষায় গড়িয়ে যায়নি; তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির প্রবৃত্তিকে উদ্বেজিত করেছে। বাংলা কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুর পরিসরের স্বল্পতায় এই প্রাচুর্যের যোগের জন্য বাঙালী তারাশঙ্করের কাছে ঋণী।"

এই বছরেই ওঁর মাতৃবিয়োগ হল। ১৯৬৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর তারাশঙ্করের মাতৃদেবী নব্বই বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করে তাঁকে মাতৃদায় থেকে মুক্তি দিয়ে গেলেন। তারাশঙ্করের ভীষণ ভয় ছিল—তাঁর মায়ের এই পরিণত বয়সে তাঁকে যেন পুত্রশোকের যন্ত্রণা পেতে না হয়। কারণ তারাশঙ্করের শরীর মোটেই ভাল যাচ্ছিল না। মাতৃবিয়োগের পর তারাশঙ্কর আরো বিষণ্ণ হয়ে পড়লেন। লেখার কাজ করতেন আর বিকেলের দিকে নীচের বারান্দায় চেয়ার পেতে রাস্তার দিকে চেয়ে বসে থাকতেন। ১৯৭১ সালে পুলিসের কাছে খবর ছিল, নকশালদের খতম তালিকায় তারাশঙ্করও আছেন। এইসব কারণে জীবন মশায়ের মত ওঁর হয়তো মনে হয়ে থাকবে—"সুখ-দুঃখের সংসার। যত সুখ তত দুঃখ।... যত তেতো তত মিষ্টি। না পারা যায় গিলতে না পারা যায় ওগরাতে।"

১৯৭১ সালের জুলাই মাসে তাঁর ৭৪তম জন্মদিন গেছে। মহা আড়ম্বরে প্রতিপালিত হয়েছে। কিন্তু তার মাসখানেক পরেই উনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমি তখন দণ্ডকারণ্যে, টেলিফোন পেয়ে কলকাতা এলাম। দেখলাম পিতৃদেব দাঁড়িয়ে আছেন নীচের তলার বারান্দায় দু'হাতে রেলিং ধরে আমারই প্রতীক্ষায়। মা আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। তাঁকে দেখে আমাদের সকলেরই ধারণা হয়েছিল—উনি এযাত্রা সুস্থ হয়ে উঠবেন। কিন্তু উনি বলেছিলেন—"তোমরা আমাকে ভাল দেখছ, ডাক্তাররাও তাই ভাবছেন। কিন্তু আমি তা ভাবছি না।" এই উক্তিটি

করেছিলেন ১০ই সেপ্টেম্বর দুপুরে খেতে বসে। খেয়েছিলেন ঘি মেখে ভাত আর ইলিশমাছ ভাজা।

১১ই সেপ্টেম্বর ওঁর কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। সকাল নটা সাড়ে নটার সময় উনি আবার হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে গেলেন। এবার আমরা সবাই বুঝেছিলাম—সেই পিঙ্গলবর্ণা, পিঙ্গলকেশিনী, পিঙ্গলচক্ষু কন্যা—কোষেয়বাসিনী, সর্বাঙ্গে পদ্মবীজের ভূষণ অন্ধবধির—তিনি আসছেন ওঁর শয্যাপার্শ্বে। উনি অবশ্য আগেই বুঝেছিলেন, না হলে উপরের ওই উক্তিটি করতেন না। ডাক্তার না হয়েও রোগনির্ণয় সম্বন্ধে তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল। এ শক্তি না থাকলে 'আরোগ্য-নিকেতন' লেখা সম্ভব হত না তাঁর পক্ষে। এইসময় আবার চিকিৎসা বিভ্রাটও ঘটলো। আক্রমণের প্রথম দিকে 'রেভারিন' ইনজেকসন দেওয়া হয়েছিল ওঁকে। ডাক্তার ছিলেন সুনীল দত্ত—এবং তাঁকে সাহায্য করছিলেন আমার ভগ্নীপতি ডাঃ বিশ্বনাথ রায় ও এ পাড়ার নবীন চিকিৎসক ডাঃ জিতেন বসু। তারাশঙ্কর কিছু সুস্থ হতেই ডাঃ দত্ত রেভারিন বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এতে ওই দুই নবীন চিকিৎসকের ঘোরতর আপত্তি ছিল। তাঁদের দুজনেরই ধারণা তাঁর মাথার ইনফেকশনটা সম্পূর্ণ সেরে যাবার আগেই ওই ওষুধ বন্ধ করা উচিত হবে না। এই জন্যেই ওঁর উপর ১১ই আবার পুনরাক্রমণ হয়েছে। এই মতবিরোধের জন্য ডাঃ সুনীল দত্ত তারাশঙ্করকে আর চিকিৎসা করতে এলেন না। আবার সেই 'জীবনমশায়ে'র কথা মনে পড়ছে—"রোগীর রোগ বর্ণনায় ভুল, চিকিৎসকের ভ্রান্তি। ওষুধ অপ্রাপ্তি, এসব মৃত্যুরোগের উপসর্গ না হোক—হেতু।"

যাইহোক, সবকিছু শুনে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ডাঃ যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাঠালেন তারাশঙ্করকে দেখতে। তাঁরই নির্দেশে ১২ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হল ম্যানিট্রলের ড্রিপ দেওয়া। ১৩ সেপ্টেম্বর তারাশঙ্কর ভীষণ অসুস্থ—সে রাত্রেও ড্রিপ দেওয়া হল। মধ্যরাত্রে এল ভীষণ জ্বর তার সঙ্গে কাঁপুনি। চেপে রাখা যায় না, জ্বরেও গা পুড়ে যাচ্ছে। ড্রিপ খুলে দিলেন দুই নবীন ডাক্তার। ভোরের একটু আগে গলার মধ্যে শব্দ হতে লাগল। নার্সটি গলার ভেতর ও মুখ পরিষ্কার করে নিচ্ছে ভিজে ন্যাকড়া—তুলো দিয়ে। আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে আসছে ওঁর শরীর। আমরা ব্যাকুল হয়ে বসে আছি ওঁর শয্যাপার্শ্বে—অপেক্ষা করছি সূর্যোদয়ের। কিছুক্ষণ পর দেখলাম আর ওঁর নিশ্বাস পড়ছে না, বুক উঠানামা বন্ধ হয়ে গেল—কিন্তু তাঁর বাম বক্ষদেশের উপরিভাগ, ঠিক হৃৎপিণ্ডের জায়গাটাও, উঃ! সেকি কম্পন! সেকি আক্ষেপ! থরথর করে কেঁপে চলেছে—এক মিনিট—দেড় মিনিট। তারপর সব শেষ।

বাংলাসাহিত্যের সাধক, বহু সংগ্রামের বিজয়ী বীর তারাশঙ্কর ১৯৭১ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর, ২৮শে ভাদ্র ১৩৭৮ সাল সকাল ছটা চব্বিশ মিনিটে মেঘমলিন

আকাশের ছায়ায়, মর্ত্তলোক থেকে অমৃতলোকের যাত্রী হলেন। আমরা মনে মনে কল্পনা করছিলাম আমাদের অবস্থা।

নন্দপুর-চন্দ্রবিনা বৃন্দাবন অন্ধকার,
চলে না চলমলয়ানিল বহিয়া ফুলগন্ধহার।
জ্বলে না গৃহে সন্ধ্যাদীপ ফুটে না বনে কুন্দনীপ,
ছুটে না কলকণ্ঠসুধা পাপিয়া-পিক-চন্দনার।
বৃন্দাবন অন্ধকার ॥

পিতরৌ

মাতা মে পার্বতীদেবী পিতা দেবো মহেশ্বর।

এবার ওঁদের দুজনের কথা—অর্থাৎ মা বাবার যুগ্ম কথা কিছু না বললে অসম্পূর্ণ থাকবে আমার স্মৃতিচারণ।

আমার মাতৃকুল ছিলেন লাখপতিয়া—কয়লার ব্যবসা, কোলিয়ারী, জমিদারী কত কি। অন্যদিকে পিতৃকুল বৃটিশ রাজসরকারের অধীনে সামান্য পাঁচ-হাজারী মনসবদার অর্থাৎ বাৎসরিক পাচ হাজার টাকা আয়ের জমিদার। অবশ্য সেদিনের পাঁচ হাজার টাকার মূল্য ছিল অনেক। তবে ঐ পাচ হাজারীতে যে শরিক ছিলেন আরো দুজন—অর্থাৎ বাবা ছাড়া আমার অন্য দুজন খুল্লতাত। ঐ জমিদারী নামক চড়াইপক্ষীটিকে রক্ষা করতে গিয়ে এঁদের তিনজনের প্রতিনিয়ত যে হিমসিম অবস্থা হতো, সে তো সব ছেলেবয়সে আমি নিজের চোখেই দেখেছি। আমার বয়স তখন বারো-চৌদ্দ বছর। 'লাট' 'অষ্টম' এইসব শব্দগুলির সঙ্গে তখন আমার পরিচয় ঘটেছে। এগুলি ছিল জমিদারী রাখার জরিমানা—অর্থাৎ রাজ সরকারে রেভিনিউ জমা দেবার দিন।

বাবার মত ছোট জমিদারদের সাধারণতঃ প্রজারা খাজনা দিতে চাইতো না—হয়তো বা তাদের সে সাধ্যও হতো না সে সময়। সুতরাং খাজনা বাকী পড়তো। কিন্তু বড় জমিদারদের ভয়ে প্রজারা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত থাকতো, পাছে তারা আদালতে বাকী খাজনার দায়ে মামলাদায়ের করে, ডিক্রী বার করে প্রজাদের সম্পত্তি নীলাম করিয়ে না দেয়। সুতরাং ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশঙ্কায় পারতপক্ষে কেউ বড় জমিদারদের খাজনা বাকী ফেলে রাখতো না। আমার মাতৃকুল এই শেষোক্ত শ্রেণীর ছিলেন। তাঁরা ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থের বেশ কিছুটা লগ্নী করে বাড়ির পাশের জমিদারীগুলি কিনে ফেলেছেন। এছাড়া ভাগ্যগুণে আমাদের অনেক এজমালি সম্পত্তির

অর্ধাংশ তাঁদের দখলে চলে গেছে আমাদের অন্য এক শরিকের হাত থেকে। শুধু টাকাতে তখনকার দিনে খাতির পাওয়া যেত না। জমিদার হতে হবে। আশেপাশে গ্রামের মানুষের বশ্যতা চাই।

লাট, অষ্টমের সময় টাকা যোগাড় করতে না পারলে, বাবা কাকারা অর্থের জন্য হন্যে হয়ে এখানে ওখানে ঘুরতেন, ঋণ পেতে চেষ্টা করতেন। এসব চেষ্টা বিফল হলে নজর পড়তো বধূদের অলঙ্কারগুলির উপর। এবং সর্বপ্রথমেই ডাক পড়তো মায়ের—তাঁর গয়নাগুলি দেবার জন্য দাবী জানানো হতো। মায়ের উপরই বাবার এ-ধরনের জুলুমটা চলতো বেশী করে। তার যে কটি কারণ আমার মনে হয়েছে—তার প্রথমটি হলো ভদ্রমহিলা তাঁর স্ত্রী, দ্বিতীয় হলো এঁর অলঙ্কারের পরিমাণ অন্যদের থেকে বেশী এবং শেষটি হলো মায়ের গহনা বন্ধক দিলে, মা তাঁর পিতৃদত্ত অর্থ থেকে সেগুলি বন্ধনমুক্ত করতে সমর্থ হবেন এবং হতেনও। অন্যদিকে দুই কাকিমার ক্ষেত্রে এই দায়িত্বটা পিতা এবং খুল্লতাতদের উপর বর্তে থাকতো। এবং সে ক্ষেত্রে ভয় ছিল অলঙ্কারগুলি আর যদি মুক্তির আলো না দেখে!

কোন মেয়েই অঙ্গ থেকে তাঁর স্বর্ণভূষণ খুলে দিতে রাজী থাকে না, মাও হতেন না, শেষ পর্যন্ত বাবা নাটকীয় ভঙ্গীতে রাগারাগি আরম্ভ করতেন। রেগে যজ্ঞসূত্র অর্থাৎ পৈতা ছিঁড়ে ফেলতেন এবং মধ্যাহ্ন-আহারে অনীহা জ্ঞাপন করতেন। ব্যাস, বাজীমাত হয়ে যেতো। মায়ের চোখের জলে ভেজা অলঙ্কারগুলি চলে যেতো যতীন সাহার দোকানে। মা যখন হাতে সাবান দিয়ে গহনাগুলি খুলতেন তখন মায়ের চোখের সঙ্গে আমারও চোখে জল আসতো। আমি ঘাড় সোজা করে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এখন ভাবি সেদিন কত সহজে মায়ের অ্যাকাউণ্টে বাবা রাম-চন্দ্রের অভিনয়টুকু কি সুন্দরভাবে করে যেতেন।

এদিকে রামচন্দ্রের অভিনয় শেষ করেই, বাবার স্নান আহারের পূর্বেই এসে যেতো নতুন যজ্ঞসূত্র—অর্থাৎ নতুন গ্রন্থি দেওয়া পৈতা। আনতো সরোজ ভাইপো অর্থাৎ বাবার বয়স্য ষষ্ঠীরামদার ছেলে। একদা বাবার সঙ্গে স্বদেশী করেছেন।

ঐ ঝগড়া বছরে একবার তো হতোই—এমন কি কখনও কখনও দুবার বা তার বেশীও হয়েছে।

আজও আমার মনে পড়ে ঘাড় সোজা করে মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ফর্সা রোগা ছেলেটাকে ওঁরা সেদিন কি ভয় পেতেন!

এবার ওঁদের পরিণয়-পর্বের কথা বলি। বিয়ে হয়েছিল ১৩২২ সালের ১২ই মাঘ। পাত্র অষ্টাদশ বর্ষীয় শাণ্ডিল্যগোত্রাশ্রিত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাত্রী একাদশ বর্ষীয়া ভরদ্বাজগোত্রীয় উমাশশী দেবী [জন্ম ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩১১] উভয়

পক্ষই লাভপুর গ্রামের বাসিন্দা। পাত্র পিতৃহীন, পাত্রী মাতৃহীনা এবং ধনী মাতামহীর আদুরে কন্যা। সুতরাং একদিকে ধনী মাতৃকুলের দম্ভ অন্যদিকে স্বামীত্বের দাবী এবং অভিমান এই দুয়ের টানাপোড়েনের মধ্যে পড়ে প্রথম যৌবন সমাগমে এঁদের দাম্পত্য জীবনের প্রথম কদম ফুল ফুটে উঠতে পারলো না। এঁদের জীবন সরস মধুময় হয়ে উঠতে পারেনি। তারাশঙ্কর তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন—"আমার দাম্পত্য জীবনের নিরসতার জন্য দায়ী কিন্তু একা পিসীমা নন। আমার জীবনে যেমন তিনি, তেমনি আমার স্ত্রীর জীবনে ছিলেন একজন, তিনি তাঁর দিদিমা।"—কৈশোর স্মৃতি।

এই ঝগড়ার দরুন মায়ের পিতৃগৃহে বাসের কালে তাই পত্রমারফৎ প্রেমের আদানপ্রদান হতে পারেনি। চোখ চাইলেই যেখানে শিব দেখতে পাবেন পার্বতীকে—আর উমা দেখতে পাবেন শঙ্করকে সেখানে আবার চিঠি কি করবে? তাছাড়া কালটাও তেমন রোমান্টিক ছিল না। সব নষ্ট করে দিলো দু বাড়ির দম্ভ। তাছাড়া মাও ছিলেন বিশেষ জেদী। তারাশঙ্করের আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'ধাত্রীদেবতা' পড়লেই বোঝা যাবে সে সময়ে দু বাড়ির অবস্থা।

তবুও এঁদের দ্বন্দ্বেভরা জীবনে অনেকগুলি সন্তান জন্ম দিয়েছিলো। সংখ্যায় তারা ছিল নজন। এদের মধ্যে তিন সূতিকাগারেই বিদায় নেয়। আরেকজন বিদায় নেয় তিন মাসের মাথায় এবং ছ'বছর বয়সে মৃত্যু হয় পিতার পরম আদরের কন্যা সন্ধ্যামণি বুলবুলের। [ওই তিন মাসের ভাইটির মৃত্যুর দু'দিন পর আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন কাজী নজরুল ইস্লাম, সঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার।] অর্থাৎ জীবিতের মধ্যে রইলাম আমরা চারজন—দুই ভাই—দুই বোন।

এর মধ্যে ১৯৭৮ সালে ওঁদের জ্যেষ্ঠ সন্তান, আমার অগ্রজ সনৎকুমারের জীবন-অবসান ঘটে। এই শোক বাবাকে পেতে হয়নি, কিন্তু মাকে আঘাত হেনেছিলো নিষ্ঠুর ভাবে। কিছুকালের মধ্যেই ওঁর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল, এবং মাথায় বেশ কিছু গোলমাল দেখা দিল।

মায়ের হাজার দশেক টাকার ক্যাশ সার্টিফিকেট ছিল। এটি ছিল তাঁর মাতৃধন। আমি মনে করি—এই অর্থের অস্তিত্বের আশ্বাসেই বাবার পক্ষে কলকাতায় বাসা করার কথা ভাবতে সম্ভব হয়েছিল—এবং সেটা বাস্তবে রূপান্তরিত করতে পেরে-ছিলেন ১৯৪০ সালে। এই বাসা করার সূত্রে আমরা কলকাতায় উচ্চ শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং পরবর্তীকালে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রেরাও পেয়েছিলো ঐ সুযোগ। প্রথম যখন আমরা কলকাতার বাসাতে এলাম সে সময় মাসিক খরচ প্রয়োজন হতো দেড়শো পৌনে দুশো টাকার মত। ঐ টাকাটাও সেদিন বাবার পক্ষে উপার্জন করা

খুব সহজসাধ্য ছিল না। আরও বছরখানেক পরে মা যখন দেখলেন যে বাবার উপার্জন বেড়েছে এবং বেশ বাড়ছে তখন মা তাঁর ঐ সঞ্চিত টাকা দিয়ে কলকাতায় একটা নিজস্ব স্থায়ী বাসস্থানের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। আর সেই কারণে বাবাকে চষে বেড়াতে হলো দক্ষিণেশ্বর থেকে ঢাকুরিয়া পর্যন্ত। অবশেষে একদা বরানগরে কাশীনাথ দত্ত রোডে একটি ছোট দোতলা বাড়ির মালিক হয়ে গেলেন ১৯৪১ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে। এই বাড়িটি কেনার পরও মা কিন্তু তাঁর ধনী মাসিমাদের সমাজে তেমন সমাদৃত হননি। তখনও তাঁরা আগের মত বলে চলেছেন ফণ্টির (মায়ের ডাকনাম) বিয়েটা তেমন স্থবিধা হয়নি। এই মন্তব্য মায়ের বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই চলে আসছিলো।

এরপর ১৯৪৫-৪৬ সাল। তখন লেখক হিসাবে তারাশঙ্করের খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিশেষ করে 'দুই পুরুষ' নাটকের সার্থক অভিনয় এই ধনী সমাজের মধ্যে বাবার অন্য এক বিশেষ ধরনের মর্যাদা এনে দিয়েছে। তখন গাড়িও হয়েছে তাঁর। এবার শ্বশুরকুল তাঁদের সেই পুরনো মত বদলাতে শুরু করেছেন। একদিন মা-বাবা গাড়িতে করে এঁদের কোনও এক উৎসবে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে শুনলেন—সেই মাসীমা বলছেন 'তারাশঙ্করের মত ঝকমকে এমন জামাই ক'জনের হয়?'

হঠাৎ মা বলে বসলেন—'বড়মা, তোমরা তো তা বলতে না আগে। বরং বলতে আমার বিয়ে মোটেই ভাল হয়নি।' বড় মাসিমাকে মা 'বড়মা' বলে ডাকতেন। ধনী মাসিমা অত্যন্ত বিনীত ভাবে উত্তর দিয়েছিলেন—'হ্যাঁ মা—তোমার কথা ঠিকই। আগে অন্য কারণে বলতাম। আবার এখন দেখেশুনে সেই পুরনো ধারণা বদলে অন্য কথাই বলছি। এ সৌভাগ্য যেমন তোমার—তেমনি আমাদেরও।' বাড়ি ফিরে বাবা সব শুনে মাকে বলেছিলেন—'তুমি কাজটা ঠিক করোনি বড়বৌ। যদিও কথাটা শুনে আমার খুব আনন্দ হচ্ছে, তবুও বলবো বড়মাকে ও কথাটা না বললেই পারতে। তোমায় মা মারা যাওয়ার পর উনিই তোমাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছেন। উনি তোমাকে ভীষণ স্নেহ করেন।' তারপর একটু চুপ করে থেকে আবার বলেছিলেন—'তোমার তো অজানা নয় বড়বৌ, লাভপুরে শ্বশুরবাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়েছি গ্রামের আর পাঁচজন ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পংক্তিভোজনে বসে। সেখানে অন্য জামাইরা জামাই-আদরে অন্দরমহলে বসে খেয়েছেন। এই সব তুচ্ছ উপেক্ষাগুলি আজও ভুলতে পারিনি—তবে ভুলে যাওয়া উচিত।'

কত দিনের শোনা সেসব কথা—আমরা শুনেছিলাম সেই রাত্রে আনন্দ চ্যাটার্জি লেনের বাড়িতে মা-বাবার পাশে বসে নানা গল্পের মধ্যে।

প্রথম যৌবনে ওঁরা প্রেমপত্র লিখতে পারেননি পারিবারিক দন্তের কারণে; দুর্ভাগ্যবশত সেই দ্বন্দ্বে ওঁরাও নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিলেন। এরপর স্তম্ভদুটি প্রবহমাণ কালের গতিতে লোকান্তরিত হয়েছেন। মা সন্তান নিয়ে সংসার শুরু করেছেন পতিগৃহে। সুতরাং ধরে নিতে পারা যায় একসঙ্গে থাকার কারণে চিঠি লেখার আর প্রয়োজন হচ্ছে না।

খুব সম্ভবতঃ প্রথম চিঠি লেখা শুরু হয় বাবার কলকাতা বাসের কাল থেকে। তখন যৌবনের উচ্ছ্বাস কি আর থাকে? কাজেই সাদামাটা চিঠি সব। যাইহোক, আমাদের সংগ্রহের মধ্যে রাখা যে চিঠিটিকে এক নম্বর বলে মনে হয়েছে—সেটি লেখা হয়েছিল, ৪১১ যতীনদাস রোড কালীঘাট থেকে—আত্মীয়বাড়িতে ছিলেন তখন। চিঠিতে তারিখ দেওয়ার অভ্যাস বাবার তখনও হয়নি। চিঠিটি প্রথম বলে সেটি এখানে তুলে দিচ্ছি।

৪১১ যতীন দাস রোড
কালিঘাট

প্রিয়তমাসু,

এখানে আসিয়া পৌছিয়াছি এবং ভালই আছি। এখনও কোনরূপ নিজের ব্যবস্থা করিয়া উঠিতে পারি নাই। তুমি সেদিন জিজ্ঞাসা করিলে, কবে আসিবে? কেন জিজ্ঞাসা করিলে কোন উত্তর দিলে না। মনের মধ্যে কথাটা হাজার প্রশ্ন করিতেছে। চিঠিতে জানাইয়ো। নিজের শরীর সম্বন্ধে একটু যত্ন লইবে। গঙ্গার পড়া শোনা এবং তাহার রীতিনীতির দিকে লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন হইয়াছে।

সন্তুর পড়শোনার বিষয়ে তাহাকে সতর্ক হইয়া পড়িতে বলিবে। তাহার ফিজ দাখিলের দিন ১০ই জানুয়ারী ২৫-২৬শে পৌষ। ২৭-২৮ টাকা লাগিবে। সে সময় লাটের সময়—তাহা ছাড়াও সংসারের অবস্থা দেখিতেছ। সংসার হইতে দিতে হইলে হয়তো ধার করিতে হইবে—বা কিছু বিক্রয় করিতে হইবে। সেটাও অপর ভাইদের উপর জবরদস্তি করা হয়। সেইজন্য তোমাকে টাকাটা দিতে লিখিতেছি। তোমার না থাকিলে আমার নিজের অংশ হইতেই নিজের দায়িত্বে কোনরূপে টাকাটা যোগাড় করিতে হইত। এবং এ বিষয়ে কোনরূপ মৌখিক অসন্তোষ প্রকাশ করিতেও নিষেধ বা অনুরোধ করিতেছি। কারণ দিন চলিয়া যায়—কথা দাঁড়াইয়া থাকে।

বাণী মা কেমন আছে—আমার নাম করে কি? কটুকে ভাল করিয়া পড়িতে বলিবে। আমার আশীর্বাদ জানিবে এবং ছেলেদের আশীর্বাদ জানাইবে। ইতি

আঃ তারাশঙ্কর

ঘটনাপ্রবাহ থেকে অনুমান করছি চিঠিখানি ১৯৩৫ সালে জানুয়ারীর প্রথম দিকে অথবা ১৯৩৪ ডিসেম্বর শেষে লেখা। কারণ দাদা ১৯৩৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাস করেন।

এর পরের চিঠিখানি ২৩৬ বউবাজার স্ট্রীটের একটি মেস থেকে লেখা। এখানে মাকে সম্বোধন করেছেন—'কল্যাণীয়াসু উমারাণী' বলে, লিখছেন ঘর গৃহস্থালীর কথা, টাকার কথা। এরপর এসে উঠেছেন শান্তিভবন বোর্ডিংএ। সেখান থেকে লেখা চিঠি-গুলির মধ্যে একটি চিঠি কিছু সরস বলে মনে হওয়ায় তার অংশবিশেষ তুলে দিলাম।

শান্তিভবন।
৩৭নং হ্যারিসন রোড
শুক্রবার

মহিমময়ী উমাদেবী,

নমস্কার মহাশয়া। আপনি একটু সোহাগা পাঠিয়েছেন, তাই আমি একটু সোহাগ জানালাম। সোহাগের যে আসল অংশটুকু বাকী থাকল,—সেটুকু সাক্ষাতে সমর্পণ করব।

…ধাত্রীদেবতার খানিকটা লেখা হয়েছে—সেটুকু অগ্রহায়ণে বেরুবে। আজ সকাল থেকে একটা গল্প আরম্ভ করেছি। শুনে সুখী হবে—ধাত্রীদেবতার খুব প্রশংসা হচ্ছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ করেছেন, ঢাকার প্রফেসর মোহিতবাবু এবং কলকাতার বড় বড় লোক করেছেন।…গায়ের কাপড় এখনও কেনা হয় নি। এখানে টাকার বড় টানাটানি। এ সময় বইয়ের বাজার বড় খারাপ। দোকানে পাওনা টাকা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই পোকার* টাকার ব্যবস্থা না করে টাকা খরচ করতে পারছি না।

আর একটু সোহাগা পাঠিয়ো, সোহাগ বেশী করে পাবে। চুমু। ইতি
তোমারই তারাশঙ্কর

মাকে লেখা চিঠিগুলি থেকে যে তথ্যগুলি পাচ্ছি তা হলো—(১) কিছু উপার্জন হচ্ছে, যাতে করে আত্মীয়দের আশ্রয় ছাড়তে পেরেছেন এবং একটি ভদ্রগোছের হোটেলে এসে উঠেছেন। তারই নিদর্শন পাচ্ছি চিঠির কাগজে। আগে চিঠি লিখতেন অতি সাধারণ কাগজে। এই চিঠির কাগজ বেশ রঙীন, নীল রঙের এবং মোটা। (২) মনটাও একটু সরস এবং রঙীন হয়ে উঠেছে। (৩) মা আজকাল বিশেষ

* জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎ-এর ডাকনাম।

সুস্থ থাকছেন না লাভপুরে। তাঁর চিকিৎসার প্রয়োজন। সুতরাং মাকে কলকাতা আনার দরকার। (৪) তাই একটা যেমন তেমন চাকুরী খুঁজছেন কাগজের অফিসে। আনন্দবাজারে কথাবার্তা চলছে। আশী টাকা মাইনে হলেই চলবে। অথচ মজার কথা এই সময়ে বোম্বে টকিজের চিত্রনাট্য লেখার চাকুরী যার মাইনে ছিল ৪০০।৫০০ টাকা মাসে মাসে—তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। (৫) মায়ের পাঠানো ঠিকানাগুলি নিয়ে পাত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন আমার বোন গঙ্গার জন্যে এবং পরবর্তী চিঠিতে পাত্রের বিশদ বিবরণ মাকে জানাচ্ছেন। এরই মধ্যে ধীরে ধীরে এসে পড়লো ১৯৪০ সাল। কলকাতায় বাসা ভাড়া এবং কেনাকাটার উদ্যোগপর্ব সমাপ্ত করে ১৩৪৭ সালের নববর্ষের দিন মাকে চিঠি লিখে জানাচ্ছেন—

১।১ এ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন
বাগবাজার
কলিকাতা

প্রিয়তমাসু,

নববর্ষের শুভ প্রভাতে পত্র মারফৎ হৃদয়ের বহু আবেদন আবেগ পাঠালাম—গ্রহণ করো। আশীর্বাদও পাঠাই—হে কল্যাণী, তোমার কল্যাণ হোক—তুমি সুস্থ হও, স্বাস্থ্য লাভ কর, রূপে শ্রীমতী হও, লক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করে হে আমার গৃহলক্ষ্মী—অচলা হয়ে আমার গৃহে আমার হৃদয়মন্দিরে বসতি কর। তোমার প্রণাম আমি গ্রহণ করছি—সংগে সংগে গ্রহণ করছি—তোমার প্রেম, তোমার কোমল দেহস্পর্শ। ……কি কি কিনেছি জানতে চেয়েছ। ফর্দ ওপিঠে দিচ্ছি।—পত্রপাঠ উত্তর দাও।

ইতি—
তোমারই তারাশঙ্কর

কলসী হাঁড়ি, উনুন কুঁজো,—চায়ের কাপ খুন্তি·হাতা—এইসব ঐ ফর্দের সামগ্রী। আনতে বলেছেন রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ। বাবার লেখা বেশ কয়েকখানি চিঠি মা আমাদের দিয়েছিলেন বাবা মারা যাওয়ার পর। কিন্তু মায়ের লেখা কোন চিঠি আমাদের কাছে নেই। তারাশঙ্করের যশের থলিতে ঐ চিঠিগুলির ঠাঁই হয়নি।

এরপর এসেছে ১৯৬৮-৬৯ সাল। যশের মায়ায় তখন হাবুডুবু খাচ্ছেন পিতা। মা যেমনটি ছিলেন তেমনটিই আছেন। বয়স বেড়েছে, শরীরটা একটু ভারী হয়েছে এই পর্যন্ত। বাবার কাছাকাছিই থাকেন—বিশেষ করে কাঁদীর ঘটনার পর থেকেই। সংসার দেখেন, বাবাকে দেখেন। এই সময়ের একদিন দুপুরে—মায়ের হাতে 'ভাগবত', বাবা স্নান পূজা সেরে খেতে বসবেন—রেডিওতে গান বেজে উঠলো—

তুমি যত ভার দিয়েছ সে-ভার করিয়া দিয়েছ সোজা।
আমি যত ভার জমিয়ে তুলেছি সকলই হয়েছে বোঝা।
এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও—
ঝড়ের বেগেতে চলেছি কোথায়, এ যাত্রা তুমি থামাও।

টলটল জলভরা চারখানি চোখ পরস্পরের পানে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইল।

সে সময় দুজনের খুব ভাব ভালবাসা। বাবা রাগ করেন, মা হাসেন, কখনও চুপ করে থাকেন এবং কদাচিৎ ঝগড়া করে বসেন। মাঝে মাঝে বাবা যখন কবিতা লিখে মাকে শোনান—যেটি তাঁরই উদ্দেশে রচিত মা মনে মনে খুশী হলেও বাইরে রাগ দেখাতেন। আমরা সেটি জেনে গিয়েছিলাম দাদার কল্যাণে। একদিনের ডাইরীতে লেখা এমনি একটি কবিতা—

"রাত্রে বড় বৌকে বলতে চাইলাম—রমণীর মন সমস্ত বর্গের সখা সাধনার ধন। বললাম—বড় বউয়ের মনের নাগাল পেলাম। মনে একটা গানের কলি এসেছিল—সখি রে তোর মনের নাগাল পেলাম না। আমার মন সে (আমার) হাতে রইল—তোমার হাতে দিলাম না। ও তোর মনের নাগাল পেলাম না।"

মা সেদিন সত্যিই চটে গিয়েছিলেন, কেননা সেই সময় দাদা আর ছোট বোন বাণী ঘরে ঢুকছিল। ঐ ডায়েরীর শেষ দিকে বাবা নিজেই লিখে গেছেন।

"কিন্তু সনৎ এবং বাণীর সামনে বলে ভুল করে ফেললাম। বড়বৌ আহত হল। আমি তাকে বোঝাবার অবকাশ পেলাম না। গানের কলিগুলি লেখা হল না।"

সে কালে টি.ভি. হয়নি। দুজনে শোবার ঘরে দুই খাটে বসে রেডিওর গান শুনতেন। শুনে কখনও কাঁদতেন কখনও হাসতেন।

এই রকম একদিন একটা গান শুনে ওঁদের দুজনেরই খুব ভাল লাগলো। অর্থাৎ দুজনেরই মনের কথা বলেছে গানে গানে। সেদিনের ডাইরী থেকে—"আজও শীত খুব ঘন। কাল থেকে বেশী। আকাশে মেঘ দেখা দিচ্ছে মধ্যে মধ্যে। তার সঙ্গে হাওয়া। শরীর জর্জর হয়ে পড়েছে।

আজ 'গ্রামের চিঠি' লিখেছিলাম। পছন্দ হল না বলে বাতিল করলাম। কাল আবার লিখব।

শরীর ভাল নেই।

রাত্রে রেডিয়োয় একখানি গান শুনে চিত্ত উতলা এবং আলোড়িত হয়ে উঠল। বেঁচে থাকতে যদি আমার প্রেমকে স্বীকার নাই করতে পারো করো না—কিন্তু আমার

মৃত্যুর পর স্বীকার করো আমি তোমায় ভালবেসেছিলাম। আমার সমাধির শিয়রে যেন প্রদীপ জেলে দিয়ো।

বড়বউ বললে—এইটেই আমার মনের মত গান। এই কথাগুলি যে কতবার মনে মনে বলি—তা তুমি জান না। তুমি যখন রাগ করো তখন মন আমার বারবার এই কথা বলে। এই গান গায়। বলি বেঁচে থাকতে স্বীকার করতে পারলে না। মৃত্যুর পর করো। তখন কেঁদো।

আমি কেঁদেই ফেললাম।

এই পৃথিবীর মাটির সর্বগ্রাসী ক্ষুধার রাহু ঐ কি অমৃতময় ভাবের ভুবনের সৃষ্টি করেছে মানুষ! স্বর্গ মর্ত পাতাল নরক সুখ দুঃখ—অনন্ত দুঃখের মধ্যে বেদনাময় অপরূপ স্বর্গ প্রেম ভালবাসা—ক্ষুধাজয়ী দুঃখজয়ী—মানুষের জীবনসাধনা—এর কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে নশ্বরতা—ক্ষণস্থায়িত্ব—মিথ্যে হয়ে গেছে মৃত্যু। এই তো অমৃতের সৃষ্টি!"

সব দিনের ডায়েরীতে যে এমন সব ভাল ভাল কথা আছে তা কিন্তু নয়। বরং অনেক পাতাতে বাবার ক্ষুব্ধ মনের ছায়া পাচ্ছি। আর নিরানব্বই ভাগ ক্ষেত্রে ক্ষোভের কারণ মা।

অনুরাগ রঞ্জিত ডাইরীর পাতা থেকে কিছু উদ্ধৃত করেছি। এবার একটি দিনের কলহের কথা লিখি। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৬৮ সাল, সকাল বেলাতেই বেশ ঝগড়া হয়ে গেলো দুজনে। এই ঝগড়া বিগত ক'দিনের সঞ্চিত ক্রোধের সমষ্টি। লেখার ঘর থেকে দাদাকে সম্বোধন করে একটি সাদা পোস্টকার্ড লিখে পাঠিয়েছেন।

সনৎ,

আমি তোমাদের অন্য কাহারও জন্য আর বেগার খাটিতে পারিব না:—

তারাশঙ্কর

16. 2. 68

চিঠি পেয়ে বাড়ির সবাই আর মা তো হেসে হাঁপিয়ে উঠেছেন। বাবা কথা বন্ধ করেছেন—২০ তারিখের ডাইরীতে দেখা যাচ্ছে লিখেছেন—

"আজ সন্ধ্যেবেলা চিত্তের বিক্ষোভ যেন সব কিছুকে বিদীর্ণ করে বের হল। বড় বউ হাসতে লাগল। এমন বড় বউকে সচরাচর দেখি না দেখতে পাই না। হাসতে হাসতে বললে—না-না তোমাকে আমি ছোট হতে কখনও দেব না। সারা জীবন তুমি বড়ত্বের সাধনা ক'রে এসে শেষ কালটায় ছোট হবে কি জন্যে? সে হবে না। হতে দেব না।

মনে মনে ছোট হয়ে গেলাম বড় বউয়ের কাছে। কিন্তু তাতেও আমার

পরম তৃপ্তি।

আমি দুর্বল হয়ে গেছি। আমি ভেঙে পড়ছি। বড় বউ আমাকে ধরে রাখ তুমি।" এই সময় তারাশঙ্কর তাঁর রচনা মনের আয়নায় লিখছেন—"আমার স্ত্রী বলেন, আমি অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির লোক এবং অবাধ্য স্বামী; কিন্তু আমি জানি, আমি অত্যন্ত পত্নী-অনুরক্ত।"

বছর খানেক পরে ১৯৬৯ সালের জানুয়ারী মাস। বাবা অসুস্থ ছিলেন। মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছেন। মা হয়ে পড়লেন অসুস্থ। একেবারে ১০৩-১০৪° জ্বর —কাঁপুনি। বাবা একেবারে অস্থির হয়ে উঠলেন। সেদিনের ডাইরীতে লিখেছেন—

"টেরামাইসিন খাচ্ছি। সকাল বেলা থেকে টেরামাইসিন আরম্ভ হল।

এক বেলাতেই সুস্থবোধ করলাম। দুপুরে বড় বউ বললে তার পেটে যন্ত্রণা হচ্ছে। গতরাত্রি থেকেই সুরু হয়েছে। রাত্রে তাকে বাথরুম যেতে হয়েছিল। পেট ভেঙেছে এবং মোচড় দিচ্ছে। মধ্যে মধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। বেলা দুপুরের সময় কথাটা প্রকাশ করলে, দুপুরে পেটের যন্ত্রণার জন্য বেলেডোনা খেলে—আরও দু তিনটে ওষুধ খেলে; কিন্তু কিছু ফল হল না। দিনে কিছু খেলে না, শুয়ে পড়ল। বেলা চারটে নাগাদ জ্বর এল। কম্প দিয়ে জ্বর। খুব কাঁপুনি ছিল। দেখতে দেখতে প্রায় বেহুঁশ হয়ে গেল। আমার একটা ফাংসন ছিল। W. B. Govt—Commerce & Industryর recreation club-এর অভিনয়ে যাব বলে কথা দিয়েছিলাম। সুকুমার ডাক্তারকে কল দিয়ে বাণী গঙ্গা এবং বউমার কাছে বড় বউকে রেখে ওখানে গেলাম, ঘণ্টা দেড়েক দুয়েক পর ফিরলাম। তখন বড় বউয়ের প্রবল জ্বর, বোধ করি ১০৩।১০৪ হবে। সে একটা জ্বালাকর উত্তাপ। দু চারটে ভুল বকছে। শুনলাম সুকুমার ডাক্তার দেখে গেছে। বলে গেছে কোন Infection থেকে আমাশা এবং জ্বর হয়েছে। টেরামাইসিনের ব্যবস্থা করেছে। আমার জন্য টেরামাইসিন বড় বউ আনিয়ে রেখেছিল—তারই একটা দেওয়াও হয়েছে। আমি বসে রইলাম ওর পাশে। আমার ষোল ওর দশ বছর বয়সে আমরা দুজনে জীবনে গাঁটছড়া বেঁধেছি। কত কলহ কত হাসি কত কান্না কত বিলাস কত দেওয়ানেওয়ার মধ্যে কেমন করে এবং কতটা যে ভালবেসেছি পরস্পরকে তা আমরা কেউ জানি না। অন্ততঃ তার মাপ নেই হিসেব নেই। এমনি এক একটা ক্ষণ না এলে বুঝতে পারি না। ওর জ্বরতপ্ত কপালে হাত দিতে ও তাকালে এবং বিড় বিড় করে কি বললে। আমার ভিতরটা কেমন করে উঠল। ও না থাকলে এ পৃথিবীতে আমার আর কি থাকবে। আমি কি নিয়ে কাকে নিয়ে থাকব? রাত্রি দশটা নাগাদ ওর জ্বরটা কমল। এতক্ষণ বউমা সারাক্ষণ বসেছিলেন ওঁর কাছে। আমি পাশের ঘরে গিয়ে বসে ছিলাম। রাত্রি

দশটার সময় বাথরুম গেল। ফিরে এসে স্পেন্সার খেলে; শুলো। রাত্রি বারোটায়—টেরামাইসিন খেলে, সরবৎ খেলে। রাত্রে বোধহয় জ্বরটা ছেড়েছে।

হ্যাঁ। আজ চীফ সেক্রেটারী ফোন করেছিলেন—ওঁরা State থেকে আমাকে পদ্মভূষণ order দেবার জন্য Centreকে recommend করেছিলেন—Centre সানন্দে প্রস্তাব গ্রহণ করে—আমি রাজী আছি কিনা জানতে চেয়েছে। সম্মতি দিলাম। মা আমাকে অজস্র সম্মানে ভূষিত করছেন। জানি না—কোন কারণে ! তাই বলি তাঁর দয়া অহেতুকী।"

মায়ের সম্বন্ধে এ রকম রচনা এবং মন্তব্য অনেকের কাছে অনেকবার করেছেন। বলতেন, 'বড়বৌ নাই একথা আমি কল্পনাও করতে পারি না। ওঁকে ছাড়া আমার এক দণ্ডও চলবে না।' বাবা এ বয়সে মায়ের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। এটা এই বয়সের সব স্বামীর পক্ষেই সত্য। এবং সেই কারণেই সামান্যতম ঔদাসীন্য অনুভূত হলেই সব স্বামীরাই স্ত্রীর উপর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

বাবা তাঁর ডাইরীতে যে বয়সে ঐসব কথা লিখেছেন, আমি প্রায় সেই বয়সের একজন মানুষ। আমি আমার জীবন দিয়ে বুঝতে পারি কর্মজীবন থেকে অবসরপ্রাপ্ত স্বামীরা তাঁদের স্ত্রীর কাছ থেকে কি চান? দাবী বেশী থাকে না। স্বামী তার স্ত্রীর একটু একান্তে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য প্রত্যাশা করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করে যান—এবং না পেলে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। স্ত্রী তখন পরমানন্দে নাতি-নাতনীদের খাওয়ার ব্যবস্থা কিম্বা কি কি বাজার থেকে আসবে কিম্বা রাত্রে কি রান্না হবে এতাদৃশ রিসার্চ কর্মে ব্যস্ত রাখেন নিজেকে। বাবার ক্ষেত্রে তাঁর দৈনন্দিন জীবনধারা লক্ষ্য করলে দেখতে পাচ্ছি—প্রত্যুষে উঠে নিত্যকর্ম সেরে বসেছেন লেখার আসনে। ডায়েরীতে লিখছেন লালকলম দিয়ে ইষ্টনাম। এমন সময় রাম দিয়ে গেল বড় এক গ্লাস দুধছাড়া চা। এবার পাশের ঘরে গিয়ে মাকে জাগিয়ে দিতেন। মা একটু দেরীতে উঠতেন ইদানীং। বাবা ফিরে এসে শুরু করতেন সাহিত্যকর্ম। এটা চলতো বারোটা একটা পর্যন্ত। ন'টা নাগাদ মা পাঠাতেন এক গ্লাস দুধ, খান চারেক ক্রীমক্রেকার বিস্কুট। সাহিত্যকর্ম শেষ করে তৈলমর্দন, স্নান, পূজা এবং মধ্যাহ্ন-আহারপর্ব। মা এই সময়টা বাবার কাছাকাছি থাকতেন। খাওয়ার সময় সামনে বসতেন—তবে হাতে থাকতো তাঁর 'ভাগবত'। একদিকে বাবার শয্যাগ্রহণ হতো—অন্যদিকে মায়ের শুরু হতো সংসার পরিক্রমা। সকলের খাওয়া হলে অবশিষ্ট যা থাকতো তাই ছিল মায়ের আহার্য। তার মানে চারটিখানি ভাত, ডাল আছে তো তরকারী নাই, মাছের টুকরোটা মাইক্রোসকোপ দিয়ে দেখতে হতো, ফিরে এসে বাবার পাশের খাটে বসতেন—হাতে নিতেন ভাগবত। বাবা থাকতেন গভীর নিদ্রামগ্ন। মা বিছানায় শুতে শুতে

বাবার নিদ্রাভঙ্গ। মা হেঁকে উঠতেন 'রাম,বাবুর চা দাও।' সেই তুধছাড়া চা। এ সময়টা মা বেরিয়ে পড়তেন। স্কুল কলেজ থেকে নাতিরা ফিরবে—কে কি খাবে জানতে ঢুকলেন রান্নাঘরে। এ সময়টা মায়ের ঐ ঘরে না থাকাটা বাবা একদম সহ্য করে উঠতে পারতেন না। এইটাই ছিল যত গোলমালের কারণ।

বাবা চাইতেন সংসারে আছ খাও দাও আরাম কর। ছেলেরা বৌমারা রয়েছেন, সংসার তাদের হাতে ছেড়ে দাও। অর্থাৎ যেমন বেণী তেমনি রবে চুল ভেজাবে না—

আমি আজ প্রায় বাবার বয়স পেয়েছি। আমার স্ত্রীকে দেখে মাকে দেখে এইটুকু স্থির বুঝেছি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী যদি জীবিত থাকেন এবং সেই বাড়ির কর্তা হন তবে মহিলাটির যত বয়সই হোক না কেন যেমনই দেখতে হোন না কেন তাঁর কতকগুলি বিশেষ অধিকার থেকে যায়। যেমন তিনি ঝকমকে মোটা চওড়া লালপাড় শাড়ি পরতে পারেন, গা ভর্তি গয়না নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরতে পারেন, সিঁথিতে খুব চওড়া করে গাঢ় লাল সিঁতুর পরতে পারেন ইত্যাদি—তেমনি ঠিক ওর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই সংসারের চাবিটা তাঁর আঁচলছাড়া হবে না। একটু মাতব্বরি না করলে প্রেস্টিজ থাকবে না বা মালকিন বলে লোকে খাতির করবে না যে। মুখে অবশ্য বলবেন নিজের হাতে হাল না ধরলে খরচের ঠেলায় ভাসমান ভেলা বানচাল হয়ে যাবে।

এই মা বাবার মৃত্যুর পর ভীষণভাবে বদলে গেলেন। আচারে আহারে বসনেই শুধু বিধবা সাজলেন না, নিজেকে একেবারে গুটিয়ে নিলেন সমস্ত সংসার থেকে। নিজের ঘরে ভাগবত হাতে চুপচাপ খাটের উপর বসে থাকতেন। শুনেছি, উনি নাকি জেনেছিলেন ওঁর বৈধব্যযোগ ছিল না। একদিন শূন্য ঘরে বসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, পঞ্চাশ বছরের উপর আমরা একসঙ্গে ছিলাম। আমরা কি কিছু আলাদা ছিলাম? আমরা তুজনে একজনই ছিলাম।

বাবা প্রয়াত হন ১৯৭১ সালে কিন্তু গোল বাধলো ১৯৭৮ সালে দাদা সনৎকুমারের মৃত্যুর পর। মা যেন কেমন হয়ে গেলেন। স্তব্ধ অসাড় মানুষ। কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না দাদার মৃত্যু। তাঁর ধারণা হলো দাদা কোথাও বেড়াতে গেছেন। একটু পরেই ফিরে আসবেন—নয়তো অন্য কোন ঘরে লুকিয়ে আছেন, খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। হঠাৎ একদিন বলে উঠলেন—সস্তু চটি খোলার জায়গা পাচ্ছে না—তাই আসতে পারছে না।

এর পর তিনি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে শুধু দাদা নয়, বাবা, দাদা, এমন কি

আমার ভগ্নীপতি শান্তিশঙ্কর এঁরা সবাই ফিরে এসেছেন এবং এই বাড়িতেই লুকিয়ে আছেন। কি জানি তাঁদের কি হয়েছে, কেন রাগ করেছেন যার জন্যে দেখা দিচ্ছেন না।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে উনি পরতে লাগলেন লালপাড় মিলের শাড়ি, ডান হাতে বাঁধলেন লালসুতো। এমনি করে ধীরে ধীরে ওঁর কাছে বর্তমান মুছে গেলো।

মাকে দেখে সাইকাট্রিস্ট ডাক্তার বলেছিলেন—উনি বেশ মনের আনন্দে অতীতের মধ্যে ডুবে আছেন। ওঁর এসবের কোন চিকিৎসার দরকার নাই। তবে বয়স হয়েছে, শরীর জীর্ণ হয়েছে, এসবের চিকিৎসা অবশ্যই করতে হবে। বর্তমান ওঁর কাছে অর্থ-হীন হয়ে গেলো।

একপক্ষে মন্দের ভালো। স্বামী পুত্র হারানোর শোক তাঁকে আর নতুন করে আহত করতে পারলো না। ১৯৮৪ সালের মাঝামাঝি সময় ওঁর অনেক অসুবিধা দেখা দিল। কিছু খেতে গেলেই গলায় আটকে যেতো। কাশতে আরম্ভ করতেন। কাশতে কাশতে প্রায় দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। বাড়িতে অক্সিজেন সিলিণ্ডার এনে রাখা হলো। ডাক্তার দেখে বললেন—ব্যাপারটা ভাল নয়। 'সিস্টেমের কো-অর্ডিনেশন' ফেল করছে। বুঝলাম উনি এবার জীর্ণ দেহ পরিত্যাগের কালে এসে পৌঁছেছেন।

২১শে সেপ্টেম্বর সকালবেলা চা মুখে দিয়েই কাশতে শুরু করলেন। অক্সিজেন দেওয়া হল। নিশ্বাস ক্রমশঃ কমে আসতে লাগলো। ধীরে ধীরে শরীরটা নিস্তেজ হয়ে আসছে। আস্তে আস্তে আমার মা আমার হাতে মাথা রেখে পরম নিশ্চিন্তে চির-নিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরিশিষ্ট

॥ ১ ॥

মেডেল

ছেলে বয়সে আমরাও দেখেছি কোন কিছু বিশিষ্ট কাজের জন্য কাউকে পুরস্কৃত করতে হলে তাকে মেডেল বা পদক দানে সম্মানিত করা হ'ত। মেডেল পাওয়া মানে একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ছিল তখনকার দিনে। স্কুলে অন্য সব ক্লাসের ফার্স্ট বয়দের দেওয়া হ'ত কয়েকখানা করে বই—প্যাকেটে বাঁধা প্রাইজ। কিন্তু যে ছেলেটি টেস্টে প্রথম হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে যাবে তাকে দেওয়া হ'ত মেডেল অর্থাৎ বিশেষ সম্মান।

আবার অন্যদিকে থিয়েটার কিম্বা যাত্রার আসরে কারও অভিনয় কিম্বা গান বিশেষ ভাল লাগলে তাকে দেওয়া হ'ত মেডেল। কোন বাদ্যকরকেও এমন কি ঢাক ঢোল বাজনদারদেরও ভাল বাজনার জন্য মেডেল দিতে দেখেছি। তাঁরা যখন আসরে নামতেন গলায় ঝুলতো ঐ মেডেল। এমন কি কারও কারও গলায় থাকতো মেডেলের মালা। যাই হোক, সে সময়ে মেডেল পাওয়াটা ছিল বিশেষ কৃতিত্বের জন্য বড় একটা সম্মান।

কবিয়াল নিতাইচরণ মেলায় তার প্রথম আবির্ভাবের পর চণ্ডীতলায় মহান্তকে প্রণাম জানিয়ে নিবেদন করেছিল, "আজ্ঞে প্রভু, আমাকে মেডেল দেবেন বলেছিলেন।" (কবি)।

আবার ঠাকুরঝির প্রশ্ন নিতাইকে—"ম্যাডেল? ম্যাডেল দেয় নাই?" (কবি) পিতা তারাশঙ্করের আমল মেডেল-সম্মানের যুগ। তা আমার পিতার সেই ম্যাডেল পাওয়ার কথা না বললে যি আমার মনে হবে মশায়, যেন কিছুই বলা হল না। আর তা ছাড়া সম্মানিত হতে এবং বলতে কেই বা না চায়!

রবীন্দ্র-পরবর্তীকালে সেদিন সমকালীন সাহিত্যিক সমাজের মধ্যে পিতা তারাশঙ্কর বহু রকম পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, পুরস্কার পেলে অবশ্যই খুশী হতেন কেবল একটি পুরস্কার বাদে—সেটি হল পদ্মশ্রী—১৯৬২ সালে। পুরস্কার প্রাপ্তির খুশীর ভাবটা ওঁর জীবনে বেশীক্ষণ স্থায়িত্ব বা প্রভাব রাখতে পারতো না।

এসব ব্যাপারে খুব একটা নিরাসক্ত মন ছিল তাঁর। সেই পুরস্কার তালিকা এই বইটিতে দেওয়া উচিত বলে মনে করেছি। কারণ পুরস্কার প্রাপ্তির দিনগুলিকে আমাদের পারিবারিক জীবনের উৎসবের দিন বলে মনে হয়েছে এবং আমরাও বাবার সঙ্গে ঐ সম্মানের ভাগীদার হয়েছি—আনন্দ করেছি, গৌরববোধ করেছি। খুশী হয়েছি।

শিল্পীপিতার শিরোপা (সংবর্ধনা)

১) লাভপুর গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা	...	১৯৩৮ সাল
২) পঞ্চাশ বর্ষ পূর্তি জন্মজয়ন্তীতে সংবর্ধনা (সজনীকান্তের সৌজন্যে)	...	১৯৪৭
৩) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক শরৎ-স্মৃতি পুরস্কার প্রদান	...	১৯৪৭
৪) রাজ্যপাল কর্তৃক বিধান পরিষদের সদস্য মনোনয়ন	...	১৯৫২
৫) রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ	...	১৯৫৫
৬) আকাদেমি পুরস্কার লাভ	...	১৯৫৬
৭) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক জগত্তারিণী পদক প্রদান	...	১৯৫৯
৮) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সদস্য মনোনয়ন	...	১৯৬০
৯) ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মশ্রী উপাধি লাভ	...	১৯৬২
১০) শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ	...	১৯৬৩
১১) ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ	...	১৯৬৭
১২) সত্তরতম জন্মদিনে মহাজাতি সদনে সংবর্ধনা	...	১৯৬৭
১৩) ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ উপাধি লাভ	...	১৯৬৮
১৪) কলিকাতা কর্পোরেশনের অভিনন্দন	...	১৯৬৮
১৫) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট প্রদান	...	১৯৬৮
১৬) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট প্রদান	...	১৯৬৮
১৭) রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. লিট প্রদান	...	১৯৬৯

১৮) সাহিত্য আকাদেমি কর্তৃক
'ফেলো' প্রদান ... ১৯৬৯

১৯) লাভপুরে বিশেষ সমারোহে
জন্মজয়ন্তী পালন ... ১৯৭০

২০) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক
সম্মানসূচক মরণোত্তর ডি. লিট প্রদান ... ১৯৭১

॥ ২ ॥

সভা-সমিতি

১) ১লা বৈশাখ, বীরভূম সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি হিসাবে আমন্ত্রণ পত্র পান। পত্রলেখক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। মূল সভাপতি অতুলচন্দ্র গুপ্ত। সম্মেলনের দিন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাসের দোসরা, তেসরা। ... ১৯৪২ সাল

২) অ্যান্টিফ্যাসিস্ট রাইটার্স অ্যাণ্ড আর্টিস্টস
অ্যাসোসিয়েশন সভাপতি ... ১৯৪২

৩) কানপুরে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনে ...
সাহিত্য শাখার সভাপতি ... ১৯৪৪

৪) কলিকাতা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য ...
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন ... ১৯৪৭

৫) বোম্বাইয়ে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য ...
সম্মেলনে রজত জয়ন্তী অধিবেশনের
সাহিত্য শাখার সভাপতি ... ১৯৪৭

৬) চীন সরকারের সাংস্কৃতিক আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণ ... ১৯৫৬

৭) এশিয়া লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে
যোগদানের জন্য মস্কো গমন ... ১৯৫৭

৮) ভারতীয় লেখকদের নেতারূপে
তাসখন্দে এশিয় লেখক সম্মেলনে যোগদান ... ১৯৫৭

৯) মাদ্রাজে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে
সভাপতিত্ব ... ১৯৫৯

১০) নাগপুরে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য
সম্মেলনের সভাপতিত্ব ... ১৯৬৬

১১) বিশ্বভারতীর আহ্বানে নৃপেন্দ্র স্মৃতি
বক্তৃতা প্রদান ... ১৯৭১

* ১২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. এল. রায়
বক্তৃতা দিতে আহ্বান ... ১৯৭১

* তারাশঙ্কর এই বক্তৃতা প্রদানের আগেই পরলোকগমন করেন। লেখকের এই লিখিত বক্তৃতা পরে ডঃ সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত সভায় পাঠ করেন।

১৯৫৪ সালে চৈনিক লেখক লু স্যুনের জয়ন্তী উপলক্ষে ভারতের প্রতি-নিধি নির্বাচিত হন এবং চীন যাত্রা করেন; কিন্তু অসুস্থতার জন্য মধ্যপথ রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তন করেন।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের

ব্যক্তিগত জীবনের দিনপঞ্জী

বঙ্গাব্দ ১৩০৫। খ্রীষ্টাব্দ ১৮৯৮-৯৯॥

শনিবার ৮ শ্রাবণ সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব লগ্নে বীরভূম জেলার অন্তর্গত লাভপুর গ্রামে তারাশঙ্করের জীবনযাত্রার শুরু। ব্রাহ্মমুহূর্তে সূর্য উদিত হননি, তাঁর লাল আভা ফুটেছে পূর্ব দিগন্তে, এমনি সময়ে জন্ম বলে শাস্ত্রমতে জন্মদিন ৭ শ্রাবণ—পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতা প্রভাবতী দেবী।

৭ মাঘ অন্নপ্রাশন। বৈদ্যনাথ ধামের নির্মাল্য দিয়ে অন্নপ্রাশন হলো। নামকরণ হলো তারাশঙ্কর। ডাকনাম হলো হবু।

বঙ্গাব্দ ১৩১০। খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৩॥

মানত করা মাথার চুলগুলো বৈদ্যনাথ ধামে দেওয়া হলো। হাতেখড়িও হল।

বঙ্গাব্দ ১৩১২। খ্রীষ্টাব্দ ১৯০৫॥

বয়স সাত বৎসর পার হয়ে আটে পড়েছে; প্রথম কবিতা: খড়খড়িওয়ালা দরজার গায়ে খড়ি দিয়ে লেখা—

> পাখির ছানা মরে গিয়েছে
> মা ডেকে ফিরে গিয়েছে
> মাটির তলায় দিলাম সমাধি
> আমরাও সবাই মিলিয়া কাঁদি।

৯ আশ্বিন—পিতৃবিয়োগ।

বঙ্গাব্দ ১৩২১। খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৪-১৫॥

প্রবেশিকা পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ।

বঙ্গাব্দ ১৩২২। খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৫-১৬

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন।

১০ মাঘ—ছোট বোন কমলার সঙ্গে স্ব-গ্রামের লক্ষ্মীনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের বিবাহ।

১২ মাঘ (২৬ জানুয়ারী) লক্ষ্মীনারায়ণের ভগ্নী উমাশশীর সঙ্গে তারাশঙ্করের বিবাহ।

বঙ্গাব্দ ১৩২৫ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯১৮ ॥

আশ্বিন—শুক্রবার দুর্গাষষ্ঠীর দিন জ্যেষ্ঠপুত্র সনৎকুমারের জন্ম।

বঙ্গাব্দ ১৩২৯ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯২২ ॥

২৯ কার্তিক—কার্তিক পূজার দিন কনিষ্ঠ পুত্র সরিৎকুমারের জন্ম।

বঙ্গাব্দ ১৩৩১ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৪ ॥

বড় মেয়ে গঙ্গার জন্ম।

বঙ্গাব্দ ১৩৩২ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯২৬ ॥

মেজ মেয়ে বুলুর জন্ম।

বঙ্গাব্দ ১৩৩৭ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩০-৩১ ॥

ডিসেম্বর মাসে জেল থেকে বের হবার আগের রাত্রে জেলখানায় 'বিদায় অভিনন্দন সভা' বসল। সভাপতি ছিলেন ডাক্তার শরৎচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এই সভাতেই তারাশঙ্কর তাঁর সাহিত্যসেবা করার সঙ্কল্প নেওয়ার কথা ঘোষণা করেন। এবং জেলখানাতেই 'চৈতালী ঘূর্ণি' এবং 'পাষাণপুরী' উপন্যাস দুখানি পত্তন করেন।

'সুতরাং এইখান থেকেই আমার সত্যকারের সাহিত্যজীবন শুরু—'

বঙ্গাব্দ ১৩৩৮ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩১-৩২ ॥

বোলপুরে ছাপাখানা খোলেন—

বঙ্গাব্দ ১৩৩৯ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩২-৩৩ ॥

বোলপুর স্টেশনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে দেখা ও কথা বলা। নেতাজী বললেন—'প্রেস উঠিয়ে দিন। তবু বণ্ড দেবেন না, জামিনও দেবেন না।'

বোলপুরের প্রেস উঠিয়ে দিয়ে মেসিন লাভপুরে তুলে আনা হল।

৭ অগ্রহায়ণ, রাত্রি দশটায় দ্বিতীয়া কন্যা বুলুর মৃত্যু।

ছোট মেয়ে বাণীর জন্ম।

শান্তিনিকেতনে উদয়নের একটি ঘরে কবি দর্শন, আলাপ ও আশীর্বাদ গ্রহণ।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম উপার্জন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪০ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৩-৩৪ ॥

শনিবারের চিঠির সহকারী সম্পাদক—"বাঁচার জন্য"। মনোহরপুকুর সেকেণ্ড লেনে টিনের ছাউনির ঘর ভাড়া।

বঙ্গাব্দ ১৩৪২ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৫-৩৬ ॥

বৌবাজারে মেসে আগমন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৪ । খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৭-৩৮ ॥

লাভপুরবাসীদের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা।

শান্তিভবন বোর্ডিংে আসেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের সঙ্গে প্রথম দেখা।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৫। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৩৮-৩৯॥

প্রথম ফাউন্টেন পেন কেনেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৭। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪০-৪১॥

৬ বৈশাখ সপরিবারে লাভপুর থেকে ১।১এ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, বাগবাজার, কলকাতা এই ঠিকানায় (ভাড়া বাড়ি) এসে উঠলেন।

৪ঠা বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪১ সালে এপ্রিল মাসে) বরানগর বাড়িতে যাই।

বঙ্গাব্দ ১৩৪৯। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪২-৪৩॥

বৈশাখ—বরানগর থেকে পুনরায় ১/১ এ, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, বাগবাজার, কলকাতা এই ঠিকানায় ফিরে এলেন।

২৪ বৈশাখ—বড় মেয়ে গঙ্গার বিবাহ।

বঙ্গাব্দ ১৩৫০। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪৩-৪৪॥

১৪ ফাল্গুন, বড় ছেলে সনৎকুমারের বিবাহ।

বঙ্গাব্দ ১৩৫৩। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪৬-৪৭॥

প্রথম গাড়ি (Standard 12) কেনেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৫৪। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪৭-৪৮॥

টালা পার্কের জমিটা কেনা হয়।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে শরৎ-স্মৃতি পদক প্রাপ্তি।

পঞ্চাশ বছরের পদার্পণ উপলক্ষে সাহিত্যিকদের উদ্যোগে সম্বর্ধনা।

বঙ্গাব্দ ১৩৫৫। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৪৮-৪৯॥

রথের দিন (টালা পার্কের বাড়িতে) গৃহপ্রবেশ হলো।

বৈদ্যনাথ ধামে ভ্রমণ।

২২ ফাল্গুন ছোট ছেলে সরিৎকুমারের বিবাহ।

লাভপুরবাসীদের পক্ষ হতে সংবর্ধনা।

সন্দীপন পাঠশালা উপন্যাসটি ছায়াছবিরূপে মুক্তিলাভ করলো। এই ছবিটি মুক্তি পাবার অল্পদিনের মধ্যেই কিছু মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এবং এরই ফলে "নানা কুৎসিত অশ্লীল গালিগালাজপূর্ণ ভীতিপ্রদ চিঠি আসতে লাগল। এর নব্বুই ভাগই এসেছিল হাওড়া থেকে।"

রবিবার ২৭ চৈত্র (১০ এপ্রিল, ১৯৪৯) তারিখে 'হাওড়া সেবা সঙ্ঘে'র রজত জয়ন্তী উৎসবে যোগদান (সভাপতি—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি—উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশেষ অতিথি—আনন্দবাজারের খেলাধুলা বিভাগের

সম্পাদক ব্রজবাবু) করে ফেরার পথে হাওড়ার পঞ্চাননতলা রোডে লাঞ্ছিত, অপমানিত, আক্রান্ত ও আহত হন। তারাশঙ্করের ভাষায়—"ঘটনাটি আমার মুখের উপর চিহ্ন রেখে গেছে। অন্তরে কোন দাগ নেই, ফেলতে পারেনি। 'ভ্রান্তিরূপিণী সেদিন ভয়ঙ্করী মূর্তিতে দেখা দিয়ে আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ প্রসাদ দিয়ে গেছেন। আমিই তাঁকে জাগ্রত করেছিলাম আমারই ভ্রান্তি দিয়ে। কয়েকটি জিনিস আমি সযত্নে রেখে দেব সংকল্প করেছিলাম। আমার রক্তমাখা ছেঁড়া জামাটি, ওই আঘাত-করা জুতোর পাটিটা, ইটখানা এবং রুমাল একখানা—সেখানাও রক্তমাখা। কিন্তু রুমালখানা ছাড়া অন্যগুলি পুলিস নিয়ে গিয়ে আর ফেরত দেন নি।"

বঙ্গাব্দ ১৩৫৭। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫০-৫১ ॥

"১৯৫০ সালের জুন মাসে পিসীমা—আমার ধাত্রীদেবতা আমার মায়ের হাতে হাতটি রেখে মহাপ্রয়াণ করলেন।"

বঙ্গাব্দ ১৩৫৮। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫১-৫২ ॥

রাশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাশিয়া দেখার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান।

বিধান পরিষদের সদস্য মনোনীত (১. ৪. ১৯৫২)

বঙ্গাব্দ ১৩৬০। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৩-৫৪ ॥

কাঁদিতে লালাবাবুর বিগ্রহ দর্শন।

বঙ্গাব্দ ১৩৬১। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৪-৫৫ ॥

৭ শ্রাবণ—মা'র কাছে দীক্ষা (কালী মন্ত্র) নেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৬২। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৫-৫৬ ॥

রবীন্দ্র-স্মৃতি পুরস্কার লাভ

চৈনিক লেখক লু-স্থনের জয়ন্তী উপলক্ষে ভারত সরকার কর্তৃক চীনে প্রতিনিধি রূপে প্রেরণ। কিন্তু অসুস্থতার জন্য রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তন।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৩। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৬-৫৭ ॥

আকাদেমী পুরস্কার লাভ।

চীন সরকারের সাংস্কৃতিক আমন্ত্রণে চীন ভ্রমণ।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৪। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৭-৫৮ ॥

৬ শ্রাবণ ছোট মেয়ে বাণীর বিয়ে।

এশীয় লেখক সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটিতে যোগদানের জন্য মস্কো গমন। ভারতীয় লেখকদলের নেতারূপে তাসকেন্দে এশীয় লেখক সম্মেলনে যোগদান।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৬। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৫৯-৬০ ॥

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ।

মাদ্রাজে সর্বভারতীয় লেখক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

বিধান পরিষদের সদস্যপদ হতে অবসর গ্রহণ (৩১. ৩. ৬০)।

রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত (১. ৪. ৬০)।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৭। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬০-৬১॥

লাভপুরবাসীদের পক্ষ হতে সংবর্ধনা।

ভাদ্র—মাননীয় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাজ্যসভার সদস্য মনোনীত হওয়ায় ব্যাটরার (হাওড়া) নাগরিকগণের পক্ষ হতে নাগরিক সংবর্ধনা। অনুষ্ঠানে সভাপতি—ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রধান অতিথি ডঃ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত এবং অর্ধশতাধিক সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৯। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬২-৬৩॥

ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পদ্মশ্রী উপাধি লাভ

বড় জামাই শান্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যু। এই আঘাতকে ভুলে থাকার জন্য ছবি আঁকা ও কাটকুটার সাহায্যে কাটুমকুটুম গড়া শুরু।

বঙ্গাব্দ ১৩৭০। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৩-৬৪॥

শিশিরকুমার পুরস্কার লাভ।

বঙ্গাব্দ ১৩৭২। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৫-৬৬॥

রাজ্যসভার সদস্যপদ হতে অবসর গ্রহণ (৩১. ৩. ৬৬)।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৪। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৭-৬৮॥

ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার লাভ।

আষাঢ়—কলকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নাগরিক সংবর্ধনা।

৭ শ্রাবণ—একাডেমি অব্ ফাইন আর্টস ভবনে তারাশঙ্করের ছবির প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী

৮-৯ শ্রাবণ—সপ্ততিতম বর্ষে পদার্পণ উপলক্ষে (মহাজাতি সদনে) বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধার্ঘ্য। অনুষ্ঠানে মঙ্গলাচরণ করেন প্রভুপাদ প্রাণকিশোর গোস্বামী। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক, সভাপতি, প্রধান অতিথি এবং বক্তাগণ যথাক্রমে, প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডঃ প্রিয়রঞ্জন সেন। উদ্যোক্তা—কথাশিল্পী তারাশঙ্করের সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী সমিতি; ১৪, মাকড়দহ রোড, হাওড়া—১। সাধারণ সম্পাদক—নির্মলকুমার খাঁ।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৫। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৮-৬৯॥

ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পদ্মভূষণ উপাধিলাভ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি. লিট্ উপাধি প্রদান।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক ডি, লিট্ উপাধি প্রদান।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৬। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৬৯-৭০॥

সাহিত্য আকাদেমী কর্তৃক ফেলো মনোনীত।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সম্মানসূচক ডি. লিট্ উপাধিপ্রাপ্তি।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভাপতির পদ গ্রহণ।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৭। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭০-৭১॥

লাভপুরবাসীদের পক্ষ হতে সংবর্ধনা।

বঙ্গাব্দ ১৩৭৮। খ্রীষ্টাব্দ ১৯৭১॥

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বানে নৃপেন্দ্রচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতা প্রদান।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি. এল. রায় বক্তৃতা দিতে আহূত।

'ফিয়াট' গাড়ি (WBF 8834) কেনেন।

ভাদ্র—ফাউন্টেন পেন কেনেন—কিন্তু লেখার অবকাশ হয়নি।

ভাদ্র, ২৮ মঙ্গলবার, সকাল ৬-৪২ মিনিটে মহাপ্রয়াণ। নিমতলা মহাশ্মশানে শেষকৃত্য। সন্ধ্যা ৬টায় বড় ছেলে সনৎকুমার কর্তৃক মুখাগ্নি প্রদান।

আশ্বিন—(১. ১০. ৭১) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সম্মানসূচক (মরণোত্তর) ডি. লিট্ উপাধি প্রদান। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত এ. এল. ডায়াস তারাশঙ্করের টালাস্থ বাসভবনে গিয়ে তারাশঙ্করের স্ত্রী শ্রীযুক্তা উমাদেবীর হস্তে উপাধি অর্পণ করেন।

কয়েকটি চিঠি

১

কল্যাণীয়েষু,

শ্রীমান সরিৎ তোমার পত্র পেয়েছি।

বেঁচে থেকে তোমাদের উপকার করব কিনা জানি না, তবে তোমাদের ক্ষমতাতেই বেঁচে থাকতে চাই।

আজ যশের কামনা নাই, সকল কামনার উদগ্রতাই শান্ত হয়ে আসছে। এসেছে। রয়েছে শুধু মমতা—তোমাদের সকলের মমতা।

দেহ বড় ক্লান্ত হয়েছে। দেহের সঙ্গে মন। জন্মদিনে উৎসাহ বোধ করি নি। ৭ই তারিখ মায়ের কাছে দীক্ষা নিয়েছি।

তোমরা কেমন আছ? শ্রীমান রঞ্জু এবং মঞ্জু মহারাণী? রঞ্জুর ভাতের সময় ছুটি পাওনা থাকলে—সেটা নিয়ে এস। বা কিছুদিনের জন্য ওদের রেখে যেয়ো। তোমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে পরিচয় চাই। তাদের বলে যেতে চাই—আমি তাদের ভালবাসি।

আশীর্বাদ নাও। ইতি

আশীর্বাদক

৩০।৭।৫৪ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহের সরিৎ, আজ কয়েকদিন তোমার কোন চিঠি পাই নাই, খোকা, মঞ্জু, বাসন্তী তুমি সব কেমন আছ, সকলকে আশীষ দিও ও নিও। ইতি আঃ মা

২

কল্যাণীয়েষু,

দীর্ঘজীবী হও, কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ কর, সংসারজীবনে সুখী হও, মনে তৃপ্তি ও শান্তিলাভ কর।

কাল ছুটি ছিল। তোমার চিঠি বিকেলের ডাকে এসেছে। তখন আমি বাড়ি ছিলাম না। রাণাঘাট গিয়েছিলাম। সভা ছিল। এবং কাল সারাদিন উপবাসও করেছিলাম। তোমার মাও উপবাস করেছিলেন। দুজনে ঝগড়া করিনি, ধর্মাচরণ করেছিলাম এবং তিনিও আমার সঙ্গে রাণাঘাট গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তোমার পত্র পেলাম। কি যে আনন্দ হল সে অন্তরাত্মা জানেন। মনে হল দিনটা সার্থক হল।

এখন কবে ওখান থেকে যাবে, কোথায় যাবে পত্রপাঠ জানাও। বন্দুকের জন্য তোমার একবার আসা প্রয়োজন। বন্দুক হবে। কিন্তু বন্দুক হলেই বাঘ মারতে বা শিকার করতে হয় না। এইটা বলে রাখলাম।

তোমার পত্রের প্রত্যাশা করে রইলাম।

মঞ্জু রঞ্জু বউমাকে আশীর্বাদ দিয়ো।

তুলু একা পড়বে এবার। তাকে মন শক্ত করতে বলো। দীর্ঘ ভবিষ্যৎ সম্মুখে। অনেক যুদ্ধ জীবনে সকলকেই করতে হয়।

আর একটা কথা, যাবার সময় কারুর সঙ্গেই যেন কোনরকম তিক্ত ব্যবহার করো না।

ওখানকার ডাক্তারের ভাইপোটির সঙ্গে বাণীর বিয়ের প্রাথমিক কথাবার্তা বলবে। এবং আমাকে সত্বর জানাবে। এবার বাণীর বিয়ে দিয়ে জীবনে দায়মুক্ত হব।

ইতি

আশীর্বাদক

৭।৫।৫৫ তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়

৩

কল্যাণীয়েষু

তোমার প্রণাম পেলাম। আশীর্বাদ করি জীবনে জয়লাভ কর, শরীরে সুস্থতা লাভ কর, সন্তান গৌরবে গৌরবান্বিত হও, পিতৃ-গৌরবে সন্তানদের গৌরবান্বিত কর; আমার জীবনী তোমার সে উজ্জ্বল হোক। তোমার ও মঞ্জু রঞ্জুর ও বউমায়ের অভাব এবার জন্মদিনে বেদনা দিয়েছে আমাকে। সেদিন ভোরবেলাতেই পূজোয় বসেছিলাম। সেই সময় লাভপুর থেকে পার্বতী ইত্যাদি এসে পৌচেছিল; তাদের কণ্ঠস্বরের মধ্যে আমার হঠাৎ মনে হ'ল—তোমার কণ্ঠস্বর শুনছি; চোখে জল এল, মনে মনে দেবতাকে বললাম—কটুকে এনে দিলে তুমি আজ—তোমার এত করুণা। কাঁদলাম। অপার আনন্দ পেলাম। পূজোর আসন থেকে উঠে, দেখলাম, তুমি নয়। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললাম। আবারও চোখে জল এল। তোমাকেই সেদিন সর্বপ্রথম অন্তরে অন্তরে ঐ আশীর্বাদ করেছি। জয়ের পথেই তুমি আমার কাছে এস।

এবার জন্মদিনে উৎসব সমারোহ অন্তবারের চেয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। বহু জনই এসেছিলেন। অকপটেই স্নেহ আশীর্বাদে ধন্য করে গেছেন। এর মধ্যে তুমি থাকলেই যেন পূর্ণ হতো। আগামীবারের প্রত্যাশা ক'রে রইলাম।

আমি চেষ্টা করছি এখানে। দেখি কতদূর কি হয়।

এখানে মাঝখানে অসুখবিসুখের একটা আক্রমণ যেন হানা দিয়ে গেল। এখান থেকে লাভপুরে মা অবধি। সে সব তুমি জান। এখন ঈশ্বরানুগ্রহে সকলে সুস্থ হয়েছে। তাও মাত্র গত কাল থেকে। গত কালই রণ্টু পথ্য করেছে। মা এখন ভালই রয়েছেন। আমিও একটু সুস্থ হয়েছি।

এরপর কয়েকটা বৈষয়িক কথা লিখি। এখন তোমার কাছ থেকে কিছু বেশী সাহায্য চাই। এবার বাণীর বিবাহ দিতে আমি দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। তোমার মায়ের বড় বউমার, গঙ্গার কিছু গহনা—Bank-এ আবদ্ধ আছে। টাকাটা চার হাজারের কাছাকাছি। মাসিক সুদে ২৫।২৬ টাকা। আমি এখানে মাসিক ৬০ টাকা হিসেবে দিয়ে যাচ্ছি। তুমি ওখান থেকে সরাসরি Bankএ, United Bank of India, Shyam Bazar Branch-এ মাসিক ১০০ টাকা হিসেবে M. O. কর; Sender আমার নাম ঠিকানা দিলে রসিদ এখানে আসবে। কুপনে—Loan a/c.-এ জমা হইবে, instruction থাকবে। মাসিক ১৬০ টাকা জমা হ'লে—বছরে ২০০০ টাকা জমা হবে। ইতিমধ্যে আমি টাকা সংগ্রহ করছি।

আর একটি কথা, গাড়িটা মেরামত না করলে এবার একেবারেই যাবে। ১০০০ টাকা খরচ হবে। এতে তোমার মজুত টাকা থেকে আমাকে কিছু দাও। ৫০০ টাকা দিতে পার? দেনা, Tax—অনেক বাকী ছিল। সে সব শোধ করতে বহু টাকা লাগল।

এ পত্রে টাকার কথা লিখতে ইচ্ছা ছিল না। টাকাটা সংসারে তিক্ততার সৃষ্টি করেই; ওটাই ওর ধর্ম। কিন্তু তোমাকে তো আমার লজ্জা নেই। জীবনটা আমার চাইতে চাইতেই গেল। এককালে তোমার মায়ের কাছে চেয়েছি। আজ এত উপার্জন করেও চাওয়ার ভাগ্য থেকে অব্যাহতি পেলাম না। তবে সৌভাগ্য এই যে, তোমাদের কাছে চাইছি। পিতার পক্ষে এটা সৌভাগ্যই, দুর্ভাগ্য নয়।

তোমরা আমার আশীর্বাদ নাও। ইতি—

আশীর্বাদক

২৭।৭।৫৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

তারাশঙ্করের বংশ তালিকা